অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়

রাফান আহমেদ

সমর্পণ
প্র কা শ ন

অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়

রাফান আহমেদ

এক নজরে

প্রারম্ভ

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর নিমিত্তে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার আদর্শপুরুষ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর, যিনি তাঁর রবের অনুমতিক্রমে অমানিশার মেঘ চিরে মানবতাকে পথ দেখিয়েছেন আলোর জোয়ারের দিকে। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের ওপর যারা একনিষ্ঠভাবে সেই আলোকে ধারণ করেছেন, করছেন, করবেন।

আজকের এই আয়োজনের হেতু মূলত সত্যান্বেষণের প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক মননশীল লেখক হিসেবে পরিচিত অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ। যিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, কিশোর-সাহিত্যিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক হিসেবে পরিচিত। সামসময়িকদের কাছে তিনি আবার কুম্ভীলক (*Plagiarist* - রচনাচোর) হিসেবেও সমালোচিত। ব্লগপূর্ব যুগের নাস্তিকতাপন্থী লেখালেখিতে যে-কয়জনের নাম চলে আসে, তাদের মাঝে তিনি অন্যতম।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রচণ্ড বৈশাখে নানাবাড়ি কামারগাঁয়ে জন্ম হয় অধ্যাপকের। বেড়ে উঠেছেন বিক্রমপুরের রাড়িখালে। পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল হুমায়ুন কবির, কিন্তু পরে নাম বদলিয়ে হয়ে যান হুমায়ুন আজাদ। ধর্ম-প্রথাবিরোধিতা-মৌলবাদ-নিঃসংকোচ যৌনবাদিতা-নারীবাদ-রাজনীতি নিয়ে তিনি কলম চালিয়েছেন অন্তিম শয়ান পর্যন্ত। উনার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটের বেশি, যার মাঝে সমালোচনা গ্রন্থই বাইশটি!

তিনি নিজেকে গর্বভরে অবিশ্বাসী হিসেবে পরিচয় দিতেন। স্বীয় অবিশ্বাসের

নেপথ্যে কথামালা সাজিয়েছেন *আমার অবিশ্বাস* গ্রন্থে। বাংলাদেশে নাস্তিকতাবাদের মুখপাত্র *মুক্তমনা* ব্লগে *আমার অবিশ্বাস* বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> "তিনি আরো লিখেছেন **আমার অবিশ্বাস**। যার তীব্র আলোয় আলোকিত হয়েছে হাজারও তরুণ প্রাণ।" [১]

এই বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বিশ্বাস-ধর্ম-ধর্মীয় নৈতিকতাকে আক্রমণ করেছেন। উনার আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি রাজনীতিবিদ ও খ্যাতনামা কবিরাও। তিনি কলমের আঘাতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—বিশ্বাসের অসারতা আর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অবিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব। ধর্মকে সমালোচনার ক্ষেত্রে উনি মূলত হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের ওপরই আলোচনা করেছেন বেশি, প্রসঙ্গক্রমে ইসলামও চলে এসেছে। যদিও আলোচনায় আমরা দেখব ইসলাম সম্পর্কে উনার অনুধাবন কতটা ত্রুটিপূর্ণ।

বাংলাদেশ সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট মুভমেন্ট-এর ফেইসবুক পেইজে হুমায়ুন আজাদের এক ভক্ত লিখেছেন :

> "হুমায়ুন আজাদের মূল্যায়ন তাঁর অন্ধ ভক্তরা করতে পারবেন না, সেটা এক নতুন পীরবাদের জন্ম দিবে। হুমায়ুন আজাদের অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে তাঁর যৌক্তিক সমালোচনাই মুখ্য।" [২]

অবিশ্বাসী কাঠগড়ায় অবতারণার উদ্দেশ্য হলো, উনার আরোপিত অভিযোগগুলোকে খতিয়ে দেখা—যুক্তি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্বের কাঠগড়ায়। একই সাথে এসকল অভিযোগের পিছে ক্রিয়াশীল মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করা। এ যাত্রায় বিচার করা হবে, যাচাই করা হবে উনার অবিশ্বাস আসলেই কতটা ভিত্তিপূর্ণ। আসলেই কি তিনি প্রথাবিরোধী, নাকি নিজের প্রথার বলয়েই চক্রাকারে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে আশা করি।

এই লক্ষ্যে হুমায়ুন আজাদের উত্থাপিত দাবি ও অভিযোগগুলোকে অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। মূল বইয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে একই রকম অভিযোগ এসেছে ঘুরেফিরে, তাই সেগুলোকে এক শিরোনামের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্র শুধু ড. আজাদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে নাস্তিকতার মূলে

---

১. সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ মানে, সত্যের বুলেটে মিথ্যে আবেগের তীক্ষ্ণ জলাঞ্জলি। মুক্তমনা ব্লগ, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১১

২. http://archive.is/yuzv8

হাত দেওয়া হয়েছে। বইটিতে মূলত আমাদের সহজাত বা মৌলিক চিন্তা ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। জটিল দার্শনিক আলোচনা, বৈজ্ঞানিক ভারি ভারি পরিভাষা টেনে এনে নিরস করার চেষ্টা পরিহার করা হয়েছে সাধ্যমতো। তা ছাড়া প্রতি ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে যাতে গবেষক পাঠকগণ তথ্যের বিশুদ্ধতা ও সংহতি যাচাই করতে পারেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অন্তরের গহীন থেকে কৃতজ্ঞতা, তিনি আমাকে আরও একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই ডা. আবদুল্লাহ সাঈদ খান, ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি, মুশফিকুর রহমান মিনার, জাকারিয়া মাসুদ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক স্যারকে; যাদের পরামর্শ ও তথ্য দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি উস্তাদ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ, অনুবাদক আরিফুল ইসলাম ও বোন উম্মে তাহযীনকে; অনুবাদের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য আমার পথ সহজ করেছে। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক মুহাম্মাদ জুবায়েরকে। একসময় যাদের লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হতাম তাদেরই একজন আমার বই সম্পাদনার দায়িত্ব নিবেন, এটা আমার জন্য এক অভাবনীয় প্রাপ্তি। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই ইসমাইল হোসেন ও রোকন উদ্দিন ভাইকে, একেবারে শুরু থেকে তাদের ঐকান্তিক সমর্থনের জন্য। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

মানবীয় কর্মে ভুলত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। সচেতন পাঠকের নিকট যদি কোনও ভুল ধরা পড়ে, তবে যৌক্তিক প্রমাণ-সহ জানানোর আহ্বান রইল।

এই বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা ভুলচুক তা আমারই কারণে। পরম জ্ঞানী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন প্রত্যেক সত্যসন্ধানী অন্তরকে সত্যের পথ দেখান, আমাদের সকলকে আলোর পথে অবিচল রাখেন, আমীন।

ডা. রাফান আহমেদ

https://www.rafanahmed.com
https://www.facebook.com/rafanahmedofficial

অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

স্বপ্ন না বাস্তব?

সময়টা বেশ সকাল। সূর্য উঠি-উঠি করছে, উত্তরোত্তর দৃষ্টির সীমায় ধরা পড়ছে তার আলোকচ্ছটা। ক্রমেই আকাশে রঙের খেলায় মেতে উঠছে প্রকাণ্ড এই নক্ষত্র। সামনে বিশাল নীল জলরাশি, ঢেউয়ের-পর-ঢেউ আছড়ে পড়ছে। চারপাশে কেমন যেন মাতাল হাওয়ার সমাবেশ। খালি পায়ে নরম বালুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকার শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। আলতো পায়ে আপনি এগোতে শুরু করলেন আচ্ছন্নকারী সায়রের দিকে। সহসা মনে হলো কে যেন ডাকছে আপনাকে! অস্পষ্ট আওয়াজ, কানে আসতে-না-আসতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখেন কেউ নেই। আপনি হতচকিত হয়ে বলে উঠলেন, কে ডাকে!

হঠাৎ আপনার মনে হলো আলো কমে আসছে। দিগন্তে তাকিয়ে দেখেন সূর্যটা কেমন যেন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে আপনার, যতই সামনে এগোতে চাচ্ছেন, ততই আটকে যাচ্ছে পা! একি, চোরাবালি! চকিতে সতর্ক হয়ে ওঠেন আপনি। আগের মাতাল হাওয়া আর নেই, চারদিক হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এগোতে, কিন্তু চোরাবালি আপনাকে নিষ্ঠুর অজগরের মতোন চেপে ধরছে। নিজের পেটের ভেতর পুরে ফেলতে চাইছে যেন। হঠাৎ শুনতে পান প্রাণ কাঁপানো বিকট হাসির হাওয়াজ। অদ্ভুত সেই হাসি, অদ্ভুত নিষ্ঠুর সেই হাসি!

প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, যুদ্ধ করে চলছেন চোরাবালির সাথে। কিন্তু চোরাবালি আপনাকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে চলছে। আপনাকে অন্ধকার পাতালে টেনে নিয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা চলছে। হঠাৎ কী যেন আপনার পা চেপে ধরল। প্রথম এক-পা তারপরে আরেক-পা। সহসা আবারও ভেসে এল সেই জান্তব হাসি, তারপর আবার। চিৎকার করছেন আপনি, সাহায্য চাইছেন। কেউ নেই আশেপাশে, শুধু নিঃসঙ্গ কিছু বৃক্ষ ছাড়া, শুধু হৃদয়ে ভয় ধরানো ওই নিষ্ঠুর হাসি ছাড়া। আপনি ডুবেই চলছেন, ডুবেই চলছেন। শেষ মুহূর্তে একবারের জন্য দিগন্তে তাকিয়ে দেখেন, সূর্যটা মরে গেছে, অঙ্গারের মতোন মিটিমিটি জ্বলছে। তারপর সব অন্ধকার!

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন আপনি। মনে হচ্ছে বুকের মাঝে কে যেন ড্রাম বাজাচ্ছে। পুরো শরীর ঘেমে একাকার, পরনের কাপড় ঘামে ভিজে জবজব করেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। একটু স্থিত হয়ে পানির বোতল হাতে নিলেন। ঢকঢক করে পুরো বোতল শেষ করে ফেললেন নিমেষেই। বসে বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ। দেহ-মন খানিকটা শান্ত হলে ভাবতে লাগলেন, যাক বাবা, বাঁচলাম! এটা স্বপ্ন ছিল! সহসা মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি দেয়, স্বপ্ন এতটা বাস্তব হতে পারে!

এমন অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের কারও-না-কারও জীবনে হয়েছে। স্বপ্নের জগতে হারিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়া। স্বপ্ন এক অদ্ভুত ব্যাপার! আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি—যে জীবনকে, যে জগতকে বাস্তব মনে করে আমি-আপনি দিনানিপাত করি, রচনা করি গল্প-কাব্য-গাঁথা; এ জীবনও কি স্রেফ ওই স্বপ্নের মতোই কোনও ব্যাপার? নাকি আদৌ এর বাস্তব কোনও অস্তিত্ব আছে? কী মনে করেন? আপনি কি একেবারে নিশ্চিত যে আপনি কোনও স্বপ্নের মাঝে আচ্ছন্ন নন?

> "অধিকাংশ মানুষ মনে করে, এটা হতে পারে যে, তারা এই মুহূর্তে কোনও স্বপ্নের মাঝে আছে। তবে (তাদের ধারণা,) আসলেই এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম; সে সম্ভাবনা হয়তো কোনও লটারি জেতা বা বজ্রাহত হওয়ার মতোই ক্ষীণ (এমনটাই হয়তো ভাবেন তারা)। আদতে সম্ভাবনা কিন্তু ঢের বেশি।..."[১]

আমরা কিন্তু এ জগতকে বাস্তবে ভেবেই দিনযাপন করি, কোনও যুক্তি ছাড়াই। কোনও স্বপ্নের জগৎ হতেও তো পারে, এমন ভাবনার পেছনে ছুটে বেড়াই না। স্বভাবতই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের চিরচেনা এই বসুধা, তার নয়নাভিরাম প্রকৃতি, নদীর কলতান, উত্তাল জলধি, দানবাকৃতির নিঃসঙ্গ পাহাড়, নিঝুম বনের নিস্তব্ধতা, ঝরঝর জলপ্রপাতের শব্দ—এ সবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে।

এবার চিত্রপট বদলে দিই। আরেকটু চটকদার কিছু ভাবি চলুন। মনে করুন বর্ষাস্নাত দিনে কোনও গহীন বনে আপনি হেঁটে চলছেন। বারিধারা কমে এসেছে, টিপটিপ করে পড়ছে মাঝেসাঝে। বৃষ্টির ঠান্ডা জলের স্পর্শে শরীর কেঁপে উঠছে, কাঁপছে অন্তরও। হঠাৎ নজরে এল কিছু অদ্ভুত সুন্দর ফুল! কী উজ্জ্বল রঙের বাহার! খিলখিল করে হাসছে যেন! কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন। হাতের মুঠোয় কিছু ফুল নিয়ে নাকের কাছে আনলেন, অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে মনটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। কী মনে

---

১. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ব্লগে প্রকাশিত আর্টিকেল : Jan Westerhoff, What is the probability that your are dreaming right now? OUPblog, 13 July 2012

হতে যেন পায়ের জুতো খুলে খালি পায়ে ভেজা ঘাসের সাথে মিতালি গড়তে লাগলেন। পার্থিব এই ক্ষণ কেন যেন অপার্থিব হয়ে ধরা দিলো আপনার ইন্দ্রিয়ের কাছে।

এই যে নয়ন জুড়ে নৈসর্গ দেখছেন, বুনো ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছেন, ভেজা ঘাস ছুঁয়ে চলছেন—বিজ্ঞানীরা বলেন এসব অনুভূতি কিছু রাসায়নিক পদার্থের খেলমাত্র। আপনার ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুপথ বেয়ে উদ্দীপনা উঠে গেছে আপনার মস্তিষ্কে। প্রতিটি অনুভূতির জন্য মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ এলাকা রয়েছে। ইন্দ্রিয় থেকে আসা উদ্দীপনা আপনার মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করছে। আর আপনি অনুভব করছেন নৈসর্গকে, মোহনীয় এই প্রকৃতিকে, তার ঐশ্বর্যকে।

এখন কেউ যদি আপনার মস্তিষ্কের সেই বিশেষ জায়গাগুলোতে তারের মাধ্যমে একই পরিমাণ উদ্দীপনা পাঠায়, তা হলে মস্তিষ্ক ভাববে সে দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, ঘ্রাণ পাচ্ছে। যদিও বাস্তবে এগুলোর কোনওটারই অস্তিত্ব নেই! হতে পারে আপনি দূরের কোনও অজানা গ্রহে জারে ভেসে থাকা নিছক এক মস্তিষ্ক মাত্র। আর তাতে কলকাঠি নাড়িয়ে এই হৃদয় দোলানো অনুভূতি সৃষ্টি করছে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী। ধরুন এই অবস্থাটার নাম দিলাম পরাবাস্তব জগৎ। আপনি কি নিশ্চিত, আপনি জারে ভেসে থাকা এমন কোনও মস্তিষ্ক নন কেবল? না, নিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভব না। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত দার্শনিক, (নাস্তিক) প্রফেসর ডেভিড শালমার্স বলেন :

> "আমরা যে পরাবাস্তব জগতে নেই (অর্থাৎ বিশ্বজগৎ প্রকৃতই অস্তিত্বশীল) তার পক্ষে আপনি কোনও প্রমাণ খুঁজে পাবেন না। কারণ আমরা যে প্রমাণই পাই না কেন, সেটাও অবাস্তব হতে পারে।" [২]

কিন্তু আমরা কি এমনটা ভাবি বলুন? নাহ, আমরা এই বিশ্বের অস্তিত্বকে বাস্তব ভেবেই জীবনযাপন করি, লালনীল স্বপ্ন গাঁথি। সুপরিচিত নাস্তিক পদার্থবিদ প্রফেসর ম্যাক্স টেগমার্ক বলেন :

> "এটা কি যৌক্তিকভাবে সম্ভব যে, আমরা পরাবাস্তব জগতে আছি? হ্যাঁ, সম্ভব। তা হলে আমরা কি সম্ভবত পরাবাস্তব জগতের মাঝেই আছি? আমি বলব, না!"[৩]

২. Clara Moskowitz, Are We Living in a Computer Simulation? Scientific American, April 7, 2016

৩. Olivia Solon, Is our world a simulation? Why some scientists say it's more likely than not. The Guardian, 11 Oct 2016

আমাদের অস্তিত্ব কী জারে ভেসে থাকা এই মস্তিষ্ক দুটির মতো?

আমরা এই বিশ্বাসের পেছনে কোনও যুক্তি খুঁজতে যাই না। দর্শন বা বিজ্ঞান কোনওটিই এর উত্তর বের করতে পারে না। তারপরও আমরা বিশ্বাস করি, অন্ধ-বিশ্বাস। বিজ্ঞান মহাশয় নিজেও এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, অপ্রমাণযোগ্য বিশ্বাস। আইনস্টাইন বলেছিলেন,

> "যে-কারও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির বাইরে বহির্জগতের যে আসলেই অস্তিত্ব আছে, এহেন বিশ্বাস সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।" [৪]

আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কিন্তু এই জগৎ যে বাস্তবেই অস্তিত্বশীল, তা প্রমাণে যথেষ্ট নয়। ডেভিড হিউমও এই মত দিয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীদের এই বিশ্বাস প্রমাণভিত্তিক কোনও যৌক্তিক বিশ্বাস নয়। আমেরিকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা এহেন বিশ্বাসকে মজা করে বলেছেন "এনিমেল ফেইথ" মানে অযৌক্তিক বিশ্বাস।[৫] যাই হোক বাপু, আমরা কিন্তু এমন অদ্ভুত চিন্তাভাবনা করি না। তা হলে আমরা কেন এই বিশ্বাসগুলো করি? কারণ এগুলো বুনিয়াদি বিশ্বাস, মৌলিক বিশ্বাস। এগুলো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না। দর্শনের ভাষায় এই বিশ্বাস হলো *Self-evident truth* । হুমায়ুন আজাদ 'আমার অবিশ্বাস' গ্রন্থে বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> "বিশ্বাস কাকে বলে? আমরা কি বলি আমি পিঁপড়েয় বিশ্বাস করি, সাপে বিশ্বাস করি, জলে বিশ্বাস করি, বা বজ্রপাতে, বা পদ্মানদীতে বিশ্বাস করি? এসব, এবং এমন বহু ব্যাপারে বিশ্বাসের কথা ওঠে না, কেননা এগুলো বাস্তব সত্য বা প্রমাণিত। যা সত্য, যা প্রমাণিত, যা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; কেউ আমরা বলি না যে আমি বিদ্যুতে বিশ্বাস করি বা রোদে বিশ্বাস করি বা গাড়িতে বিশ্বাস করি, কেননা সত্য বা প্রমাণিত ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হয় না, বিশ্বাস করতে হয় অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক বিষয়ে । অসত্য, অপ্রমাণিত, কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণই হচ্ছে বিশ্বাস।... " (পৃ. ২২)

অধ্যাপক সাহেব নিজে কিন্তু জগতের বাস্তবতাকে নিশ্চিতই ধরে নিয়েছেন। দর্শন বা বিজ্ঞানে আরেকটু অভিজ্ঞ হলে তা করতেন না। এত জোরের সাথে বলতেন না,

---

৪. Glenn Borchardt, The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview; p. 14 (iUniverse 2004)

৫. David Ray Griffin, The Oxford Handbook of Religion and Scince; p. 458 (Edt. Phillip Clayton, Zachary Simpson, Oxford University Press 2006)

"এগুলো বাস্তব সত্য বা প্রমাণিত"। বস্তুবাদী দর্শনে এগুলোকে সত্য বা প্রমাণিত করা সম্ভব নয়।[৬] তিনি নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিও বাস্তব বলে বিবেচনা করেছেন। ইন্দ্রিয়ের ভেল্কিবাজিকে সুখের খোরাক হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন :

> "বেঁচে আমি সুখ পাই; আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সুখ ঢোকে, আমাকে ভ'রে তোলে। সুখ আমার কাছে সামাজিক নয়, যদিও আমার সামাজিক অবস্থান আমাকে সহযোগিতা করে সুখী হতে, তবু সুখ আমার কাছে একান্তই ব্যক্তিগত; তার সাথে সমাজ-রাষ্ট্রসভ্যতার সম্পর্ক নেই; আমি আমার সুখগুলো প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে পুরোপুরি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি।... " (পৃ. ১৩)

কিন্তু একবারও প্রশ্ন করেননি নিজেকে, ইন্দ্রিয়ের টসটসে সুখের অনুভূতিগুলোকে বিশ্বাস করার কোনও যৌক্তিকতা আছে কী? অধ্যাপক সাহেব তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নিয়ে কথার মালা গেঁথেছেন। উনি চোখ দিয়ে—ঘন কুয়াশা দেখেছেন, ভোরের অমল আলো দেখেছেন, দোয়েল-চড়ুই দেখেছেন, উলঙ্গ শিশুদের মাঘের শীতে পাতার আগুনে উম নিতে দেখে সুখ পেয়েছেন, সুখ পেয়ে আবার নিজেকে অপরাধী বোধ করেছেন! কেন অপরাধী বোধ করেছেন, তার কারণ যদিও বলেননি। পদ্মার পশ্চিম প্রান্তে যে লাল গলতে দেখেছিলেন, সেই লাল আবার কোনও এক কাননবালার ঠোঁটেও দেখেছিলেন বলে স্মৃতিচারণ করেছেন! (পৃ. ১৪)

গন্ধ উনাকে সুখ দিয়েছে, সুখ দিয়েছে কান। জিহ্বাও দিয়েছে সুখ, চুষে স্বাদ নিতে চেয়েছেন সূর্যাস্তের, কোনও এক তরুণীকে সারা সন্ধ্যা চুইংগামের মতো চুষতে চিবুতে ইচ্ছে হয়েছিল নাকি উনার! (পৃ. ১৫) কোনও কোনও নারী দেখলে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন, ছুঁয়েছেন, ছোঁয়া পেয়েছেন। ছোঁয়াছুঁয়িতে যে সুখ উনি পেয়েছেন, তা নাকি আর কিছুতেই পাননি! (পৃ. ১৬)

> "... ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি ভালোবাসি, যেমন ভালোবাসি আমার মগজকে, যা আমি দেখি নি, যার ক্রিয়কলাপ বুঝি না আমি, যা আমার কাছে কিংবদন্তির মতো।" (পৃ. ১৭)

তিনি না দেখে, না বুঝে জনশ্রুতির ওপর ভরসা করেই মগজকে বিশ্বাস করেছেন, ভালোবেসেছেন। এই যে অনুভূতির নানারঙ, এগুলো কি নিছক মায়া? না

---

৬. Yujin Nagasawa, The Existence of God : A Philosophical Introduction; p. 139 (Routledge 2011)

এ অনুভূতিগুলো বাস্তব—এ প্রশ্ন করেননি। তিনি নিজের তৈরি সুখের বলয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জগৎ ও সুখ দুটোই উনার কাছে বাস্তব—কোনও প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই।[৭] আমেরিকার নাস্তিক জ্যোতির্বিদ নিল ডিগ্রাসি টাইসন বলেন :

"আজকের এই জামানায়, আপনি যদি জগতের সবকিছু আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে বিচার করেন তা হলে আপনার সামনে বিপজ্জনক জীবন অপেক্ষা করছে।"[৮]

বস্তুবাদে তালগোল

অধ্যাপক সাহেব আরও লিখেন,

"... আমি কোনও মহাপরিকল্পনা নই, কোনও মহাপরিকল্পনার অংশ নই, আমাকে কেউ তার মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করে নি; একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি জন্মেছি, অন্য একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আমি ম'রে যাবো, থাকবো না; যেমন কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোনও কারণ আমি দেখি না।" (পৃ. ১৩)

এখানে যে-বিশ্বাস তিনি উপস্থাপন করছেন দর্শনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় অস্তিত্বগত বা দার্শনিক প্রকৃতিবাদ (*Philosophical Naturalism*) বা বস্তুবাদ। আরেকটি ধরণ হলো পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ (*Methodological Naturalism*), বিজ্ঞান যার ওপর নির্ভরশীল।

» দার্শনিক প্রকৃতিবাদ : স্রষ্টার অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করে

» পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ : স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির বিষয়ে নীরব থাকে

নব্য নাস্তিক্যবাদের অন্যতম পুরোধা রিচার্ড ডকিন্স নাস্তিকদের দার্শনিক প্রকৃতিবাদ তথা বস্তুবাদে বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন :

"দার্শনিক প্রকৃতিবাদী অর্থে নাস্তিক হলো এমন ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে পার্থিব ভৌত জগতের বাইরে কিছু নেই। কোনও স্রষ্টা নেই যিনি দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের

---

৭. রিয়ালিটি বা বাস্তবতা নিয়ে নানা মুনির নানা মত জানার জন্য দেখুন : Jan Westerhoff, Reality: A Very Short Introduction (Oxford University Press 2011)

৮. Nei Degrasse Tyson, Coming to our senses. Retrieved from: http://www.haydeplanetarium.org/tyson/read/2001/03/01/coming-to-our-senses

পিছনে চুপিসারে কলকাঠি নাড়ছেন। আত্মার কোনও অস্তিত্ব নেই যা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, নেই অলৌকিক বলে কোনও কিছু। কেবলই রয়েছে জাগতিক ঘটনাবলী, যা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।" [৯]

ড. আজাদের উপরি-উক্ত বক্তব্য বস্তুবাদেরই প্রতিফলন। মজার ব্যাপার হলো এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদ কিন্তু পুরোই অন্ধবিশ্বাস। এটা আমি বানিয়ে বলছি না; সুপরিচিত নাস্তিক বিবর্তনবাদী গবেষক, বিজ্ঞান-দার্শনিক প্রফেসর মাইকেল রুজ বলেন :

> "আপনি যদি স্বীকারোক্তি চান তবে শুনুন, আমি সব সময় স্বীকার করেছি বস্তুবাদ হলো স্রেফ অন্ধবিশ্বাস..." [১০]

হুমায়ুন আজাদ এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনও কারণ খুঁজে পাননি। শুধু ধার্মিকদের অন্ধবিশ্বাসী তকমা লাগিয়ে তৃপ্ত হয়েছেন, ক্ষিপ্ত হয়েছেন, বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ছেন। তিনি যদি আরেকটু বিজ্ঞান বা দর্শন বুঝতেন, তা হলে এতটা নিশ্চিত হতেন না। এতটা অন্ধবিশ্বাসী হতেন না। বিখ্যাত সাইন্স ফিকশন লেখক আইজ্যাক আসিমভ এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> "আমি একজন নাস্তিক, পুরোপুরি নাস্তিক। বহু বছর থেকেই আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেন জানি আমি অনুভব করেছি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করা যুক্তি-বিবেচনার দিক দিয়ে সম্মানজনক অবস্থান না। কারণ, এক্ষেত্রে একজন এমন জ্ঞানের দাবি করে (স্রষ্টার অনস্তিত্ব) যা সে জানে না।... শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিলাম যেহেতু আমি আবেগ ও যুক্তি সম্পন্ন এক জীব। তাই আবেগের দিক দিয়ে আমি নাস্তিক। স্রষ্টা যে নেই, এ ব্যাপারে কোনও প্রমাণ আমার কাছে নেই...।" [১১]

আসিমভের এহেন বক্তব্য সততার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। একই রকম বক্তব্য পাওয়া যায় আলোচিত নাস্তিক ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউস থেকেও -

---

৯. Richard Dawkins, The God Delusion; p. 14 (London: Bantam Press, 2006)

১০. R. B. Stewart (ed.), Intelligent Design: William A. Dembski & Michael Ruse in Dialogue. p.37 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2007); কেন এই বস্তুবাদ স্রেফ বিশ্বাসের কাতারে পড়ে তা জানার জন্য দেখুন : David Bently Hart, The Experience of GOD: Being,, Consciousness, Bliss; p. 17-18 (London: Yale University Press, 2013)

১১. Paul Kurtz (etd.), Isaac Asimov on Science and the Bible. Free Inquiry 2, No. 2 (Spring 1982). Available online at: http://www.sullivan-country.com/id3/asimov2.html

"আমি এটা প্রমাণ করতে পারব না যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। তবে, আমি বরং এমন মহাবিশ্বের বাসিন্দা হতে চাই, যেটার স্রষ্টা নেই।" [১২]

এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ২০০৯ সালে ব্রিটেন জুড়ে নাস্তিকদের গোষ্ঠী একটি বড় মাপের ক্যাম্পেইন আয়োজন করে, যার স্লোগান ছিল,

There's probably no God... now stop worrying and enjoy your life

অর্থাৎ **সম্ভবত** কোনও স্রষ্টা নেই... তাই (পরকালের) চিন্তা বাদ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করুন! এই ক্যাম্পেইনকে সমর্থন জানান নাস্তিক ও প্রবল ধর্মবিদ্বেষী অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ও ব্রিটিশ হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। [১৩] রিচার্ড ডকিন্স অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পাবলিক ডায়লগেও অকপটে স্বীকার করেছেন, স্রষ্টা নেই এ ব্যাপারে তিনি শতভাগ নিশ্চিত নন। [১৪]

কই এরা তো অধ্যাপক সাহেব ও উনার ভাবশিষ্যদের মতো এতটা নিশ্চিত হতে পারলেন না! কেউই পারবে না নিশ্চিত হতে যে, স্রষ্টা নেই। আসলে আসিমভের মতো তিনিও আবেগের বশেই অবিশ্বাসী, পার্থক্যটা হলো আসিমভ স্বীকার করেছেন, অধ্যাপক স্বীকার করেননি।

বিজ্ঞানের বিশ্বাস

অধ্যাপক সাহেব আলোচ্য গ্রন্থে ধর্মকে কুসংস্কার ও যুক্তিহীনতার তরণী বিবেচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন, উনার যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। উনি আবার এও বিশ্বাস করেছেন, মানুষের অস্তিত্ব কেবলই দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। বিজ্ঞান নাকি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, অমৃতের পুত্র প্রভৃতি আত্মগর্বিত সুভাষণ থেকে বিচ্যুত করে পরিণত করেছে নগ্ন বানরে। (ভূমিকা) কিন্তু উনি এই চিন্তা করেননি যে, বিবর্তন প্রক্রিয়াতেই যদি আমাদের উৎপত্তি হয়, তা হলে আমাদের চিন্তার ক্ষমতার ওপর ভরসা করার কোনওই যৌক্তিকতা নেই।

---

১২. Lawrence M. Krauss Quotes. BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2018. http://brainyquote.com/quotes/lawrence_m_krauss_526704

১৩. 'There's probably no God... now stop worrying and enjoy your life': Atheist group launches billboard campaign. The Daily Mail, 7 January 2009

১৪. John Bingham, Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist. The Telegraph, 24 Feb 2012

এ নিয়ে স্বয়ং ডারউইন সাহেবও সংশয়ে ছিলেন! কারণ বিবর্তনের চাবিকাঠি হলো ক্রমাগত জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়। এই প্রক্রিয়ায় এমন প্রজাতি আবির্ভূত হবে যে, শুধু বেঁচে থাকা ও বংশধর রেখে যাওয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্য, ব্যস। বেঁচে থাকা আর আবিষ্কারের খোঁজ দুটো দুই জিনিস। তেলাপোকা মহাশয়ও তো বেঁচে আছে। ও ব্যাটা নিউক্লিয়ার হলোকাস্টও সয়ে নেয়। কিন্তু ওকে কি কখনও দেখা গেছে বসে বসে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়তে বা মহাবিশ্ব উৎপত্তির ইতিহাস বোঝার জন্য ভূতলে গবেষণা করতে? উইলিয়াম গ্রাহামের প্রতি লেখা লিপিকায় ডারউইনের সংশয়ের স্বরূপ জানা যায় :

> "... আমার মাঝে সেই ভয়ঙ্কর সন্দেহ সবসময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষের মনমগজের দৃঢ় বিশ্বাসগুলো যা কিনা নিম্ন শ্রেণীর পশুর থেকে বিবর্তিত হয়ে বিকশিত হয়েছে, আদৌ কি তার কোনও মূল্য আছে? আদৌ কি তা নির্ভরযোগ্য? কেউ কি কোনও বানরের মনমগজের চিন্তাভাবনাগুলোকে বিশ্বাস করবে, যদি এমন মনমগজে কোনও বিশ্বাস (আদৌ) থেকে থাকে?... "[১৫]

শুধু ডারউইন নন, উত্তরসূরিদের অনেকেই এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন। ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স মডেল প্রণেতাদ্বয়ের একজন, নোবেল বিজয়ী সুপরিচিত নাস্তিক বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন :

> "সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্কটি বিবর্তিত হয়নি। বরং স্রেফ বেঁচে থাকা ও বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।"[১৬]

অধ্যাপক সাহেব নিজের যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি, প্রথাগতভাবেই মেনে নিয়েছেন। বিজ্ঞানও মেনে নেয়, আমরা যে যৌক্তিক চিন্তা করতে পারি। বিজ্ঞানের অনুমানগুলোর মাঝে এটিও একটি। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান লেখক মারগারেট ভার্থেইম বলেন :

> "আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করি এবং বিজ্ঞান নিজেও কিন্তু একগাদা

---

১৫. Charles Darwin, A Letter To William Graham (3 July 1881); Cambridge University Library, Darwin Correspondence Project: Letter no. 13230; Retrieved from: http://www.darwinproject.ac.uk/DCP-LETT-13230

১৬. Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul; p. 262 (New York: Charles Scribner's Sons, 1994)

বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুরুতেই বলা যায়, বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে, বিশ্বজগতকে আমরা বুঝতে পারি এবং আমাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা ও আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা আমরা শেষমেশ সব জেনে যাব।" [১৭]

বিজ্ঞান কিন্তু আরও অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। *ফিলোসফি অব সায়েন্স* অর্থাৎ বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে যাদের আনাগোনা তারা এ ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রগ্রেসিভ সাইন্স ইন্সটিটিউট-এর পরিচালক, নাস্তিক বিজ্ঞান-দার্শনিক গ্লেন বরচার্ড *The Ten Assumptions of Science Towards a New Scientific Worldview* গ্রন্থে এমন দশটি *Assumptions* অর্থাৎ অনুমান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যেগুলো বিজ্ঞান চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়, নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই। [১৮] এর মধ্যে প্রধান হলো পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ, বলা বাহুল্য এটিও গবেষকের স্বীকারোক্তিতে *leap of faith* অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাস। বিস্তারিত আলোচনা শেষে গবেষক লিখেছেন,

> "... দার্শনিক আর. জি. কলিংউড ঠিকই বলেছেন : বিজ্ঞান আগে থেকেই অনুমান করে নেওয়া কিছু ধারণার ওপর নির্ভরশীল। একথা বিজ্ঞান 'ফ্যাক্ট' নয় বরং 'বিশ্বাস'-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে এমনটা বলার সমতুল্য।" [১৯]

বিজ্ঞানী রুপার্ট শেলড্রেক *Science Set Free : 10 Paths to New Discovery* গ্রন্থে বিজ্ঞানের দশটি 'ডগমা' বা অনুমিত মত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন বিজ্ঞান শতবর্ষ পুরোনো অনুমানগুলোকে ধর্মমতের মতো মনে করে বসে আছে। এমন অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন :

> "এই বিশ্বাসগুলো কিন্তু শক্তিশালী। এজন্য না যে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এগুলো নিয়ে ক্রিটিকাল চিন্তাভাবনা করে। বাস্তবতা হলো এ নিয়ে তারা মাথাই ঘামায় না। তারা ভাবে বিজ্ঞানের 'ফ্যাক্ট' গুলোই যথেষ্ট, এর সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর সেগুলো নির্ভর প্রযুক্তি তো আছেই। কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত

---

১৭. John Brockman (etd.), What We Believe but Cannot Prove; p. 176 (Perfectbound 2006)

১৮. অনুমানগুলি হলো : Materialism, causality, uncertainity, inseparability, conservation, complementarity, irreversibility, infinity, relativism, interconnection

১৯. Glenn Borchardt, The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview; p. 119

করছে তা স্রেফ বিশ্বাস, যার শেকড় গেঁথে আছে উনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের ওপর।'' [২০]

জনপ্রিয় সাহিত্যিক, মুক্তচিন্তার চর্চাকারী বিজ্ঞান-লেখক ও পদার্থবিদ ড. জাফর ইকবালের ভাষ্য থেকেও এমন মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানে নাকি কোনও বিশ্বাসের বালাই নেই। তিনি *একটুখানি বিজ্ঞান* গ্রন্থে বলেন :

'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই।' [২১]

ড. ইকবালও জানেন না যে, বিজ্ঞান বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আসলে বিজ্ঞানের অপ্রমাণিত বিশ্বাসগুলো নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। ড. আজাদও এগুলো জানেন না। তাই পরম ভক্তিতে বিজ্ঞানের পেয়ালা থেকে পান করেছেন। মহাবিশ্ব নিয়ে বিজ্ঞানের কথামালা গেঁথেছেন। সেটার আঘাতে ধর্মকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক দৃঢ় কণ্ঠে দাবি করেছেন, বিজ্ঞান আজকাল মনে করে না যে বিধাতার অস্তিত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে (পৃ. ১২১)। একই রকম দাবি উত্থাপন করতে চেয়েছেন উনার ভাবশিষ্যরাও। না বুঝে উনারা পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ বস্তুবাদের সাথে বেমালুম গুলিয়ে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে, বস্তুবাদ বলতে চায় স্রষ্টা নেই, নেই পরকালের ঝুটঝামেলা, নেই আত্মা, নেই অলৌকিক কোনও কিছু।

অপরদিকে বিজ্ঞান পথ চলে পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের অনুমান (বা বলতে পারেন অন্ধবিশ্বাস) নিয়ে। যার লক্ষ্য হলো চোখের সামনে থাকা এই অবাক বিশ্বের কোনও ঘটনা ব্যাখ্যার সময় কেবল জাগতিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হবে। স্রষ্টা আছে কি নেই, সে বিষয়ে কথা বলা হবে না। আমেরিকার বিখ্যাত *ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস*-এর বিবৃতিতে এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে :

"বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছে কি নেই, এ প্রশ্নের

---

২০. Rupert Sheldrake, Science Set Free : 10 Paths to New Discovery; introduction (epub version, New York, Deepak Chopra Books 2012)

২১. ড. জাফর ইকবাল, একটুখানি বিজ্ঞান; পৃ. ১৩ (কাকলী প্রকাশন ২০০৬)

ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।"[২২]

সমস্যা হলো বঙ্গীয় বিজ্ঞানপূজারি মুক্তমনাদের নিয়ে। বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ে তাদের জ্ঞান একেবারে শূন্যের কোটায়! তাই অভিজিৎ রায়কে দেখা যায়, *ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস*-এর বিবৃতিকে অযৌক্তিক বলে গালভরা দাবি জানাতে! শুধু তাই নয়, আবেগের প্রাবল্যে তিনি বলে বসেছেন,

> "...আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোনও-না-কোনওভাবে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা ছিল..."।[২৩]

এই বঙ্গীয় নির্বোধদের ভুল ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ প্রফেসর এম. এ. হারুন অর রশিদ। অভিজিৎ রায়ের লেখা এক বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন,

> "ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়, এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক... " [২৪]

প্রফেসর এম. এ হারুন অর রশিদ স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের অনুধাবনের আলোকে বেশ চমৎকার করে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এটা শুধু তার কথা নয়, ডার্ক অ্যানার্জির ধারণা আবিষ্কারের জন্য ২০১১ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া টিমের একজন, (নাস্তিক) প্রফেসর অ্যালেক্সে ফিলিপ্পেনকো এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> "... আমি মহাবিশ্বকে একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই ... কোনও অতিমানবিক বা স্বকীয় স্রষ্টা আছেন কি না বা এই মহাবিশ্বের কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারে না...।"[২৫]

কারণ বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করে প্রকৃতিবাদের বিশ্বাস নিয়ে। ড. আজাদ দাবি

---

২২. https://www.nap.edu/read/5787/chapter/6#58

২৩. রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, অবিশ্বাসের দর্শন; প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (ঢাকা : শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ৪র্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২৫. 'Scientists only understand 4% of universe'. RT News, 29 Jul, 2012

করতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান কোনও পরমসত্তায়ই বিশ্বাস করে না। (পৃ. ১১৪) তাই কী? ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে বিজ্ঞান দার্শনিক গাউচ বলেন :

> "পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানের আগ্রহ ও ব্যাখ্যার পরিসীমাকে নানাবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপার ও ঘটনাবলীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়, স্রষ্টা বা ফেরেশতা এমন অতিপ্রাকৃতিক কোনও কিছুকে ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনে না।... (এখন) পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের সাথে মেটাফিজিক্যাল বা অস্তিত্বগত প্রকৃতিবাদ তথা বস্তুবাদের পার্থক্যটি লক্ষ করুন : এই মত অনুসারে প্রাকৃতিক নানাবিধ বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে বটে, তবে অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই; যেমনটা নাস্তিকরা দাবি করে থাকেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসে না। বরং এই দাবি জানায় যে, অতিপ্রাকৃত ব্যাপারস্যাপার বিজ্ঞানের আওতার বাইরে।
>
> দুঃখজনক হলেও সত্য, পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে মাঝে মধ্যে অস্তিত্বগত প্রকৃতিবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। তাই কেউ যদি এমন ধারণায় অটল থাকে যে, বিজ্ঞান পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ মেনে চলে এবং বিজ্ঞান নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করে, তবে তাকে এমন প্রবল উৎসাহপূর্ণ কথার জন্য বেশি নাম্বার দেওয়া হলেও যুক্তির খাতায় তার নাম্বার হবে কম।" [২৬]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, অ্যাকাডেমিক অনুধাবন অনুযায়ী—বিজ্ঞান কোনও পরমসত্তায় বিশ্বাস করে না, কথাটি সঠিক নয়। বরং বিজ্ঞান এই বিশ্বাস এড়িয়ে চলে, নিজের বিশ্বাসের হাত ধরে পথ পাড়ি দেয়। যদি সকল তথ্য-উপাত্ত কোনও স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়! জীববিজ্ঞানী স্কট টড বিখ্যাত সাইন্স জার্নাল *Nature*-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেছিলেন,

> "জগতের সকল উপাত্ত যদি কোনও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এমন অনুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়, কারণ এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়। তবে ব্যক্তি হিসেবে কোনও বিজ্ঞানী এমন বাস্তবতাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন, যা (পদ্ধতিগত) প্রকৃতিবাদের উর্ধ্বে।" [২৭]

এই বিশাল জগতে কাজ করতে গেলে কোনও-না-কোনও অনুমানকে খুঁটি

---

২৬. Hugh G. Gauch, Scientific Method in Brief; p. 98 (Cambridge University Press, Sep 6, 2012)

২৭. Scott C. Todd, A view from Kansas on that evolution debate; Nature, vol. 401, p. 423 (30 September 1999)

হিসেবে ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজ শুরু করতে হয়।[২৮] আগেই বলা হয়েছে—এই খুঁটিগুলোর মাঝে প্রধান খুঁটি হলো প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস। জিনতত্ত্ববিদ রিচার্ড লেউনটিন অকপটে স্বীকার করেছেন :

> "বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃত (যেমন স্রষ্টা)-এর মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে বোঝার চাবি হলো কমন সেন্সবিরোধী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের স্বদিচ্ছার দিকে তাকানো। যদিও বিজ্ঞানের কিছু মতবাদ সুস্পষ্টভাবে হাস্যকর, যদিও এটি জীবন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে নানা উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়, যদিও বৈজ্ঞানিক মহল অপ্রমাণযোগ্য 'কেবলই (শিশুতোষ) গল্প' (যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছু বিষয়)[২৯] মেনে নিতে সহিষ্ণু। তবুও আমরা বিজ্ঞানের পক্ষ নিই। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রকৃতিবাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্ময়কর এই জগৎ সম্পর্কে একটি প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে কোনও-না-কোনওভাবে আমাদের বাধ্য করে। বরং, পক্ষান্তরে (প্রকৃতিবাদের প্রতি) পূর্ব থেকেই (*a priori*) আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই (জগৎ অনুসন্ধানের) এমন উপকরণ ও কিছু ধারণা তৈরিতে, যা প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যারই জন্ম দেয়। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক না কেন, অনভিজ্ঞদের জন্য যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। ওপরন্তু প্রকৃতিবাদই হলো অকাট্য; কারণ আমরা (আমাদের চিন্তার) দরজায় ঐশ্বরিক পদক্ষেপকে অনুমোদন করতে পারি না।"[৩০]

এদিকে আবার বিজ্ঞানীদের মাঝে একটি অংশ নিজের দার্শনিক প্রকৃতিবাদ তথা বস্তুবাদের বিশ্বাসকে জোরালো করার জন্য বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে ব্যস্ত। সুপরিচিত সেক্যুলার পদার্থবিদ পল ডেভিস এই বাস্তবতা ইঙ্গিত করে তার অভিজ্ঞতা জানান :

> "ভৌত-বিশ্ব নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব দাঁড় করাতে সংগ্রামরত অনেক বিজ্ঞানী প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে, (এই তত্ত্ব দাঁড় করানোর পিছে ক্রিয়াশীল) প্রেরণার একাংশ হচ্ছে (এর দ্বারা) শেষমেশ স্রষ্টাকে (তথা স্রষ্টার ধারণাকে) ঝেড়ে ফেলা।

---

২৮. Glenn Borchardt, The Ten Assumptions of Science: Towards a New Scientific worldview; p. 118

২৯. সর্বপ্রথম হার্ভার্ডের বিবর্তবাদী জীববিজ্ঞানী Stephen Jay Gould ডারউইনের বক্তব্যের কিছু অংশকে Just So Stories বলে অভিহিত করেন।

৩০. Richard Lewontin, Billions and Billions of Demons; Available at: http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons

তাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা হলো বিপজ্জনক ও শিশুসুলভ বিভ্রম। আর (তারা যে) শুধু স্রষ্টাকেই (ঝেড়ে ফেলতে চান তা) নয়, (একই সাথে) স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে এমন কিছুকেও (ঝেড়ে ফেলতে চান)। যেমন প্রকৃতিতে কোনও 'অর্থ', 'উদ্দেশ্য' অথবা 'পরিকল্পনা' (প্রভৃতির ছাপ দেখা)। এই বিজ্ঞানীরা ধর্মকে এতটাই ভণ্ডামিপূর্ণ এবং ক্ষতিকর ভাবেন যে, (তাদের মতে) ধর্মকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা ছাড়া গতি নেই। তারা এই ক্ষেত্রে কোনও মধ্যম পন্থা বিবেচনা করেন না, এবং বিজ্ঞান ও ধর্মকে তারা দুটি চরম পরস্পর বিরোধী ওয়ার্ল্ডভিউ মনে করেন। ...

পক্ষান্তরে, স্কলারলি ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টাকে দেখানো হয়েছে জ্ঞানী মহাজাগতিক স্থপতি হিসাবে। যাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে মহাবিশ্বের যৌক্তিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে, যে শৃঙ্খলার সন্ধান আসলে বিজ্ঞানই দিয়েছে। এই প্রকার স্রষ্টা (এর ধারণা) মূলত বৈজ্ঞানিক আক্রমণ থেকে নিরাপদ।"[৩১]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এসকল বিজ্ঞানীর বস্তুবাদের অন্ধবিশ্বাসকে বিজ্ঞান দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অপচেষ্টা নিছক গোঁড়ামির শামিল। বাস্তবতা হলো, নাস্তিকতা বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাপার নয়। বিংশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী ও খ্যাতনামা বিবর্তনবিদ কার্ল উওস খেদ উগড়ে দিয়ে বলেছেন,

"... মানুষ বলে—নাস্তিকতা নাকি বিজ্ঞান নির্ভর। এই কথা আমি পছন্দ করি না। কারণ, বাস্তবতা তা নয়। বরং নাস্তিকতার উপমা হলো—বিজ্ঞানের ওপর ভিনগ্রহের প্রাণীদের আক্রমণ করে তা দখল করে নেওয়ার মতো।" [৩২]

একই মত পাওয়া যায় অজ্ঞেয়বাদি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মারসেলো গ্লেইসার থেকেও। তিনিও ব্যাখ্যা করেছেন যে, নাস্তিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। [৩৩] এরপরও যদি কেউ ভাবেন বিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষ হয়েও স্রষ্টাকে খুঁজে পাননি, তবে তার জন্য সমবেদনা জানানো ছাড়া চিন্তাশীল সমাজের আর কীই-বা করার থাকতে পারে?

---

৩১. Paul Davis, The Goldilocks Enigma: Why is the Universe Just Right for Life; Chapter 1: The Big Question, subheading (Epub Edition, 1st edition, 2008)

৩২. Suzan Mazur, Evolution Scientist Carl Woese Dies: 'The Most Important Evolution Scientist of the 20th Century'. Huffpost, Mar 04, 2013

৩৩. Lee Billings, Atheism Is Inconsistent with the Scientific Method, Prizewinning Physicist Says. Scientific American, March 20, 2019

নানান রঙের বিশ্বাস

শুধু অধ্যাপক সাহেব নন, আরও অনেক অবিশ্বাসীই বিশ্বাস করেন এমন কিছুতে, যা তারা প্রমাণ করতে পারবেন না। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক অনলাইন ম্যাগাজিন *The Edge*-এর প্রতিষ্ঠাতা জন ব্রুকম্যান একবার বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাবিদদের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দেন—বলুন তো, কী আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না? এর উত্তরে অনেকেই তাদের বিশ্বাসের কথা জানান। সবগুলো উত্তর একত্র করে প্রকাশ করা হয় *What We Believe but Cannot Prove* বইটি। চলুন কিছু নমুনা দেখা যাক।

স্ট্যানফোর্ড স্কুল অব মেডিসিনের নিউরোলজির অধ্যাপক রবার্ট এম. স্যাপোলস্কি বলেন :

> "বিজ্ঞানীরা কেবলই মানুষ, যারা এমন ব্যবসায় লিপ্ত, যা আপাত দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে হয়। সম্ভবত অনেক কিছুই রয়েছে যা আমরা স্রেফ বিশ্বাস করে নিই। তাই আমার দাবি একেবারে সোজা, এক অপ্রমাণিত বিশ্বাসের সোজাসাপ্টা প্রস্তাবনা। সেটা হলো, কোনও স্রষ্টা নেই বা আত্মা বলতে কিছু নেই... এই কথায় যদি কোনও যুক্তির আভাস পান তা খোলাসা করার জন্য বলি, এমনকি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও আমি হয়তো বিশ্বাস করতে থাকব যে স্রষ্টা নেই..."[৩৪]

Skeptic magazine-এর প্রকাশক মাইকেল শারমার বলেন :

> "আমি যা বিশ্বাস করি কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না তা হলো—এই বিশ্বজগতের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এবং বিজ্ঞানই হলো তা অনুধাবনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। আরও বিশ্বাস করি—কোনও স্রষ্টা নেই, এ মহাবিশ্ব স্থিরীকৃত (*determined*) তবে আমরা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রাখি, নৈতিকতা মানুষ ও মানব সম্প্রদায়ের অভিযোজনের পথে বিকশিত হয়েছে, এবং সবশেষে আবারও বলব : সকল অস্তিত্বশীল বিষয়কে বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে।"[৩৫]

ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি-এর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর শিথ লয়েড তার বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন :

---

৩৪. John Brockman (etd.), What We Believe but Cannot Prove; p. 30-31

৩৫. প্রাগুক্ত, p. 39

"আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। গাণিতিক উপপাদ্যের মতো বৈজ্ঞানিক ফলাফল যদিও প্রমাণ করা যায় না। বারবার যাচাই করা যায় কেবল... আমি প্রমাণ করতে পারব না ইলেক্ট্রনের অস্তিত্ব আছে কি না, তবে আমি দৃঢ়ভাবে এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ... "[৩৬]

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজি এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রফেসর স্যার মার্টিন রিস বলেন :

"বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণ একমাত্র আমাদের পৃথিবীরই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলেও আমি বিশ্বাস করি এটি পুরো গ্যালাক্সি জুড়ে ছড়িয়ে যেতে পারে... আমার এই বিশ্বাস হয়তো বিলিয়ন বছরেও প্রমাণিত হবে না। তার আগেই হয়তো ভুল প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে... এটা আসলে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকল্প এবং আমি আশা করি এটা সত্য।"[৩৭]

এখানে অল্প কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। নানান রকমের অপ্রমাণিত বিশ্বাস নিয়ে অবিশ্বাসীরা চলে, কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না। কিন্তু তারপরেও আঙুল তোলা হয় শুধু বিশ্বাসীদের দিকে।

একজন অবিশ্বাসী ও প্রথা সমাচার

জিজ্ঞাসু মনের কোণে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে অধ্যাপক কেন অবিশ্বাসকে বেছে নিলেন? এর কারণ কি কেবলই প্রমাণ আর যুক্তির ঘনঘটা? নাকি অন্য কিছু? আলোচ্য গ্রন্থের নাম প্রবন্ধ ঘেঁটে জানা গেল—প্রচলিত সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, প্রশাসন ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নেতিবাচকতা থেকেই সমাজ, রাজনৈতিক কাঠামো-সহ স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। তিনি লিখেছেন,

"আমার অবিশ্বাস শক্তিতে;—যা কিছু শক্তিমান, দর্পশালী, যা কিছু পীড়ন করে মানুষকে, তাতেই ক্রমশ আমার অবিশ্বাস গভীর হ'তে থাকে, বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নিতে আমার ইচ্ছা করে না, যা কিছু সম্পর্কে কারো কোনও সন্দেহ নেই, যা কিছুর স্তুতি ক'রে অন্যরা সুখ পায়, সেগুলাতেই আমার বেশি সন্দেহ হতে

---

৩৬. প্রাগুক্ত, p. 55

৩৭. প্রাগুক্ত, p. 1-2

থাকে। এখানে এখন সবাই শক্তির পূজারী; তারা বিধাতায় বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কেননা কথিত বিধাতা সরাসরি নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন না; কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন নেতায়, নায়কে, একনায়কে, পিতায়, রাষ্ট্রপিতায়, প্রথায় ও আরো অজস্র বস্তুতে; কেননা এগুলো শক্তিমান। আমি শক্তিতে বিশ্বাস করি না, আমি অবিশ্বাস করি শক্তিতে, ক্ষমতায়, দর্পে। আমার সমস্ত অবিশ্বাস জন্মেছে শক্তিতে অবিশ্বাস থেকে। শক্তি অমানবিক, শক্তি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মূল্য দেয় না; শক্তি সব ধরনের যুক্তি ও মানবিকতাকে পর্যুদস্ত করতে চায়।" (পৃ. ১১৮)

ড. আজাদ শক্তিতে অবিশ্বাস করেন। কিন্তু ঝামেলা হলো, ডারউইনিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে সকল প্রাণীই ক্রমাগত বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির সংগ্রামে লিপ্ত। যার শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধির জোর বেশি সেই এই ক্রমাগত সংগ্রামে টিকে যাবে, দুর্বলেরা মুছে যাবে জমিনের ওপর থেকে। ড. আজাদ শক্তিতে অবিশ্বাস করলে তা তো বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে চলে যায়! এ ছাড়াও ডারউইনিয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিটলার জোরপূর্বক অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে মৃত্যুর উপত্যকায় ঠেলে দিয়েছিল। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) সুতরাং ডারউইনের তত্ত্বের প্রতি তো উনার অবিশ্বাস করার কথা! অথচ তিনি বিবর্তনকে প্রমাণিত সত্য মনে করেন!

তা ছাড়া বিশ-শতকের গণহত্যাকারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ নাস্তিকীয় আদর্শের ছিলেন, যারা জোরপূর্বক তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে আপ্রাণ ও নির্মম চেষ্টা করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) তা হলে ড. আজাদের মানদণ্ড বিবেচনায় উনার তো নাস্তিকতাতেও অবিশ্বাস করার কথা! সেটা তো করেননি, উলটো নাস্তিকতার পক্ষে সাফাই গেয়ে বই লিখে বসেছেন।

যাই হোক, ড. আজাদের মাঝে কীভাবে অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষ ক্রমান্বয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল, তা জানার জন্য একটু পেছনে ফিরতে হবে। প্রিয় বাবা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক তনয়া, সাহিত্যিক মৌলি আজাদ লিখেন,

"... বৈশাখ মাস ছিলো বাবার প্রিয়। আর আমার মনে হতো, বৈশাখ মাসের তীব্রতাই হয়তো জন্মের সময়ই তাঁর ভেতর ঢুকে গিয়েছিলো। তাই তিনি হয়েছিলেন জেদি, রাগী, অহংকারী। ... সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন প্রথাবিরোধী। এটা তিনি পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর হয়েছেন তা নয়, ছোটবেলা থেকেই এমন ছিলেন। যেমন দাদির কাছে শুনেছি, ছোটবেলায় নাকি বাবাকে একবার হাতেখড়ি দেওয়ার জন্য কোনও এক পীরের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা

সেই বয়সেই সেখানে যাওয়ার জন্য বিরোধিতা করেছিলেন।[৩৮]

পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, অধ্যাপকের বিশ্বাসহীনতা বা প্রথাবিরোধিতার শুরুটা মূলত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নয়, অনেকটা আবেগ বা স্বভাবনির্ভর প্রতীয়মান হয়। তিনি যদি সত্যিই প্রথাবিরোধী হয়ে থাকেন, তা হলে তো উনার পিতামাতাকে এই দাবি জানানোর কথা ছিল—প্রমাণ দাও যে তুমি আমার পিতা বা মাতা, *ডিএনএ টেস্ট* করে প্রমাণ না করলে আমি প্রথাগত কারণে মানতে রাজি নই তোমরা আমার পিতামাতা। বিনা প্রশ্নে কিছু নাকি মেনে নিতে ইচ্ছে হতো না অধ্যাপক সাহেবের। তিনি কি এমনটা করেছিলেন? অবশ্যই নয়। বরং বাবাকে নিয়ে স্মৃতিকথার মালা সাজিয়েছেন। আর নাই-বা উনার সন্তানদের এই শিক্ষা দিয়েছেন, যে ডিএনএ টেস্ট ছাড়া আমাকে বাবা মানবে না। অধ্যাপকের জবান থেকে জানা যায়,

> "বাল্যকালে আমার একটি বড়ো সুখ ছিলো যে বিশ্বাস করতে হতো না। ধর্ম রাড়িখালে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছিলো আমার বাল্যকালেই; ও নিয়ে কেউ মাতামাতি করতো না... আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের মতো ক'রে তাঁদের বিধাতাকে বিশ্বাস করতেন, বিধাতা বলতে তাঁরা কী বুঝতেন, তা কেউ জানেন না।" (পৃ. ১২৭)

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে অধ্যাপক সাহেব চারপাশে যে ইসলাম দেখেছিলেন তার সাথে মূল ইসলামের সম্পর্ক নেই। হাতেখড়ি মূলত হিন্দুধর্মীয় সংস্কার বিশেষ। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সরস্বতী পূজার দিনে শিশুর হাতে খড়িমাটি ধরিয়ে প্রথম তাকে শ্লেটে লিখতে শিখানো হয়। শিশু তখন হরি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করে এবং কুলবিদ্যার স্তুতিপূর্বক নিজের শিক্ষণীয় বিদ্যার উপাসনা করে।[৩৯]

আর শিক্ষার সূচনার জন্য পীরের কাছে নিতে হবে এই প্রথা কোথা থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে আল্লাহই জানেন। পীর শব্দটিই আল-কুরআন বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাদীসে নেই। এটি ফার্সি শব্দ। মুসলমানদের মূলত কুরআন এবং হাদীস অনুসরণ করতে হবে। ইসলামি শারীআতে সৎ, নেককার মানুষের সাহচর্যে থাকাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, পীর ধরতেই হবে এমনটা বলা হয়নি কোথাও।[৪০] আল্লাহর

---

৩৮. মৌলি আজাদ, স্মরণ : শেষ চিঠি এবং ব্যক্তিগত হুমায়ুন আজাদ, সাপ্তাহিক-বর্ষ ১০ সংখ্যা ৪৬, ২৬ এপ্রিল ২০১৮, দেখুন: http://www.shaptahik.com/v2dev/details.php?id=1008# [http://archive.is/QYx52]

৩৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাপিডিয়া আর্টিকেল। দেখুন : http://bn.banglapedia.org/index.php?title=হাতেখড়ি

৪০. আল-কুরআন ০৯ : ১১৯, ৩৯ : ১৫

হুকুমের আনুগত্য করে নিজের সৎকর্মের দ্বারা ওসিলা খুঁজতে বলা হয়েছে, পীরকে ওসিলা বা মাধ্যম বানাতে বলা হয়নি।[৪১] ইসলামি শারীআতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণকারী ও বাহ্যিক গুনাহমুক্ত ব্যক্তির সাহচর্য ইসলাম পালনে সহায়ক। সেই ব্যক্তির নাম পীর বা শাইখ হোক, সেটা বিবেচ্য নয়।

পীর কোনও নির্দিষ্ট পোস্ট বা পদমর্যাদা নয়। যদি উক্ত ব্যক্তি নিজেই শারীআতের অনুসরণ না করে, তবে তার সাহচর্য অবশ্য বর্জনীয়। তা হলে যে পীর হাতেখড়ির মতো হিন্দুপ্রথা বজায় রাখেন, তার সম্পর্কে আর কীই-বা বলার আছে। বাস্তবতা হলো, সহজে পয়সা কামানোর জন্য রাজনৈতিক নেতা হওয়ার পরে সম্ভবত দ্বিতীয় সহজতম পথ হলো পীর সেজে বসা। সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন যে, মুসলমানদের দ্বীনের পথে আনার জন্য যে পীর-মুরীদি'র ধারা শুরু হয়েছিল, তা এখন মুসলমানদের শিরকে নিমজ্জিত করার অন্যতম চোরাগলিতে পরিণত হয়েছে।[৪২] অধ্যাপক তনয়া মৌলি আজাদের লেখনীতে জানা যায় :

> "সেই রাড়িখালের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তিনি পেয়েছিলেন তার জীবনের মৌলিক জ্ঞান এবং সেই স্কুলের বিষ্ণুপদ স্যার ও হোসেন মাস্টার তার জীবনের সব প্রথা ভাঙতে সাহায্য করেছিলেন।"[৪৩]

মৌলি আজাদ উনার বাবার মুখে এই প্রথা ভাঙনের গল্প অজস্রবার শুনেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে যৌক্তিক প্রশ্ন মানসপটে ভেসে ওঠে তা হলো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের কতটুকুই-বা যুক্তিবোধ থাকে? ধর্ম সম্পর্কে উনার জ্ঞান যে প্রায় ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়, কারণ উনার ভাষ্যমতে ধর্ম নিয়ে রাড়িখালে কেউ মাথা ঘামাত না। তার ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষকদের অন্ধের মতোই বিশ্বাস করে। বইয়ে ঠিক থাকলেও অনেক সময় স্যারের ভুল মেনে নেয়—উনি কি ভুল বলবেন, এই অজুহাতে।[৪৪] এই প্রভাবই তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন বাকি জীবন। ইচ্ছে করেই ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ উৎস থেকে প্রজ্ঞা আহরণ এড়িয়ে

---

৪১. আল-কুরআন ০৫ : ৩৫ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য

৪২. এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা দেখুন : ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), এহ্ইয়াউস সুনান : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন; পৃ. ৪৭২-৫০২ (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ ২০০৭)

৪৩. মৌলি আজাদ, হুমায়ুন আজাদ আমার বাবা; পৃ. ১২ (আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১); আরও দেখুন রেফারেন্স ৩৭ এর লিংক

৪৪. মোঃ জহির উদ্দিন, আমার স্কুলশিক্ষক; দৈনিক জনকণ্ঠ, আগস্ট ০৫, ২০১৫। দেখুন: http://web.dailyjanakantha.com/details/article/135117/সমাজ-ভাবনা-এবারের-বিষয়-আমার-স্কুলশিক্ষক

গেছেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তিনি যে তথ্যের উৎস বেছে নিয়েছেন তা হলো—নিম্নমানের ধর্মীয় বই এবং ইসলাম/ধর্মবিদ্বেষী পশ্চিমাদের বই! যেমন তিনি লিখেন :

> "ধর্মবিষয়ক জনপ্রিয় নিম্নমানের বই পেলেই আমি উলটেপালটে দেখি, কেননা এগুলোই তৈরি করে অধিকাংশ বিশ্বাসীর ধর্মবোধ, যারা ধর্মের মূল বইগুলো পড়তে পারে না, যদিও এগুলোর কোনও কোনও অংশ ধর্মের মূল বিশ্বাসবিরোধী। কিছু দিন আগে 'বাংলাদেশ হুকুমতের ভূতপূর্ব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' মৌলবী মোহাম্মদ শামছুল হুদা বি.এ.বি.এল সাহেবের নেয়ামুল-কোরআন (ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, ১৯৮৯, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) বইটির ১৫১ পৃষ্ঠাটি খুলে আমি চমকে উঠি। এটি একটি জনপ্রিয় ধর্মবিষয়ক বই... বইটির ১৫১ পৃষ্ঠাটি আমাকে শিউরে দেয়। এ-পাতায় তিনি বর্ণনা করেছেন 'দুইজনের মধ্যে শত্রুতা ও মতান্তর সৃষ্টি করার তদবীর'। দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির ব্যাপারটি নৈতিকভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে, কিন্তু ধার্মিকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য।" [পৃ. ১১৪-১১৫]

ড. আজাদ নিম্নমানের বই না ঘেঁটে ভালোমানের বই খুঁজে দেখলেই পেতেন, পরস্পরের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্তরায় স্বরূপ গণ্য করা হয়েছে, পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টি করাকে দ্বীন-ধ্বংসকারী ব্যাপার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৪৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর প্রিয় খাদেমকে উপদেশ দিয়েছিলেন :

> "বাবা আমার! যদি পারো তবে এমনভাবে জীবন কাটাবে যে তোমার হৃদয়ে অন্য কারও প্রতি বিদ্বেষ বা অমঙ্গল করার ইচ্ছা নেই। বাবারে! এটা আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহকে প্রাণবন্ত করে তুলল, সে যেন আমার মাঝেই প্রাণ সঞ্চার করল। আর যে আমাকে জীবন্ত করে তুলল, সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে।"[৪৬]

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, পরস্পর শত্রুতা-বিদ্বেষ হলো আল্লাহর ক্ষমা লাভের অন্তরায়।[৪৭] বিদ্বেষ সৃষ্টি নয়, বরং মিটিয়ে দিতে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া

---

৪৫. আবু ঈসা আত তিরমিযি, আস-সুনান; খণ্ড ০৪, হাদীস ২৫১০ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২)

৪৬. ভাবার্থ, প্রাগুক্ত; খণ্ড ০৫, হাদীস ২৬৭৮। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন, তবে এর সনদে দুর্বলতা আছে বলে কোনও কোনও মুহাদ্দিস মনে করেন।

৪৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ; খণ্ড ০৬, হাদীস ৬৩১৪

হয়েছে।[৪৮] তবে কুফরি আদর্শের প্রতি অবশ্যই বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। সেজন্য কোনও তদবীরের কোনও দরকার নেই। যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী/মুশরিক যে একজন মুসলিম থেকে সদাচার পাবেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আদর্শের সাথে আপস করা যাবে না। নাস্তিক হিসেবে ড. আজাদও বিশ্বাসের আদর্শকে গালমন্দ করেছেন, পাশাপাশি বিশ্বাসীদের একশ্বাসে নির্বোধ/অন্ধ/লোভী/কপট/ভীত বলে গালাগালি করেছেন! (পৃ. ১৯) বিদ্বেষ একটি মানবীয় অনুভূতি, একজন মুসলিম সকল ভ্রান্ত আদর্শকে ঘৃণা করবেন, কিন্তু সেই আদর্শ ধারণকারী ব্যক্তিদের সাথে অন্যায় আচরণ করতে পারেন না; বরং ইসলামে তাদের যে অধিকার আছে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আত্মপ্রেমী অধ্যাপক আরও স্মৃতিচারণ করেছেন, ইশকুলে যতই ওপরের ক্লাসে উঠতে থাকেন তিনি, ততই সুখ কমতে থাকে উনার। কারণ তিনি দেখতে পান বইগুলো নাকি বিশ্বাস করতে বলছে, অনেকের স্তব করতে বলছে; যা উনার ভালো লাগেনি। বিভিন্ন লেখকদের জীবনী পড়ে তিনি বুঝে উঠতে থাকেন—লেখকেরা অত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। কীভাবে একজন স্কুলের ছাত্র হয়ে এত কিছু তিনি বুঝে উঠতে থাকলেন, তা কিন্তু বলেননি! এটাও কি জ্ঞানের অহংকারপ্রসূত আচরণ!

তিনি নিজেও তো আত্মপ্রশংসায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। নিজের ছাড়া অন্য কারও সাহিত্য উনার মনোমতো হতো না। উনার গুণমুগ্ধ ছাত্র চঞ্চল আশরাফের অনলাইন রোজনামচা থেকে একটি নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> "সাক্ষাৎকার শুরু হলো। প্রথম প্রশ্নটি ছিল কবিতার আধুনিকতা ও নতুনত্ব—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে এবং এর ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ উত্তর পাওয়া গেল। সবকিছুই ঠিকমতো চলছিল। যখন তাঁর কবিতা নিয়ে কথা শুরু হল, গোলমালটা লাগল তখনই। 'আপনার প্রথম দু'টি বই অলৌকিক ইস্টিমার ও জ্বলো চিতাবাঘ ছাড়া অন্য তিনটি শিল্পমনস্কতার দিক থেকে ব্যর্থ, কারণ এগুলোয় বিবৃতি আছে কেবল, কবিতা নেই'—শুনে তিনি (হুমায়ুন আজাদ) বললেন, ধর্মগ্রন্থের শ্লোকও বিবৃতি। আমি (চঞ্চল) বললাম, ধর্মগ্রন্থকে কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে পারলে সুবিধা হতো, কিন্তু তা করা হয় না। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, 'আমার নামের আগে ডক্টর এবং প্রফেসর যুক্ত হওয়ায় আর সব মূর্খের মতো তুমিও আমাকে কবি বলে মানতে পারছ না।...

---

৪৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মীমাংসা : এক মহিমান্বিত গুণ। মাসিক আল-কাউসার, বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ০৬, জুলাই ২০১৬

'তুমি আমার কবিতা নিয়ে না-লিখে জয় গোস্বামীর কবিতা নিয়ে লিখেছ কেন?' আন্‌ওয়ার ভাই বললেন, 'ও আপনার কবিতার ওপর লিখবে, কিন্তু জয় গোস্বামীর মূল্যায়ন এখানে হয় নাই তো, ওকে দিয়ে আমিই প্রবন্ধটা লিখিয়েছি।' আমি বললাম, 'না, আমি নিজেই লিখেছি।' শুনে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'জয় গোস্বামীর কোন কবিতাটি আমার কবিতা থেকে ভালো, বলতে পারবে?' বললাম, 'সাহিত্যে এভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তার ভালো কবিতা আছে।' বললেন, 'পড়ে শোনাও।' আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আমার লেখা প্রবন্ধটি বের করলেন। 'ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল' বিড়বিড় করে পড়লেন। মুখ তুলে বললেন, 'এইসব বালছাল যদি তোমার কাছে ভালো কবিতা হয়, তাহলে কবিতা সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব বিপজ্জনক।' আমি বললাম, 'তা তো স্বাভাবিক, যখন অলৌকিক ইস্টিমারের একটি কবিতায় পড়ি : বৃষ্টি হচ্ছে যেন সৈনিকের পদপাত; আর ষাটের দশকের বৃটিশ কবি নরম্যান ম্যাকেজ আগেই তা লিখে ফেলেন : ইট ইজ রেইনিং লাইক সোলজার্স প্যারেডিং···' শোনামাত্র তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান।... এতক্ষণ চুপ-করে-থাকা সালাউদ্দীন আইয়ুব বললেন, 'স্যার, আপনার কথাটা ঠিক। কিন্তু ষাটের বাংলা কবিতার যেগুলো খুব বিখ্যাত, সেগুলোর বেশিরভাগই তখনকার ইংরেজি কবিতার হুবহু অনুবাদ।' হুমায়ুন আজাদ বললেন, 'কোন কোন কবিতা, বলতে পারবে?'

আমি বললাম, 'দ্য নিউ পোয়েট্রি নামে একটা কবিতার বই বেরিয়েছিল পেঙ্গুইন থেকে, ষাটের দশকের শুরুতে। জে ওলভারেজ সম্পাদিত ওই সংকলনটা ছিল চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকের আমেরিকান আর বৃটিশ কবিদের কবিতা নিয়ে। ষাটের বিখ্যাত কবিদের অনেকেই সংকলনটির বেশ ক'টি কবিতা অনুবাদ করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এই দলে আবুল হাসানও আছেন, কিন্তু লাইসেন্স প্লেটটা বদলানোর কাজ তাঁর মতো নিখুঁত ও মৌলিকভাবে আর কেউ করতে পারেন নাই।' সালাউদ্দীন আইয়ুব বললেন, 'এটা তো একটা বই। আরও আছে। নেরুদা আর লোরকার কবিতাও নিজের মতো করে এখানে লিখেছেন অনেকে।' সেই আড্ডা রাত এগারোটা পার হয়ে যায়।..." [৪৯]।

উদ্ধৃতাংশে আরও একটি বিষয় এসে পড়েছে, আর তা হলো বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রেরেণুবৃত্তি! এমন দাঁতভাঙা তৎসম শব্দ দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এর সোজাসাপ্টা মানে হলো রচনাচুরি; অর্থাৎ অন্যের মেধাকর্ম নিজের বলে দাবি করা। হুমায়ুন আজাদ

৪৯. চঞ্চল আশরাফ, সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ যখন আমি... (কিস্তি ১), বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, ২৮ এপ্রিল ২০০৮। দেখুন: https://arts.bdnews24.com/?p=1465 [http://archive.is/Hs2Ya]

নিজেও এই কাজ করেছেন, বেশ পাকাপোক্তভাবেই করেছেন।[৫০] সর্বপ্রথম এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সম্ভবত আহমদ ছফা *মানবজমিন* পত্রিকায় লেখা এক প্রবন্ধে। একুশে পদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত বাংলাদেশি নাট্যকার, অভিনেতা ও ভাষাসৈনিক মমতাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন,

> "হুমায়ুন আজাদ অত বড় লেখক না; মাঝারি মানের লেখকও না। অথচ উল্টাপাল্টা কথা বলে আর বিদেশি বই নকল করে অনেক বড় লেখক হয়ে গেছে।"[৫১]

নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উঁচু ধারণা ছিল ড. আজাদের মন জুড়ে। নিজের কথার ভিন্নমত খুব কমই সহ্য হতো উনার। চঞ্চল আশরাফের স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে :

> "আমি লক্ষ করেছি, বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক তাঁকে পছন্দ করতেন না। ঈর্ষাই তার একমাত্র উৎস বা কারণ, আমার তা মনে হয় নি। তার স্পষ্টবাদিতা, যা অনেকের ভাবমূর্তির জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতো; নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উঁচু ধারণাজনিত অহঙ্কার—এই দু'টি কারণেও অনেকে তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না।"[৫২]

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদারের ভাষ্যে জানা যায়:

> "নিজের কোনও কথা বা লেখার ভিন্নমত একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না হুমায়ুন আজাদ। মনে হতো যা তিনি বলেছেন, সেটাই ধ্রুব, এর কোনও অন্যথা হতে পারে না। ভিন্নমত এলে এতটাই হিংস্র হয়ে উঠতেন যে তাঁকে তখন বিকারগ্রস্ত মনে হতো। 'আমার অবিশ্বাস' কিনেছিলাম অনেক আগ্রহ নিয়ে। পড়ার পরে ততটাই হতাশ। আমরা যারা ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে এর চেয়ে অনেক উন্নত মানের বই পড়ে ফেলেছিলাম একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই বিভিন্ন পাঠচক্রে ও

---

৫০. জাকারিয়া মাসুদ, সংবিৎ; পৃ. ১১০-১২২ (ঢাকা: সমর্পণ প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। বেস্ট সেলার এই গ্রন্থে লেখক একেবারে মূল বই ও পৃষ্ঠা নাম্বার ধরে ধরে দেখিয়েছেন কীভাবে হুমায়ুন আজাদ রচনা চুরি করেছেন।

৫১. চঞ্চল আশরাফ, সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ, যখন আমি... (কিস্তি ৯), বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর, ২৭ জানুয়ারি ২০১০। দেখুন: https://arts.bdnews24.com/?p=2616 [http://archive.is/QDoiq]

৫২. চঞ্চল আশরাফ, শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ, যখন আমি তাঁর ছাত্র; অক্টোবর ২৫, ২০০৭, বিডিনিউজ২৪। দেখুন: http://arts.bdnews24.com/?p=132 [http://archive.is/MKpbS]

রাজনীতির ক্লাসে।"[৫৩]

এমন স্বেচ্ছাচারি-অহংকারী মনোভাব উনার অবিশ্বাসের একটি কারণ বলা যেতে পারে। নিজেকে স্বীয় অবস্থান থেকে অনেক উঁচুতে মনে করার কারণেই কি উনার সত্য অনুধাবনের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল?

চলুন, এই প্রশ্ন মাথায় রেখে এগিয়ে যাই আমরা। আরও খোঁজ করলে আমরা দেখতে পাব, ড. আজাদের অবিশ্বাস বেছে নেওয়ার পিছে আরেকটি কারণ হলো পশ্চিম-প্রীতি। তিনি লিখেন :

> "যখন আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্পকলা, বিশশতকের স্বভাব বিষয়ে পড়া শুরু করি আমি কৈশোর পেরিয়ে নতুন যৌবনে পড়ার চাঞ্চল্যকর, ভালো লাগতে থাকে ওই কবিতার অভাবিত চিত্রকল্প, অপ্রথাগত সৌন্দর্য, এতোদিন ধ'রে শেখা অনেক কিছুকেই মনে হ'তে থাকে হাস্যকর, তখন বহু বইয়ে বিশশতকের একটি ব্যাখ্যায় আমি আহত হই। বহু সমালোচক, এখন তাঁদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি আমি, বিশশতককে নিন্দা করেন বিশ্বাসহীনতার শতক ব'লে তাঁদের কাছে শতকটিকে মনে হয় মরুভূমি-বিশ্বাসহীনতার মরুভূমি, যা টিএস. এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড।" (পৃ. ৩১)

ড. আজাদের কাছে আধুনিকতা মানেই হলো পশ্চিমা বস্তুবাদী চিন্তাধারা। পশ্চিমা বস্তুবাদী প্রথায় জড়িয়ে তিনি অনেক কিছুকেই হাস্যকর ভেবেছেন। পশ্চিমের প্রেমে এতটাই মজেছিলেন যে, চোখের সামনে থাকা জ্বলজ্যান্ত প্রমাণও তার অনুভূত এই হাস্যরসে ভাটা আনতে পারেনি। বিশশতকের যে ব্যাখ্যায় তিনি আহত হয়েছিলেন, তা শুধু আহত হওয়ার মতো নয় বরং নিষ্ঠুর বাস্তবতায় আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা; ধর্মহীন মানুষের হাতের কামাই, অজস্র মৃত্যু আর মহাসাগরসম রক্তের ঢেউ; যা আছড়ে পড়ে মানব ইতিহাসের পাতাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে বারবার। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)

নানা তথাকথিত আধুনিক বইপত্র পড়ে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন বস্তুবাদী মতামত উনার মাথায় কিলবিল করতে থাকে, যা উনার অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করেছিল। দুঃখের বিষয় হলো, এ সকল মত নিজের অ্যাজেন্ডার সাথে মিলে যাওয়ায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেগুলো যাচাইবাছাই করেননি। (অধ্যায় ৩ দ্রষ্টব্য) পশ্চিমের

---

৫৩. জাকির তালুকদার, বিতর্কে জড়ানো আহমদ ছফা, হুমায়ুন আজাদ, অন্য লেখক; এনটিভি অনলাইন, ১২ আগস্ট ২০১৫। দেখুন: http://m.ntvbd.com/arts-and-literature/17385/বিতর্কে-জড়ানো-আহমদ-ছফা-হুমায়ুন-আজাদ-অন্য-লেখক [http://archive.is/crSpF]

গতানুগতিক প্রথায় জড়িয়ে সকল ধর্মকেই নিছক প্রথা বলে ছুড়ে ফেলতে চেয়েছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, অধ্যাপকের জীবনে তাকালে ফুটে ওঠে, তিনি নিজেও প্রথা মেনেছেন, তবে সুবিধামতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই স্যার দুজন সব প্রথা ভাঙেননি, ভাঙতে পারেননি। উনার গুণগ্রাহী ছাত্র ফরিদ কবিরের স্মৃতির পাতায় পাওয়া যায় :

> "হুমায়ুন আজাদ আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন! আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বাংলা আমার সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট ছিলো! জীবনে তার সঙ্গে অনেক বেয়াদবি আমি করেছি! উত্যক্তও তাকে কম করি নি! তার সামনেই আমি সিগারেট খেতাম! একবার এটা নিয়ে আমাকে কথাও শুনিয়েছিলেন! আমাকে দেখিয়ে তার এক সহকর্মীকে বলেছিলেন, দ্যাখো, আমাদের শিক্ষকদের সামনে দাঁড়ালে আমাদের হাঁটু কাঁপত! আর, এই বদমাশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে!" [৫৪]

প্রথাবিরোধী মানুষ হিসেবে উনার তো শিক্ষকের সামনে সিগারেট খাওয়ার প্রশংসা করার কথা ছিল। নিজেও তো ধূমপান করতেন। উনার তো পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলা দরকার ছিল, শাবাশ বেটা! তোরাই আমার যোগ্য ছাত্র, নে এবার বিড়িটা দে, দুটো টান দিই! তা করেননি।

উনার আরেক গুণমুগ্ধ ছাত্র কবি চঞ্চল আশরাফের স্মৃতির পাতা থেকে জানা যায়, তিনি প্রথাবিরোধী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিবাহিত ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য (!) হলগুলোতে আলাদা ব্যবস্থা রাখার কথা ভেবেছিলেন![৫৫] সেই তিনিই এই সামান্য ধূমপান সহ্য করতে পারলেন না কেন! অথচ উনি নিজেই একবার চঞ্চল আশরাফকে বলেছিলেন, সিগারেট খাওয়ার সাথে শ্রদ্ধার কোনও সম্পর্ক নেই, যেমন নেই পান খাওয়ার সাথে![৪০] ফরিদ কবিরের কলমে আরও জানা যায় :

> "আমাদের সামনে দাঁড়াতেই জাহিদ হায়দার জিজ্ঞেস করে বসলেন, হুমায়ুন আজাদ, আপনি কেমন আছেন? প্রশ্ন শুনেই তিনি ক্ষেপে গেলেন! জাহিদ হায়দারকে বললেন, তুমি আমার ছাত্র, তুমি আমার নাম ধরে ডাকতে পারো না!

---

৫৪. ফরিদ কবির, আমার দেখা হুমায়ুন আজাদ; সাম্প্রতিক (ব্রাত্য রাইসু সম্পাদিত), ১৪ অগাস্ট ২০১৬। দেখুন: http://shamprotik.com/আমার-দেখা-হুমায়ুন-আজাদ [http://archive.is/OBP23]

৫৫. চঞ্চল আশরাফ, সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ, যখন আমি তার ছাত্র; কিস্তি ৬, বিডিনিউজ২৪, ৬ অক্টোবর, ২০০৮। দেখুন: http://arts.bdnews24.com/?p=1925 [http://archive.is/aU08E].

জাহিদ হায়দার জবাব দিলেন, আপনাকে আমি একজন আধুনিক মানুষ মনে করেছিলাম! কারণ আপনাকেও শামসুর রাহমানকে নাম ধরেই ডাকতে দেখেছি!

হুমায়ুন আজাদ বললেন, তুমি আর আমি এক নই। জাহিদ হায়দার জবাব দিলেন, রাহমান ভাই আপনার এক দশকের সিনিয়র, আপনি তাঁকে নাম ধরে ডাকতে পারলে আমি কেন আপনাকে নাম ধরে ডাকতে পারবো না।

হুমায়ুন আজাদ তখন এক বেমক্কা জবাব দিলেন যেটি শোনার জন্য আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না! তিনি বললেন, দেখো, আমি এমএ পাশ, আর শামসুর রাহমান তো বিএ পাশ!" [৩৮]

প্রথাবিরোধী হিসেবে উনার কি উচিত ছিল না এমন সরাসরি নাম ধরে ডাকার প্রশংসা করা? তিনি যে পশ্চিমের গুণে মুগ্ধ সেসব জায়গায় তো শিক্ষককে নাম ধরেই সম্বোধন করে ছাত্ররা। তিনি কি প্রথাগত সার্টিফিকেটের বড়াই করে প্রথার জালে নিজেকে জড়িয়ে নেননি? প্রথাবিরোধী হিসেবে উনার উচিত ছিল সার্টিফিকেটের প্রথা বর্জন করা। একজন প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে উনার উচিত ছিল উনার সম্পর্কে অন্যের সমালোচনাকে মূল্যায়ন করা। যদিও এটা সাধারণ সৌজন্যবোধের অন্তর্গত।

সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে বিভিন্ন নিয়ামক পাওয়া যায় যা অধ্যাপক সাহেবকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমার গবেষণায় যে কয়টা নিয়ামক পাওয়া যায় সেগুলো হলো—স্বভাবগত স্বেচ্ছাচারিতা, বাল্যকালে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, শিক্ষকদের প্রভাব, মাত্রাতিরিক্ত আত্মগরিমা, জ্ঞানের অহংকার, পশ্চিমপ্রীতি, প্রবৃত্তির উপাসনা প্রভৃতি।

সারমর্ম

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম অবিশ্বাসীর বিশ্বাসের স্বরূপ। নানারঙা বিশ্বাস নিয়ে তাদের কারবার। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ নাকি প্রশ্ন ছাড়া কিছু মানতে চাইতেন না; কিন্তু তিনি চোখবন্ধ করে মেনে নিয়েছেন আমাদের এই বিশ্বজগৎ, ইন্দ্রিয়ের রঙচঙা অনুভূতিগুলো সবকিছুই বাস্তবে অস্তিত্বশীল। কিন্তু উনার দর্শনে বিচার করলে তা অপ্রমাণিত বিশ্বাসের শামিল। স্রষ্টা নেই, পরকাল নেই বলে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়েছেন—কিন্তু তা নিছক অন্ধবিশ্বাস। তা স্বীকার করে নিয়েছেন নাস্তিক গবেষকগণই। কিন্তু অধ্যাপকের বিশ্বাস বড়ই দৃঢ়, তাই স্বীকার করার সৎসাহস হয়নি।

উনি বিশ্বাস করেছেন যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা উনাকে সত্যের কাছে পৌঁছে দিবে, যে চিন্তা-ক্ষমতাকে বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস করা যায় না। উনি তারপরও বিশ্বাস করেছেন। বিজ্ঞানকে প্রমাণিত সত্য মনে করে ধর্মের ওপর আঘাত হেনেছেন, অথচ সেই বিজ্ঞানই একগাদা অপ্রমাণিত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা বেমালুম চেপে গেছেন। আসলে উনি তা জানেনেই না।

প্রথাবিরোধিতার ফুলঝুরি ফুটানো মানুষটি নিজের তৈরি প্রথার বলয়ে ঘুরপাক খেয়েছেন। স্বভাবগত স্বেচ্ছাচারিতা, বাল্যকালে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, শিক্ষকদের প্রভাব, মাত্রাতিরিক্ত আত্মগরিমা, জ্ঞানের অহংকার, পশ্চিমপ্রীতি, প্রবৃত্তির উপাসনা প্রভৃতি তাকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

অধ্যায়

১ বিশ্বাসের সাতকাহন

প্রাণোচ্ছল-জাগরী

ভারত মহাসাগরের বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থিত এক জনমানবহীন দ্বীপের উপাখ্যান। এক হরিণী মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার প্রিয় শাবকটি হারিয়ে গেছে। শাবকটির খোঁজে হরিণী চঞ্চল চোখে সারা দ্বীপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে জানত না দলছুট হয়ে পথ হারিয়ে ফেলা শাবকটি শিকারে পরিণত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছে। হঠাৎ একটি বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠল। সে ভাবল, তার ছোট্ট বাবুটি বুঝি মাকে খুঁজে না পেয়ে বুক ভাসিয়ে কাঁদছে। অস্থির চিত্তে কান্নার শব্দ অনুসরণ করতে শুরু করল। শেষমেশ এক সিন্দুকের কাছে এসে দাঁড়াল হরিণী।

কান্নার আওয়াজ ভেতর থেকে আসছে। সে তার খুর দিয়ে ডালায় আঘাত করতে থাকল। এক সময় ডালা আলগা হয়ে খুলে পড়ল। সে দেখল এক ফুটফুটে বাচ্চা আকুল হয়ে কাঁদছে। হরিণী জানতো না যে এটা মানবশিশু। বাচ্চাটাকে দেখে তার এমন মায়া হলো যে, সে এই শিশুকে নিজের শাবক ভেবে দুধ পান করাল। হরিণীটির সাথে এই ফুটফুটে মানবশিশুর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল, মায়ের সাথে সন্তানের যেমন সম্পর্ক থাকে। বাচ্চাটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল। হরিণীটি সব সময় বাচ্চাটিকে চোখে চোখে রাখত, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করত। এর মাঝে বাচ্চাটি অন্যান্য পশুপাখির ডাক নকল করা শিখল, পাতা দিয়ে ভাঙাচোরা পোশাকও বানাতে শিখল।

সাত বছরে পার করতেই তার হরিণী মা বয়সের ভারে নুব্জ্য হয়ে পাড়ি জমাল অন্যলোকে। হরিণীর মৃত্যু তাকে নির্ভরতার জীবন থেকে বের করে অন্বেষণ ও আবিষ্কারের এক জীবনের দিকে ঠেলে দিলো। নিজের হরিণী মায়ের মৃত্যু সে মেনে নিতে পারছিল না। দুঃখে কাতর হয়ে তার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সে ভাবল হরিণীকে এ অবস্থায় ফেলে রাখলে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে মৃত্যুর হেতু খুঁজে বের করতে পারলে অন্য কাউকে হয়তো সে সাহায্য করতে পারবে। বাহ্যিক কোনও ত্রুটি খুঁজে

না পেয়ে অবশেষে হরিণীর দেহ বিদীর্ণ করে দেহের ভেতর সে অনুসন্ধান শুরু করল।

সে অনুধাবন করতে শুরু করল যে দেহের প্রতিটি অঙ্গেরই নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে, যথাযথ কাজ করার জন্য দেহ সুবিন্যস্ত। সে যখন হৃদপিণ্ডের ভেতর প্রবেশ করল সে দেখল ডানদিকের গর্তে রক্ত জমাট বাঁধা, কিন্তু বাম দিকের অংশটি শূন্য। সে ভাবল হয়তো এখানেই লুকিয়ে আছে মৃত্যুর কারণ। এমন আরও পরীক্ষা চালাল সে। জীবনের জন্য অপরিহার্য প্রাণশক্তির স্বরূপ নিয়ে তার চিন্তার সাগরে ঢেউ উঠল। এই মুখ্য জিনিসের উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান, দেহের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে সে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল দেহ নয়, বরং প্রাণীর সমস্ত কর্মের মূলে রয়েছে প্রাণশক্তি বা আত্মার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

এই ভাবনার পথেই সে আশ্চর্য এক জিনিস আবিষ্কার করে বসল! একদিন হঠাৎ বেতের ঝাড়ে বেতে বেতে ঘর্ষণের ফলে কী যেন জ্বলে উঠল! সে ভয় পেল বেশ, আগে তো কখনও এমন জিনিস দেখেনি। সে দেখল যা কিছু এর সংস্পর্শে আসছে, তাই সে গিলে ফেলে নিজের আকৃতিতে পরিণত করছে। সে ভাবল ধরে দেখি একটু, আর তা করতে গিয়ে পুড়ে গেল আঙুল। সে তো আর বুঝতে পারেনি যে, সে আগুন আবিষ্কার করে বসেছে। সে বুঝল একে অন্যভাবে আয়ত্তে আনতে হবে। আগুন সম্পূর্ণ লাগেনি এমন একটি কাঠি নিয়ে তার আস্তানার দিকে হেঁটে চলল। খড়পাতা জুটিয়ে আগুনকে জিইয়ে রাখল, দিন রাত আগুনের যত্ন নিল।

সে অবাক হয়ে দেখল অন্য সব বস্তু নিচের দিকে পতিত হয়, অথচ এই আগুন ওপরের দিকে যেতে চায়। সে বুঝল অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের থেকে এটি ভিন্ন। বস্তুটির শক্তি পরীক্ষার জন্য অন্যান্য জিনিসের সাথে সাথে সাগর থেকে ভেসে আসা মাছও ছুড়ে দিলো সে। কিছুক্ষণের মাঝেই ঝলসানো মাছে সুগন্ধে তার বেশ খিদে পেয়ে গেল। একটু চেখে দেখার ইচ্ছে হলো তার—বেশ সুস্বাদু তো খেতে! দিন চলতে লাগল, সে কিন্তু তার অনুসন্ধান থামায়নি, প্রকৃতির নানা দিক, প্রাণীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের সজ্জা, আকার-আকৃতি, অবস্থান নিয়ে তার গবেষণা চলতে লাগল। পাশাপাশি পশুপাখি, গাছপালা ও জড় বস্তুদের মাঝে সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য খুঁজে ফিরতে লাগল।

প্রকৃতির নানা দিকের পারস্পরিক সম্পর্ক, কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে করতে সে পদার্থ ও এর গঠন, কারণ ও প্রতিক্রিয়া, একক ও সংখ্যাধিক্য এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধারণা লাভ করতে থাকে। সে বুঝতে পারে নানারূপ বস্তুর দ্বারা গঠিত হলেও এই বিশ্বলোক যেন একই সুতোয় গাঁথা। সে ভাবল এই জগৎ কী অনন্তকাল ধরেই আছে, না কালের কোনও এক ক্ষণে এটি সৃষ্টি হয়েছে? ক্রমাগত অন্বেষণ ও

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির চর্চার ফলে এক সময় সে বুঝতে পারে এক সত্তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে।

তিনি এই বিশ্বকে পরিচালনা করেন এবং তাঁর সত্তাগুণে তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। এই অন্তর্দৃষ্টি তাকে পুলকিত করে তোলে, ওই প্রয়োজনীয় সত্তার অস্তিত্বের সামনে অন্য সকল কিছু যেন ম্লান হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে সে উপায় খুঁজতে থাকে কীভাবে সেই সত্তাকে আরও জানা যায়। তাঁর অনুসন্ধান চলতে থাকে। নির্জন দ্বীপের মাঝে সে এক প্রাণবন্ত-জাগরী!

গল্পটি পড়ে হয়তো আপনি ভাবছেন লেখক টারজান বা মোগলির গল্প থেকে কপিপেস্ট মেরে নিজে একখানা আজগুবি গল্প বানিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। টারজান, মোগলিই বরং এই গল্প থেকে ধার নিয়ে সৃষ্ট। এই গল্পটি মূলত প্রায় নয় শ বছর পূর্বে মুসলিম দার্শনিক ইবনে তুফাইল রচিত বিশ্বের প্রথম দর্শনভিত্তিক উপন্যাস *হাঈ ইবন ইয়াকজান*-এর সারসংক্ষেপ। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন মানুষ নিজের চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি, প্রাণ, নভোমণ্ডলের বিন্যাস নিয়ে গবেষণা করে কীভাবে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। প্রায় পাঁচ শ বছর আঁধারে থাকার পর 'হাঈ ইবন ইয়াকজান' সতেরো শ থেকে আঠারো শ শতকব্যাপী পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে বেস্ট সেলার গ্রন্থে পরিণত হয়।

বিশ্বাস সহজাত?

ড. আজাদ লিখেন,

> "মানুষ যতো বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রথম প্রধান উৎস পরিবার; তারপর তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার সভ্যতা। ... বিশ্বাস কারো ভেতরে থেকে সহজাতভাবে উঠে আসে না, বিশ্বাস সহজাত নয়; মানুষ নিজের ভেতর থেকে কোনও বিশ্বাস অনুভব করে না, বিশ্বাস পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক; পরিবার তাকে যে-বিশ্বাসগুলো দেয়, সেগুলোকেই সে পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব মনে করে; ভয়ে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে, লোভে সে এগুলোকে জড়িয়ে ধরে।..." (পৃ. ২৪)

অধ্যাপক সাহেব কোনও প্রমাণ ছাড়াই বুলি ছুড়েছেন যে, বিশ্বাস সহজাত নয়, কারও ভেতর থেকে সহজাতভাবে উঠে আসে না, মানুষ নিজের ভেতর থেকে কোনও বিশ্বাস অনুভব করে না ইত্যাদি। কিন্তু ঝামেলা হলো উনি ও উনার ভাবশিষ্যরা যে বিজ্ঞানের গান গেয়ে আসছেন, সেই বিজ্ঞানই কিন্তু এখন উল্টো কথা বলছে।

কগনিটিভ সাইন্টিস্ট ও বিভিন্ন ফিল্ডের গবেষকদের সংগৃহীত প্রমাণ থেকে বেশ ভালোভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে—মানব শিশু স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের পূর্বধারণা নিয়েই এই বসুধায় পদার্পণ করে। অধ্যাপক সাহেব এখন বেঁচে থাকলে কী বলতেন, সেটাই দেখার বিষয়। যাই হোক, ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক।

ধরুন, একদল শিশুকে নিয়ে কোনও জনমানবহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে রেখে আসা হলো। প্রকৃতির সাথে মিতালি করে তারা নিজে নিজেই বেড়ে উঠতে লাগল। তারা কিন্তু স্বভাবতই এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠবে যে, তাদের চারপাশের এই অবাক করা জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। পায়ের নিচের মৃত্তিকা, সামনের প্রাণোচ্ছ্বল জলধি, বয়ে যাওয়া সমীরণ, নয়নাভিরাম সবুজ গাছপালা, উদাসী নীল আকাশ—এসবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তারা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস গড়ে তুলবে যে, এই অস্তিত্বের পিছে এক স্রষ্টা অস্তিত্বশীল যিনি এসকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন।

বিগত কয়েক দশক ধরে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফল সেদিকেই জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও ডেভলোপমেন্টাল সাইন্টিস্টরা নানা কারণে ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী নন, ট্যাবু গণ্য করেন! [৪] তারপরও যে কয়জন মাঠে নেমেছেন তাদের অনেকগুলো গবেষণায় বেরিয়ে আসছে মানুষ, বিশেষত শিশুরা সহজাতভাবেই প্রকৃতিতে বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দেশ্যের ছাপ দেখতে পায়। তারা প্রাকৃতিকভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্ঞান নিয়ে জন্মায়। তাই বিশ্বাস যে কেবলই পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক এমন বক্তব্য এখন আর টিকছে না, অন্তত অধ্যাপকের সাধের বিজ্ঞান সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলোপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট এমনই একজন বিজ্ঞানী। শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণাই তার ধ্যানজ্ঞান। তার পরিচালিত গবেষণার ব্যাপারে আলাপচারিতায় *BBC Radio 4*-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> "বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে আমরা যে অগণিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি তা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিশুদের মানসের প্রাকৃতিক বিকাশের সময় আমরা আগে যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ঢের বেশি (ধারণা) গড়ে ওঠে। এই প্রকৃতিকে সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হিসেবে দেখা ও কোনও এক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সত্তাকে এই উদ্দেশ্যের পিছে ক্রিয়াশীল হিসেবে দেখার প্রবণতাও এর মধ্যে শামিল।... আপনি যদি কিছু সংখ্যক (শিশুকে) কোনও দ্বীপে রেখে আসেন আর তারা

নিজেরাই বেড়ে ওঠে, আমি মনে করি তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করবে।" [১]

ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট এ বিষয়ের ওপর বই লিখেছেন *Born Believers : The Science of Children's Religious Belief* শিরোনামে। তিনি এই বইয়ের প্রথম অংশে ডেভলোপমেন্টাল সাইকোলজি, কগনিটিভ এনথ্রোপলোজি এবং বিশেষত কগনিটিভ সাইন্স অব রিলিজিয়ন প্রভৃতি ফিল্ডের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একাট্টা করেছেন পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে। তারপর এই গবেষণার সিদ্ধান্ত আলোচনা করেছেন দ্বিতীয় অংশের ছয়টি অধ্যায় জুড়ে। তিনি মনে করেন, শিশুরা ন্যাচারাল রিলিজিয়ন তথা স্বভাবজাত ধর্মে জন্ম থেকেই বিশ্বাসী।[২]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক মনোবিজ্ঞানী (নাস্তিক) ড. অলিভেরা প্যাট্রোভিচ *পিয়ার রিভিউড* জার্নালে তাঁর গবেষণার ফল জানান,

> "কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস যে সার্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন কোনও বিমূর্ত সত্তাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে মৌলিক বিশ্বাস), এর পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়ে বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকেই বেশি বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।"[৩]

এদিকে ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষক পল ব্লুম *জার্নাল অব ডেভলোপমেন্টাল সাইন্স*-এ প্রকাশিত এক পেপারে জানান, যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা ও সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ধর্মকে অবহেলা করে আসছিলেন ডেভলোপমেন্টাল সাইন্টিস্টরা। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে পরিচালিত কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানাচ্ছে কিছু সার্বজনীন ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়েই শিশুরা জন্মায়, যেমন : ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব, পরকালে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই বিশ্বাসগুলোই বীজ হিসেবে কাজ করে, যা থেকে পরবর্তী কালে ধর্মের বৃক্ষ তার ডালপালা মেলে ধরে।[৪]

---

১. M. Beckford, Children are born believers in God, academic claims. The Telegraph, 24 Nov 2008

২. Dr. Justine L. Barrett, Born Believers: The Science of Children's Religious Belief; chapter 6: Natural Religion (Epub Edition, Free Press 2012)

৩. Olivera Petrovich, Key psychological issues in the study of religion; Psihologija (2007), Volume 40, Issue 3, p. 360

৪. Paul Bloom, Religion is natural (2007), Journal of Developmental Science 10:1, p. 147-151

ড. আজাদ দাবি করেছেন মানুষ যত বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রথম প্রধান উৎস পরিবার; তারপর তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার সভ্যতা। নাস্তিকগুরু রিচার্ড ডকিন্সও স্বীয় গ্রন্থে একই দাবি উত্থাপন করেছেন। এর একটা গাল-ভরা নাম দিয়েছেন কেউ কেউ—ইনডক্ট্রিনেশান হাইপোথিসিস। [৫] অর্থাৎ স্রষ্টা বা ধর্মে বিশ্বাস মূলত পিতামাতা বা সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়ার ফল। কিন্তু বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাস্তিক) গবেষক ডেবোরাহ কেলেমেন বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত জানান :

> "(অতিপ্রাকৃত সত্তায়) ধর্মীয় বিশ্বাস বাহ্যিক, সামাজিক উৎস থেকে নয় বরং, প্রাথমিকভাবে মানুষের ভেতর থেকেই উৎপত্তি হয়। এ বিশ্বাস মানব মনের মৌলিক উপকরণ।"[৬]

সেক্যুলার গবেষক এন্ড্রু নিউবার্গের মতে,

> "আমাদের মস্তিষ্ককে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে মানুষের জন্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ খুবই সহজ একটি ব্যাপার, গবেষণার ফল নিঃসন্দেহে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।" [৭]

এ কারণে দেখা গেছে ধর্মকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা কখনোই সফলতা পায়নি। নাস্তিক-কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীন সেই সাক্ষ্যই বহন করে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রজার ট্রিগ-এর মতে :

> "(এই গবেষণা) ইঙ্গিত বহন করে যে, ধর্মকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী কারণ ধর্মবিশ্বাস মানব মনে গ্রথিত বলেই প্রতীয়মান হয়... " [৮]

---

৫. Dr. Justine L. Barrett, Born Believers: The Science of Children's Religious Belief; chapter 3: Idntifying the maker - How children learn about god

৬. Patrick McNamara Ph.D., Wesley J. Wildman (etd.), Science and the World's Religions; vol. 02 (Persons and Groups), p. 206, 209 (Publisher ABC-CLIO , July 19, 2012)

৭. Elizabeth King, I'm An Atheist. So Why Can't I Shake God?. The Washington Post, February 4, 2016

৮. Tim Ross, Belief in God is part of human nature - Oxford study. The Telegraph, 12 May 2011

সাম্প্রতিক-কালে আরও অনেক সেক্যুলার গবেষক তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে নতুন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি তত্ত্ব হলো, *Strong Naturalness Theory*, যা পূর্বের প্রভাবশালী *Anthropomorphism Theory* -কে তথ্যপ্রমাণের দ্বারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। *Strong Naturalness Theory*-এর বক্তব্য হলো, ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব স্বয়ংক্রিয় ও অভ্যন্তরীণ এবং তা প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুদের মাঝে উদ্ভূত হয়...।[৯]

ড. আজাদ বলতে চেয়েছেন, মানুষের স্বভাব হওয়া উচিত অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হচ্ছে আলো; আর বিশ্বাস মানুষকে পরিণত করে জড়বস্তুতে! (পৃ. ৭৬)। দুঃখের বিষয় হলো ধর্মকে আঘাত করার জন্য তিনি যে বিজ্ঞানের হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন, সেই বিজ্ঞানই উল্টো ব্যাকফায়ার করছে। নাস্তিক বিজ্ঞানী গ্রাহাম লিউটনের মতে, নাস্তিকতা সাইকোলজিক্যালি অসম্ভব। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, নিজেকে নাস্তিক বলে দাবিকারী লোকদের মাঝেও মেটাফিজিক্যাল (অতিপ্রাকৃত) বিশ্বাস বিরাজমান।[১০]

মনোবিজ্ঞানী ড. অলিভেরা পেট্রোভিচের গবেষণাও বলছে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসই বরং সহজাত। গবেষণার আলোকে তিনি বলেন : "নাস্তিকতা নিঃসন্দেহে অর্জিত অবস্থা।"[১১] একই মত দিয়েছেন সেক্যুলার গবেষক প্রফেসর রবার্ট ম্যাকাওলি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত তাঁর *Why Religion is Natural and Science is not* গ্রন্থে।[১২]

ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট 'বর্ন বিলিভার্স' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের নামই দিয়েছেন- *Is Ahesim Unnatural?* অর্থাৎ নাস্তিকতা কি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ? এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কেন নাস্তিকতা কোনও ডিফল্ট পজিশান নয়। নাস্তিক মনোবিজ্ঞানী প্যাসকেল বয়ার *Nature* জার্নালে এ বিষয়ে আলোচনার ইতি টেনেছেন এই বলে :

---

৯. P. McNamara Ph.D., W. J. Wildman (etd.), Science and the World's Religions; vol. 02, p. 210; এ বিষয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য ভিডিও দেখুন: http://callingtotheone com/is-believe-in-god-natural

১০. Nury Vittachi, Scientist's Discover that Atheists might not Exist, and that's not a Joke. Science 2.0, 6 July 2014

১১. Zwartz, B. (2008). Infants 'Have Natural Belief In God'. Available at: http://www.theage.com.au/national/infants-have-natural-belief-in-god-20080725-313b.html

১২. Robert N. McCauley, Why Religion is Natural and Science is not; p. 221 (Oxford: Oxford University Press, 2011)

"...অন্যদিকে, নাস্তিকতা হলো সাধারণত আমাদের সহজাত চেতনার (*natural cognitive disposition*) বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত, শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফসল, এমন কোনও ভাবাদর্শ নয় যে সহজেই প্রচার করা যাবে।" [১৩]

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, কেউ নাস্তিকতা বেছে নেওয়ার মানে হলো মানব মননের সহজাত প্রবণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আমাদের মনন যেদিকে অনুরক্ত ও যেভাবে গঠিত তার বিপরীতে যাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকা।[৭] কথা এখানেই শেষ নয়, স্রষ্টার অস্তিত্বের পূর্বজ্ঞান মানব মনে এতই প্রভাবশালী যে, বিবর্তন তত্ত্ব বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ হজম করা শিশু-পরিণত সবার জন্যই কঠিন। ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট বলেন :

"শিশুর মস্তিষ্কের সাধারণ ও প্রাকৃতিক বিকাশ তাদের ঐশ্বরিক সৃষ্টি ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনে বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে, বিবর্তনতত্ত্ব মানব মস্তিষ্কের জন্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ : যা তাদের জন্য বিশ্বাস করা কষ্টকর।"[১]

ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট 'বর্ন বিলিভার্স' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে (*Identifying the maker)* এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেন শিশুরা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ গ্রহণ করতে পারে না তার বিভিন্ন কারণ উপস্থাপন করেছেন। এ সংক্রান্ত প্রায় সকল গবেষণা পত্র ও অ্যাকাডেমিক বইপত্রে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মারগারেট ইভানস পরিচালিত গবেষণার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি গবেষণায় খুঁজে পান, দশ বছর বয়সের নিচের বাচ্চারা মানুষ ও পশুপাখির উৎপত্তির কারণ হিসেবে বিবর্তন নয়, বরং একচেটিয়াভবে কোনও স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট হওয়াকে প্রাধান্য দেয়। অথচ দেখা গেছে তাদের পিতামাতা ও শিক্ষকেরা বিবর্তনবাদকেই সমর্থন করে।[১৪]

---

১৩. Pascal Boyer, Religion: Bound to Believe?; Nature, Vol. 455, p. 1038-1039 (23 October 2008)

১৪. Yujin Nagasawa, The Existence of God : A Philosophical Introduction; p. 57

ফিতরাহ্

আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগেই পবিত্র কুরআন স্রষ্টা অস্তিত্বকে জানার, তাঁকে চেনার ও মেনে চলার সহজাত অনুভূতিকে ফিতরাহ্ বলে অভিহিত করেছে। ইসলামি চিন্তাধারা অনুযায়ী মহান আল্লাহ সকল মানুষকেই সহজাত প্রকৃতি তথা ফিতরাহ্-এর ওপর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ... ﴾

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাহ্)-এর অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনও পরিবর্তন নেই..." [ভাবার্থ, আল কুরআন, সূরা রুম, ৩০ : ৩০]

মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতক শিশুই "ফিতরাহ্"-এর ওপর জন্মায়। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।[১৫] অর্থাৎ ফিতরাহ্'-র বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে ইসলাম বলতে চায় যে, ইসলামই মূলত ফিতরাহ্'-র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সমকালীন ভাষায় যাকে ফিতরাহ্'-র এক্সটেন্ডেড ভার্সন বা ফিতরাহ্ *2.0* বলা যেতে পারে। অন্য সকল ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস কোনওটিই ডিফল্ট ফিতরাহ্'-র সাথে একই সুতোয় গাঁথা নয়। ফিতরাহ্ তথা স্রষ্টার প্রতি সহজাত বিশ্বাসের এই ধারণা প্রায় নয় শ বছর পর পশ্চিমা দর্শনে প্রবেশ করে প্রটেস্টান্ট রিফর্মার জন ক্যালভিনের হাত ধরে, যার নাম দেওয়া হয় *Sensus Divinitatis*।

ফিতরাহ্'-র অনুভূতির স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় আলোচিত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্সের মুখ থেকেও। এক বিতর্কে তিনি বলেন :

"আমার মনে হয়, আপনি যখন এই জগতের সৌন্দর্য অবলোকন করেন, এবং ভেবে আকুল হন যে, কীভাবে এই অবাক মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এল; আপনি স্বভাবতই এক সশ্রদ্ধ বিনয়, এক মুগ্ধতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন। এবং আপনি কোনও সত্তাকে প্রায় উপাসনা করার ইচ্ছা অনুভব করেন। আমিও এমনটি

---

১৫. বুখারি, আস-সহীহ, জানাযা অধ্যায়; খণ্ড ০২, হাদীস ১২৭৫-১২৭৬ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪)

অনুভব করেছি, অনুভব করেছেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা, যেমন-কার্ল স্যাগান এমন অনুভব করেছেন, আইনস্টাইনও এমন অনুভব করেছিলেন। আমরা সকলেই একরকম ধর্মীয় ভক্তি অনুভব করেছি, এই মহাবিশ্বের সৌন্দর্য দেখে, প্রাণের জটিলতা দেখে; মহাকাশের বিশালতা, ভূতাত্ত্বিক সময়ের পুরো ব্যাপ্তি অনুমান করে। সেই সশ্রদ্ধ বিনয় ও উপাসনার অনুভূতিকে কোনও বিশেষ কিছু—কোনও সত্তা, কোনও শক্তিকে উপাসনা করার ইচ্ছায় রূপ দিতে প্রলুব্ধ হয়েছি। আপনারা হয়তো সে অনুভূতিকে এক স্রষ্টা, এক বিনির্মাতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করতে চান।"[১৬]

কিন্তু এ সত্য অনুভূতি গোপন করতে তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। বলাই বাহুল্য এই পদক্ষেপ মূলত বিজ্ঞানের ভুল অনুধাবনের ওপর দণ্ডায়মান। বিজ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে নীরব, কারণ এই প্রশ্ন তার সীমার বাইরে। পাশাপাশি কগনিটিভ সাইকোলজির ফিল্ডে চলা গবেষণা তার অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

ড. আজাদ বলতে চেয়েছেন বিশ্বাস শুধুমাত্র পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক, তাই এর কোনও সত্যতা নেই, কোনও বিশ্বাস পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব নয়। (পৃ. ২৪) যদিও এটা একটা কুযুক্তি (*Genetic Fallacy*)। বিশ্বাস বা কোনও তথ্য পরিবার বা সমাজ থেকে পাওয়া এর ভুল হওয়াকে আবশ্যকীয় করে না। তাই যদি হয় তবে একই মানদণ্ডে অবিশ্বাসেরও সত্যতা নেই। হুমায়ুন আজাদের পুত্র অনন্য আজাদও তো নাস্তিক। সুতরাং নাস্তিকতা অসত্য, ধ্রুব নয়—এই যুক্তি তারা মানবেন কি? বিশ্বের নাস্তিক প্রধান দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, পিতামাতা যাদের নাস্তিক, সন্তানও নাস্তিক।

নাস্তিকেরা ধার্মিকদের দিকে আঙুল তুলে বলতে চায়, আমরা ধর্ম চাপিয়ে দিই। এই কাজ কিন্তু ইতিহাস জুড়ে তারাও করে এসেছে, এবং এখনও করছে। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) এদিকে আবার গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে, অর্থাৎ ইনডক্ট্রিনেশান হাইপোথিসিসের প্রয়োগ করছে তারাও! নাস্তিক গবেষক ডেবোরাহ কেলেমেন গবেষণা পরিচালনা করেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের গল্প কোনওভাবে শিশুদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে প্রকৃতি ও প্রাণ যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন সহজাত চিন্তাধারা থেকে

১৬. Richard Dawkins vs John Lennox, The God Delusion Debate. University of Alabama-Birmingham's Alys Stephens Center, October 3, 2007

তাদের সরিয়ে আনা যায় কি না![১৭] ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে দার্শনিক এলিসন গোপনিক তো তাদের এমন গবেষণাকে আনন্দের সাথে স্যালুট জানিয়েছেন। তিনি লিখেন :

> "মনোবিজ্ঞানের নতুন গবেষণা থেকে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেবোরাহ কেলেমেন ও তাঁর সহকর্মীরা বোঝার চেষ্টা করেছেন, বিবর্তনতত্ত্ব কেন হজম করা কঠিন। ... প্রাথমিক স্কুলে ওঠার আগে থেকেই শিশুরা তাদের চারপাশের জগতের জটিলতার ব্যাখ্যা হিসেবে পরম স্রষ্টাস্বরূপ কোনও ডিজাইনারকে দায়ী মনে করে—এমনকি যাদের নাস্তিক হিসেবে বড় করা হয় তারাও।..."[১৮]

তিনি আরও বলেন : গবেষণায় দেখা গেছে অনেক সেক্যুলার মানুষ যারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে তারা নিজেরাও আসলে একে বুঝতে পারে না। তাই চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন থেকেই বাচ্চাদের মাথায় সঠিক তত্ত্ব ঢুকাতে হবে সহজাত ভুল (!) তত্ত্ব জেঁকে বসার আগেই![১৪]

তা ছাড়া বাপদাদা থেকে প্রাপ্ত প্রথা সঠিক ভেবে যাচাইবিহীন অন্ধ অনুসরণ ইসলামও সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে চিন্তা করার জন্য, যারা চিন্তা করে না তাদের নিন্দা করা হয়েছে। অন্ধভাবে পূর্বপুরুষদের অনুসরণকে নিন্দা করা হয়েছে বারবার। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবিল্ ইজ্জ্ হানাফি (ﷺ) (১৩৩১-১৩৯০ খ্রি./৭৩১-৭৯২ হি.) বলেছেন ,

> "...যে ব্যক্তি জানাশোনা ও দিশা ছাড়াই বাপদাদার ধর্মবিশ্বাসের অনুসরণ করে, তার কাছে পরিস্ফুট হওয়া সত্য থেকে সরে পড়ে, তবে সে মূলত তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : <যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে : 'বরং আমরা বাপদাদাদের যে অবস্থায় পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' যদি তাদের বাপদাদারা কোনও কিছু না বুঝে থাকে ও সঠিক পথের দিশা না পেয়ে থাকে তবুও কি (তারা তাদের অনুসরণ করবে)?> (সূরা বাকারা, ২ : ১৭০)

এটাই হলো ইসলাম ধর্মে জন্ম নেওয়া অনেক মানুষের অবস্থা। তারা বিশ্বাস ও

১৭. Deborah Kelemen et. al, Young Children Can be Taught Basic Natural Selection Using a Picture-Storybook Intervention; Journal of Psychological Science, Vol. 25, Issue. 04, p. 893-902 (April 2014)

১৮. Alison Gopnik, See Jane Evolve: Picture Books Explain Darwin, Wall Street Journal, April 18, 2014. http://www.bu.edu/cdl/2014/04/22/see-jane-evolve-picture-books-explain-darwin

কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বাপদাদাদের অনুসরণ করে যায়। এগুলো যদি ভুলও হয় তবুও তারা সে ব্যাপারে সচেতন হয় না। এরা পরিবেশের দ্বারা মুসলিম, সজ্ঞানে মুসলিম নয়। এমন ব্যক্তিকেই যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে : <কে তোমার প্রভু?> সে বলবে : <হায় হায়, আমি তো জানি না। আমি মানুষকে কিছু একটা বলতে শুনতাম আর আমিও তাই বলতাম।>[১৯]" [২০]

মানুষের এই স্বভাবজাত ফিতরাহ্ বিভিন্ন প্রভাবকের কারণে অমানিশায় ঘিরে যেতে পারে, তার ওপর মরিচা পড়তে পারে। জানা যায়, নাস্তিক কেনেথ ক্লার্ক একদা এক স্বর্গীয় আনন্দের দোলায় শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন। তার মনে হয়েছিল তিনি স্রষ্টার হাতের স্পর্শ পেয়েছেন যেন! কিন্তু তারপরও তিনি মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যান! কেন? কারণ তিনি তাঁর জীবনকে বদলাতে চাননি, বড্ড ভালোবেসেছিলেন স্বীয় জীবনের হালচালকে।[২১]

আমার অবিশ্বাস বইটি যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বার্ট্রান্ড রাসেল কি স্বীয় ফিতরাহ্-কে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পেরেছিলেন? না, পারেননি। জানা যায়, তিনি একবার আধ্যাত্মিক জ্যোতির ঘোরে হারিয়ে গিয়েছিলেন, যার ছোঁয়ায় একেবারে বদলে যান তিনি। তবুও তিনি *Why I am Not a Christian* বইতে লিখে স্রষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান।[২২] বার্ট্রান্ডের জীবনী ঘেঁটে আরও অবাক-করা তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর কন্যা ক্যাথারিন টেইট বাবাকে নিয়ে স্মৃতিকথায় লিখেন :

> "আমি বিশ্বাস করি তিনি পুরো জীবন স্রষ্টার খোঁজে ছিলেন... বাবার মনের কোনও এক কোণে, তাঁর অন্তঃকরণের গভীরে, আত্মার গহীনে একটা খালি জায়গা ছিল, যা এককালে স্রষ্টা দ্বারা পূর্ণ ছিল। তিনি কখনোই সে খালি জায়গা অন্যকিছু দিয়ে পূরণ করতে পারেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেখা চিঠিগুলোতে তিনি এ নিয়ে লিখতেন... যুদ্ধের পরে যখন তিনি দেখলেন তাঁর জীবন বেশ ভালোই চলছে, তখন তিনি আগের মতো করে কথা বলা বন্ধ করে দেন; ধর্ম

---

১৯. বুখারি, আস-সহীহ, ইলম অধ্যায়; খণ্ড ০১, হাদীস ৮৬

২০. ইবনে আবিল ইজ্জ হানাফি, শারহ্ আল-আক্বিদা আত-তহাউইয়্যা; পৃ. ৩১৬-৩১৭ (বৈরুত, মুয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭)। মূল আরবি পাঠ নিম্নরূপ :

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم ، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه ، فهذا اتبع هواه ، كما قال تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (البقرة : ١٧٠) وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام ، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب ، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة ، بل هو من مسلمة الدار ، لا مسلمة الاختيار ، وهذا إذا قيل له في قبره : من ربك ؟ قال ؟ هاه هاه ، لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته

২১. John Bowker, God: A Very Short Introduction; p. 36 (Oxford University Press, 2014)

নিয়ে স্মৃতিকাতরতা আমাদের ঘরে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁর মাঝে (স্রষ্টার প্রতি) এক আকুলতা আমি পেয়েছি; আর পেয়েছি এক ভয়ানক অনুভূতি যে, এই দুনিয়ার নয় সে, এই জগতে তার নেই কোনও নীড়।"[২২]

বার্ট্রান্ডের নিজের স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় :

"... আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় সর্বদা ও নিয়ত ভীষণ এক ব্যথা অনুভব করি ... সে যেন কিছু খুঁজতে চায়, যা এই জগতের সীমার বাইরে, এমন কিছু যা শরীরের উর্ধ্বে এবং অসীম, সে এক আনন্দময় অনুভূতি, এক স্রষ্টার (অস্তিত্বের) অনুভূতি।"[২৩]

আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের << لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ >> অংশ ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ফিতরাহ্‌ তথা তাঁর অস্তিত্বকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।[২৪] তবে পরিবার, সমাজ, প্রবৃত্তি, পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার বা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে বসতে পারে। এই ঘোলা কাঁচ পরিষ্কার করে ভেতরে থাকা অমল আলোকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করতে পারে প্রত্যাদেশ (ওহি), যৌক্তিক আলোচনা, প্রমাণ বা কঠিন বিপদের কোনও মুহূর্ত।

আগুনের পরশমণি

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাজ্যে পরিচালিত জরিপে জানা যায়, প্রায় ২৫% শতাংশ ধর্মহীন মানুষ বিপদের মুহূর্তে, ব্যক্তিগত ক্রাইসিস বা ট্র্যাজেডিতে স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করে! তাদের মাঝে কেউ কেউ নিজেও বুঝতে পারেন না, কেন তারা প্রার্থনা করা বাদ দিতে পারছেন না![২৫] কঠিন বিপদের কোনও মুহূর্ত কীভাবে ফিতরাহ্‌-

২২. Katharine Tait, My Father, Bertrand Russell; p. 184-185 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975)

২৩. Nick Spencer, Atheists: The Origin of the Species; p. 209 (A&C Black, May 2014)

২৪. মুফতি মুহাম্মাদ শফি, তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন; খণ্ড ০৬, পৃ. ৭৩০-৭৩২ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০১২)

২৫. Harriet Sherwood, Non-believers turn to prayer in a crisis, poll finds. The Guardian, 14 Jan 2018. Available at: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/14/half-of-non-believers-pray-says-poll

কে প্রজ্বলিত করে, সে প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। কথাসাহিত্যিক ও মনোবিজ্ঞানী ড. মোহিত কামাল *মানবমনের গতিপ্রকৃতি* গ্রন্থে নাস্তিক লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সাথে এক ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছেন। তার স্মৃতির পাতায় পাওয়া যায় :

"শক্তিমান লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে একবার সমুদ্র পেরিয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। ফিরে আসার সময় হঠাৎ করেই বাতাসের গতি বেড়ে গেল। ঢেউ হলো এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। বোটের উভয় পাশ থেকে পানি ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

নাসরিন হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলছে, 'আল্লা গো ! মরে যাব নাকি! মা গো! একি! একি!' ...

বিপদে পড়লে মানুষ তার প্রিয়তম মানুষটির কথা স্মরণ করে, ছোট শিশুর মতো আচরণ করে কিংবা সবচেয়ে ক্ষমতাধর নির্ভরশীল কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। কোনও বিকৃতি ছাড়াই তার অবচেতন মনের চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটে। নাসরিনের অবচেতন চিন্তাধারা থেকেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুভূতি ওই সময়ে বেরিয়ে এসেছে।

নাসরিনের যুক্তিবাদী কলম ঘোষণা করেছে, বুদ্ধি হওয়ার পর কখনো আল্লাহ নামটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেননি, তিনি নাস্তিক। বিজ্ঞানমনস্ক নাসরিন কি 'জেনেটিক কোড' অস্বীকার করছেন না!

সমুদ্রে বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছে নাস্তিক্যবাদ তার শক্তিমান কলমের ডগা থেকে নিঃসৃত শব্দমালার শৈল্পিক কারুকাজ মাত্র, অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত অনুভূতির পুরোপুরি বহিঃপ্রকাশ নয়। অতলে নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসার বোধ জমাট বেঁধে আছে, সময় ও সুযোগ তার বিচ্ছুরণ ঘটাবেই।" [২৬]

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের কলমে পাওয়া যায় :

"আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মতো হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান।

২৬. ড. মোহিত কামাল, মানবমনের গতিপ্রকৃতি; পৃ. ৭১-৭২ (ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ,২০১৬)

বায়োপসির পর ধরা পড়ল গ্রোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছু নেই। অপারেশান করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অঙ্ক করে প্রমাণ করে দিলেন যে ঈশ্বর = $০^{১}$ এবং আত্মা = $০^{১/২}$ "।[২৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিপদ-আপদের চরম কোনও মুহূর্ত পর্দা সরিয়ে ফিতরাহ্-কে উন্মোচিত করতে পারে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু চিন্তা নাস্তিকদের অবচেতন মনে স্রষ্টার প্রতি থাকা বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়।[২৮] বাইরে বাইরে যতই বিপক্ষে কথা বলুক না কেন, গবেষণায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, তাদের অবচেতন মনে স্রষ্টা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস জমাট বেঁধে আছে।[২৯]

ফিতরাহ্-কে জাগ্রত করার আরেকটি উপায় হলো যৌক্তিক আলোচনা করা, মস্তিষ্ক চর্চায় লিপ্ত হওয়া। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই স্রষ্টা ও তাঁর প্রকৃতি নির্ণয়ে মানুষ নানা আলোচনা করে আসছে। যুক্তি ছুড়ে দিচ্ছে। অন্য কেউ আবার প্রতিযুক্তির তির ছেড়ে দিচ্ছে। তবে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষের বা বিপক্ষের দার্শনিক যুক্তিগুলোর ইলমুল ইয়াকিন বা একেবারে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। দিনশেষে দেখা যায়, বাদানুবাদ শেষে যে যেখানে থাকতে চায়, সেখানেই রয়ে যায়। যাই হোক, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপন করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

» *The Design Argument*
» *The Cosmological First Cause Argument*
» *The Kalam Cosmological Argument*
» *The Cosmological Argument of Necessary Being*
» *The Ontological Argument of Anselm*
» *The Moral Argument*
» *The Argument from Consciousness* ইত্যাদি [৩০]

---

২৭. হুমায়ূন আহমেদ, ছায়াসঙ্গী; পৃ. ২১ (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, মে ২০১০)

২৮. Jonathon Jong, Foxhole Athesim, Revisited: The Effects of Mortality Salience on Explicit and Implicit Religius Belief; Journal of Experimental Social Psychology, Vol 48, Issue 5, p. 983-989 (September 2012)

২৯. Nathan Heflick, Ph.D, Do Atheists Implicicitly Blieve in God and Life After Death? Psychology Today, May 05, 2011

৩০. বিস্তারিত দেখুন: Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad, God, Islam & The Skeptic Mind : A Study on Faith, Science, Religious Diversity, Ethics and Evil; chapter 1: Does God Exist and How Do I Know God Exists? (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2nd Edition, November 8, 2014)

ড. আজাদ দুটো দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করে সেগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন—অ্যানসেলমের অস্তিত্বস্বরূপ যুক্তি (*Ontological Argument of Anselm*) আর টমাস অ্যাকুইনাসের যুক্তিসমূহ। এনসেলমের এই যুক্তি নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মজীবনীতে একটি মজার ঘটনা পাওয়া যায়। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে একবার তিনি ট্রিনিটি লেন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক চিন্তার ঝলক এসে তাঁকে জানান দিলো, অ্যানসেলমের যুক্তি বৈধ (*valid*)। তামাক ভর্তি টিন কিনে আসার পথে অ্যানসেলমের যুক্তি তাঁর মাথায় আবার খেলে যায়। তিনি আচমকা হাতে থাকা তামাকভর্তি টিন আকাশে ছুড়ে মেরে বলে উঠেন, অ্যানসেলমের যুক্তি যথার্থ (*sound*)![৩১]

জীবনের পরিক্রমায় রাসেল অজ্ঞেয়বাদকে বেছে নেন অ্যানসেলমের যুক্তির বিপরীতে কথা বলেন। কিন্তু সত্তর বছর বয়সে এসেও তিনি স্বীকার করেছেন, অ্যানসেলমের যুক্তি আসলে কুযুক্তি এটা মনে হওয়া সহজ, কিন্তু ঠিক কোথায় কুযুক্তি আছে, তা ঠিকঠাক খুঁজে বের করা মুশকিল।[৩২]

ড. আজাদ এত কিছু ভাবেননি; বরং তিনি অ্যানসেলমের এই যুক্তিকে রাসেলের এক প্রবন্ধের নামে নাম দিয়েছেন—বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার রূপরেখা। (পৃ. ১০৮) কিন্তু বাস্তবতা হলো, অ্যানসেলমের যুক্তিকে প্রথম দৃষ্টিতে খুব সহজে খণ্ডন-যোগ্য মনে হলেও এটিকে খণ্ডন করতে নাস্তিক দার্শনিকরা ব্যর্থ হয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যালভিন প্লান্টিংগা তার বই *God, Freedom and Evil* বইতে অ্যানসেলমের যুক্তির কতগুলো রূপান্তরিত সংস্করণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এটি অখণ্ডনীয়। [৩৩]

এদিকে টমাস অ্যাকুইনাস স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে পাঁচটি যুক্তি উপস্থাপন করেন। অ্যাকুইনাসের যুক্তিগুলোর ব্যাপারে কথা বলার সময় ড. আজাদ আসলে শেষ যুক্তিটির বিরুদ্ধেই মূলত অভিযোগ তুলেছেন। প্রথম যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে নিজেই কুযুক্তিতে জড়িয়ে গেছেন। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ যুক্তিগুলো খণ্ডন করেননি, বর্ণনা করেছেন কেবল। অ্যাকুইনাসের শেষ যুক্তিটি ছিল ডিজাইন আর্গুমেন্ট।

---

৩১. Bertrand Russell, "My Mental Development", in The Philosophy of Bertrand Russell, ed. Paul Arthur Schilpp, p. 10 (New York: Tudor Publishing Company, 3rd ed.1951)

৩২. Yujin Nagasawa, The Existence of God; p. 22

৩৩. Alvin Plantinga, God, Freedom and Evil; p. 85-111 (Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977)

দ্য ডিজাইন আর্গুমেন্ট
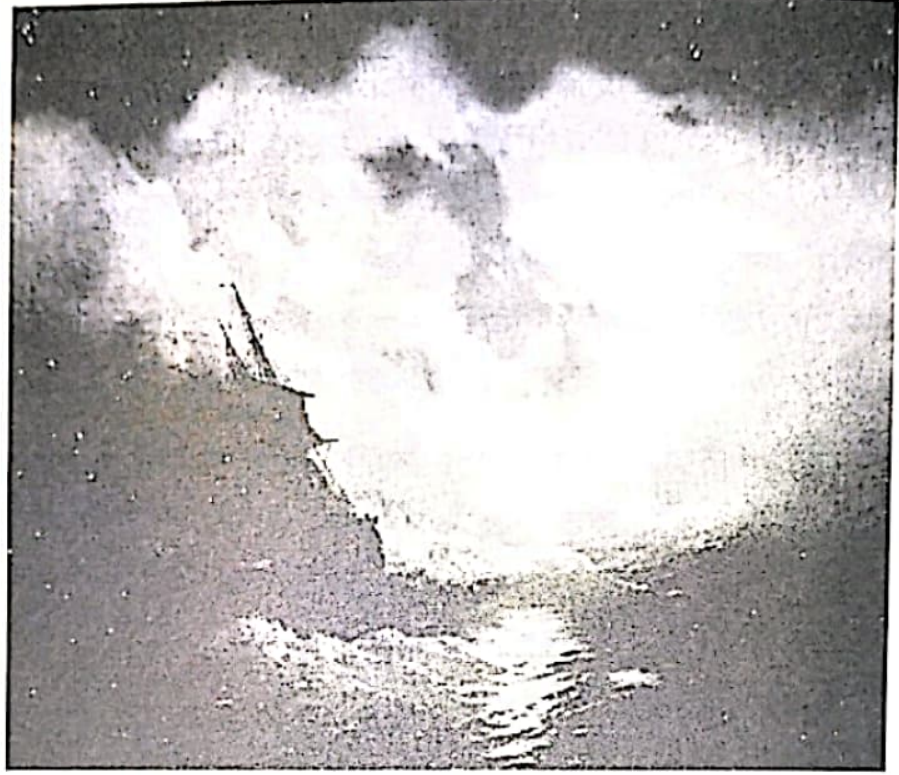
ইভান আইভাজভস্কি, স্টর্ম অন দ্য সি (১৮৪৯)

দুপুর চারটা, ধানমণ্ডির দৃক গ্যালারি। রিকশা এসে থামল গেটে। কবির সাহেব নামলেন, ভাড়া চুকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। আজ তিনি বেশ অ্যাকসাইটেড। বিখ্যাত সব সমুদ্রচিত্রের প্রদর্শনী চলছে। বছর কয়েক আগে ইন্টারন্যাশনাল মেরিন আর্টস অ্যাক্সিবিশানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দেশে এই প্রথম সমুদ্রচিত্রের খোঁজে আসা। আপনমনে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। দেওয়াল ধরে সারে সারে সাজনো ছবি। হঠাৎ একটা ছবি দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। সম্মোহিতের মতো হেঁটে চললেন ছবিটির দিকে।

ছবিটি উত্তাল সমুদ্রের, উথাল-পাথাল ঢেউয়ের সাথে প্রবল সংগ্রাম করে ভেসে চলছে এক জাহাজ। ঝড় আসছে, প্রবল ঝড়। বাতাসের তোড়ে পাল ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। ঢেউয়ের আঘাতে জর্জরিত জাহাজের ডুবে যাওয়ার দশা। অবাক করা ব্যাপার হলো, ঘনকালো মেঘের ফাঁকে একটা হলুদ চাঁদ দেখা যাচ্ছে। পুরো আকাশ এখনও কালিগোলা আঁধারে হারিয়ে যায়নি। কেমন যেন গা ছমছম করা পরিবেশ! আচ্ছা চাঁদটা কি কিছু বলতে চাইছে? কী বলতে চাইছে? এটাই কি সমাপ্তি?

- কেমন দেখলেন স্যার? সুন্দর, তাই না?

চমকে উঠলেন কবির সাহেব, ছবির মাঝে হারিয়েই গিয়েছিলেন যেন। বামে তাকিয়ে দেখেন, যুবক বয়সী একজন দাঁড়িয়ে। গ্যালারির কর্মী হয়তো। তিনি বললেন,

- এটা কার ছবি?

- কারও না স্যার, এমনি এমনি হয়ে গেছে।

- মানে? কবির সাহেবের কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

- না, মানে স্যার, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় কাগজ ও কালি তৈরি হয়েছে। তারপর কাগজের ওপর কালি পড়েছে, তা ছড়িয়ে গিয়ে নানা শেড তৈরি হয়েছে, ঢেউ তৈরি হয়েছে, চাঁদ তৈরি হয়েছে। এভাবে নিজে নিজেই এই ডিজাইন, আই মিন ছবিটা তৈরি হয়ে গেছে।

- ইয়াং ম্যান, আর ইউ জোকিং উইথ মি? কড়া স্বরে বলে উঠলেন কবির সাহেব।

- না স্যার, আই এম সিরিয়াস। অথবা আরেকটা সম্ভাবনা হতে পারে। আমাদের এই মহাবিশ্ব হলো মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য-অগণিত মহাবিশ্বের একটি। এমন আরও কোটি কোটি মহাবিশ্বের কোথাও কেবল কাগজ তৈরি হয়েছে কিন্তু কালি নেই। আবার কোথাও কালি আছে কিন্তু কাগজ নেই। অন্য কোথাও আবার কালি-কাগজ তৈরি হয়েছে কিন্তু ছবিটা তৈরি হয়নি। আমরা আসলে কাকতালীয়ভাবে সম্ভাব্য অসীমসংখ্যক ছবির বিশেষ একটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে ছবি তৈরির সবগুলো সম্ভাবনা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে। ফলে সম্পূর্ণ এই ছবিটি তৈরি হয়েছে। বুঝলেন স্যার?

এই কথা বলে লোকটি বিজ্ঞের মতো মুচকি হাসি হাসল। পরদিন সকালে গ্যালারির এক কর্মীর নাকে ব্যান্ডেজ দেখা গেল। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল,

- আর বইলেন না, বুড়াদের মনমর্জি। তাকে এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিলাম, আর সে কিনা আমার নাক ফাটিয়ে চলে গেল!

...

গল্পটা কাল্পনিক। তবে চিন্তার উদ্রেককারী। কবির সাহেব ক্যানভাসের ওপরে তুলির কারুকাজ দেখেছেন মাত্র। এলোমেলো কারুকাজ নয়, সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা ডিজাইন আঁকা। এই ডিজাইন এক তথ্য বহন করছে, আমাদের জানাচ্ছে কিছু বিষয়। কমন সেন্স বলে এটা আপনাআপনি হতে পারে না, বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় আসতে

পারে না। এই ডিজাইন বলে দিচ্ছে, এর একজন ডিজাইনার আছে, নির্মাতা আছে। এক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী সেই ডিজাইনার।

এটা একেবারে *বেসিক রিজনিং* অর্থাৎ বলা যায় বুনিয়াদি যৌক্তিক চিন্তা-পদ্ধতি। কবির সাহেব ডিজাইনারকে দেখেননি। এমন কোনও উপাত্ত নেই যা দ্বারা এই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায়—এই ছবিটি চিত্রশিল্পীর আঁকা। কিন্তু কবির সাহেবের সাথে একমত হয়ে আমরাও নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করব, কেউ এই ছবির পিছে কলকাঠি নেড়েছে।

আমাদের এই মহাবিশ্বে স্থিতি ও ঐশ্বর্য আমরা যতই অবলোকন করি, ততই পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই আলোচনা করেছি শিশুরা সহজাতভাবেই প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্ট মনে করে। ডেবোরাহ কেলেমেনের গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, শিশুরা সহজাত বা প্রাকৃতিকভাবেই আস্তিক (*intuitive theists*)। তাদের সহজাত চিন্তাধারা হলো প্রকৃতির নানা ঘটনাবলীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করা।[৩৪] আসলে প্রকৃতির সজ্জা দেখে একে কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে—এমনটা ভাবার সহজাত প্রবণতা শুধু শিশুদের নয়, পরিণতদেরও দেখা যায়, [৩৫] এমনকি এ প্রবণতা অবিশ্বাসীদের মাঝেও দেখা যায়!

সাম্প্রতিক সময়ে ডেবোরাহ কেলেমেন আরও দুজন গবেষকের সাথে অবিশ্বাসীদের ওপর যে গবেষণা পরিচালনা করেছেন, তা থেকে এমনই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। *The Divided Mind of a Disbeliever : Intuitive Beliefs About Nature As Purposefully Created Among Different Groups of Non-Religious Adults* শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে তিনটি ভিন্ন স্টাডিগ্রুপের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এই প্রকৃতিকে ডিজাইনড তথা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট হিসেবে দেখার প্রবণতা সহজাত, এর শেকড় গভীরে গ্রথিত।[৩৬]

আমাদের এই সহজাত চিন্তাধারার পক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কী? চলুন,

---

৩৪. Deborah Kelemen, Are Children 'Intuitive Theists?: Reasoning about Purpose and Design in Nature; Journal of Psychological Science, Vol. 15, No. 05, p. 295-301 (May 2004)

৩৫. Dr. Justine L. Barrett, The God Issue: We are all Born Believers; New Scientists Magazine, Issue 2856, p. 38-41 (19 March 2012)

৩৬. Järnefelt, E., Canfield, C. F. & Kelemen, D., The Divided Mind of a Disbeliever: Intuitive Beliefs About Nature as Purposefully Created Among Different Groups of Non-Religious Adults. Cognition Vol 140, p. 72-88. (2015)

মহাবিশ্বের একেবারে শুরু থেকে ভেবে দেখা যাক। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে এক মহাগর্জনের মাধ্যমে (*Big Bang*) মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্র, বিভিন্ন ধ্রুবক, মহাবিশ্বের সূচনা দশা ইত্যাদি এমন অভাবনীয় নিপুণতার সাথে সমন্বিত যার ফলে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বজায় থাকা ও এতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতে পারে। সেক্যুলার গবেষকদের বইপত্র ও জার্নাল পেপার থেকে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

❖ বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ-এর শুরুতে শক্তির তারতম্যের পরিমাণ যদি ১/১০^{৬০} ভাগের এক ভাগও হতো, তবে মহাবিশ্ব হয় চুপসে যেত, অথবা এত দ্রুতগতিতে প্রসারিত হতো যে, কোনও নক্ষত্রই সৃষ্টি হতো না![৩৭] ১০^{৬০} মানে হলো ১ এর পরে ৬০টি শূন্য বসালে যে দানবীয় সংখ্যা তৈরি হয়! ব্যাপারটা কিছুটা বোঝার জন্য গবেষক জন জেফারসন ডেভিস জার্নাল পেপারে একটি দৃশ্যপটের অবতারণা করেছেন। সুপরিচিত পদার্থবিদ পল ডেভিস তাঁর *God and the New Physics* গ্রন্থেও এই দৃশ্যপট উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

ধরুন, আপনি মাত্র ১ ইঞ্চির একটা টার্গেটকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেন। টার্গেটটি আপনার থেকে ২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, আপনার দেখা মহাবিশ্বের অপর পার্শ্বে অবস্থিত! ১ আলোকবর্ষ হলো প্রায় ৯.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (১ এর পর ১২টা শূন্য বসালে এক ট্রিলিয়ন হয়!), তা হলে ২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ কত দূরে এটা চিন্তা করাই তো মাথা খারাপ করার মতো ব্যাপার। এই অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে গুলি ছুড়ে ঐ ১ ইঞ্চির টার্গেটে লাগানো যেমন অসম্ভব ব্যাপার, বিস্ফোরণের শুরুতে শক্তির এমন সূক্ষ্ম মান হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া তেমনই অসম্ভব।[৩৯]

❖ পদার্থবিদ্যায় মৌলিক বল চারটি—মাধ্যাকর্ষণ বল, তড়িৎচৌম্বক বল, সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল। হিসেব করে দেখা গেছে, মাধ্যাকর্ষণ বল ১/১০^{৪০} ভাগের এক ভাগও কম বা বেশি হলে জীবন বিকাশে সহায়ক নক্ষত্র যেমন সূর্যের অস্তিত্ব থাকত না।[৪০]

---

৩৭. Paul Davis, The Accidental Universe; p. 90–91 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982)

৩৮. Paul Davis, God and the New Physics; Chapter 13: Black holes and cosmic chaos (Epub version, Penguin Books Ltd., Sep 28, 2006)

৩৯. John Jefferson Davis, The Design Argument, Cosmic Fine-tuning and the Anthropic Principle; The International Journal of Philosophy of Religion 22 (1987): 140

৪০. Paul Davis, Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature; p. 242 (New York: Simon and Schuster, 1984)

❁ সবল নিউক্লিয় বলের কাজ হলো পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনকে ধরে রাখা। দেখা গেছে, এর মান মাত্র ৫% এদিক-সেদিক হলেই প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ত।[৪১] তা ছাড়া সবল নিউক্লিয় বলের ক্ষেত্রে কাপলিং ধ্রুবক (*Coupling constant*)-এর মান মাত্র ০.৫% কম-বেশি হলেই প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত।[৪২]

❁ তড়িৎচৌম্বক বল ও মাধ্যাকর্ষণ বলের অনুপাত ১০⁴⁰: ১ না হয়ে মাধ্যাকর্ষণ বল যদি সামান্যতম কম বা বেশি হতো, তবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি হতো না।[৪৩] আরও দেখা গেছে, তড়িৎচৌম্বক বল সামান্যতম কমবেশি হলেই জীবনের বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ত।[৪৪] তা ছাড়া তড়িৎচৌম্বক বলের ক্ষেত্রে কাপলিং ধ্রুবক (*Coupling constant*) এর মান মাত্র ৪% কমবেশি হলেই প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না।[৩১]

❁ আমরা জানি প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস আর বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেক্ট্রন ঘুরে বেড়ায়। দেখা গেছে ইলেকট্রনের চার্জ যদি সামান্যতমও হেরফের হতো, তা হলে আজকের প্রাণ সম্ভব হতো না।[৪৫] পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবার প্রোটন আর নিউট্রনে গঠিত। দেখা গেছে, নিউট্রনের ওজন প্রোটনের ওজনের মাত্র ০.১% বেশি না হলে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেত, ফলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না।[৪৬]

❁ এবার আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকানো যাক। সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থানকে বিজ্ঞানীরা একটা গালভরা নাম দিয়েছেন—গোল্ডিলকস জোন (*Goldilocks Zone*), মানে অনুকূল এলাকা (*Habitable Zone*) আরকি।

---

৪১. John Leslie, Universes; p. 4, 35 (New York: Routledge, 1989); Anthropic Cosmological Principle; p. 322 (Oxford: Oxford University Press, 1985)

৪২. H. Oberhummer, A. Csótó, and H. Schlattl, "Stellar Production Rates of Carbon and Its Abundance in the Universe," Science 289 (2000): 88–90

৪৩. Paul Davis, The Goldilocks Enigma: Why the Universe is Just Right for Life; Chapter 7: A Universe Fit for Life (Epub Edition, Mariner Books 2008)

৪৪. John Leslie, "How to Draw Conclusions from a Fine-Tuned Cosmos" in Physics, Philosophy and Theology: A Common Quest for Understanding; p. 299 (Vatican City State: Vatican Observatory Press, 1988)

৪৫. Stephen Hawking, A Brief History of Time; Chapter 8: The Origin and Fate of the Universe (Epub Edition, Bantham Books, 10th anniversary edition)

৪৬. John Leslie, Universes; p. 39–40

অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটা এমন যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব বেশি গরমও না, আবার ঠান্ডাও না, ফলে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে—যা প্রাণের জন্য আবশ্যক।[৪৭] এই অবস্থান থেকে সামান্য নিকটে বা দূরে গেলেই গন্ডগোল হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এমন সংকীর্ণ এলাকায় অবস্থান লাভ খুবই দুর্লভ একটা ব্যাপার। আরও অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, শুধু পৃথিবীই নয়, বরং সূর্যও আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অনুকূল এলাকায় অবস্থিত! পৃথিবীর অবস্থান যে কেবল দুর্লভ শুধু তাই নয়, একই সাথে সৌভাগ্যময় বলতে হবে—সর্পিলাকার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবস্থানের কারণে। কারণ উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে এমন পূর্ণ আকৃতির গ্রহ আদৌ গঠিত হয় কি না, সন্দেহ আছে![৪৮]

জুপিটার নামা : আমাদের সৌরজগতে থাকা গ্যাস দৈত্য জুপিটার মহাজাগতিক ঢালের মতো কাজ করে, অসংখ্য ধূমকেতু, উল্কা শুষে নিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ভূগোলবিদ প্রফেসর পিটার ওয়ার্ড তো বলেই ফেলেছেন যে, জুপিটার না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণ না থাকার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।[৪৯]

চন্দ্রকথন : কাব্য ও সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো আকাশের ওই চাঁদ। চাঁদকে নিয়ে লিখা হয়েছে অগণিত কবিতা, সাহিত্য। বিজ্ঞানীদেরও চাঁদ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। সৌরজগতে আরও ডজনখানেক চাঁদ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের রাতের আকাশে রুপালি জোছনা ছড়িয়ে দেওয়া এমন চাঁদের হদিস মেলা দুষ্কর। দেখা গেছে—পৃথিবীর মতো গ্রহের এমন ঢাউস সাইজের চাঁদ থাকা সম্ভাবনা আসলেই কম। শুধু তাই নয়, এর উপস্থিতি প্রাণের বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও টিকে থাকার জন্য চাঁদের তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো,

» জোয়ার-ভাটা
» পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩° কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা
» পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার কমিয়ে দেওয়া

এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের সময় ২৩° কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এটা না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন সংকটময় হয়ে পড়ত যে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। জ্যোতির্বিদ

৪৭. Retrieved from: http://www.bbc.co.uk/science/space/solarsystem/sun_and_planets/earth

৪৮. P. D. Ward & D. Brownlee, Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe; p. 15-35 (New York, NY: Copernicus Books, 2003)

৪৯. প্রাগুক্ত, p. 221-222

জ্যাকুয়েস লাস্কার বলেছেন যে, আমাদের জলবায়ুর স্থিতিশীলতার জন্য আমরা এক ব্যতিক্রমী ঘটনার কাছে ঋণী, আর তা হলো চাঁদের উপস্থিতি। তা ছাড়া প্রফেসর পিটার ওয়ার্ডের মতে, চাঁদ পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে অবস্থিত তার থেকে নিকটে হলে ভূপৃষ্ঠে ঘর্ষণের কারণে এমন তাপ উৎপন্ন হতো যে, ভূপৃষ্ঠই গলে যেত।[৫০]

ড. আজাদ মনে করেন, সূর্য গ্রহ চাঁদ কেবলই মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল। (পৃ. ২৮) হিরোশিমা-নাগাসাকিতেও তো বিস্ফোরণ-দুর্ঘটনা ঘটল। কই সেখানে তো এমন ফাইন টিউনিং এর দেখা মিলল না; দেখা মিলল কেবল অজস্র ধ্বংসের, মৃত্যুর, বিকলাঙ্গতার! অধ্যাপক সাহেব এই সুনিপুণ সমন্বয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তাই বেফাঁস কথা বলেছেন। অবগত থাকলে কী বলতেন, সেটাই দেখার বিষয়।
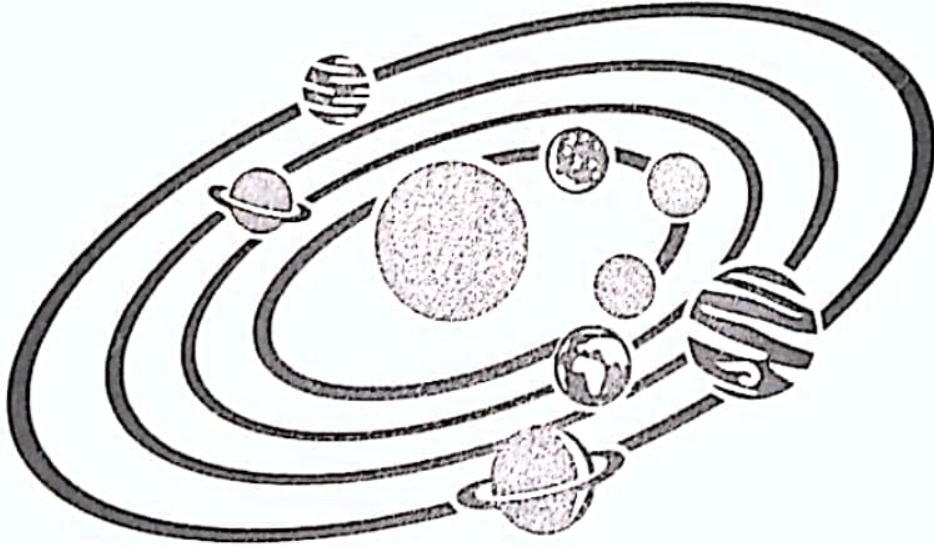
আমাদের সৌরজগত

এতক্ষণের আলোচনায় অল্পকিছু নিয়ামক উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত বলতে গেলে এই বিষয়ে বইয়ের-পর-বই লেখা যাবে। আমরা যদি গল্পের কবির সাহেবের মতো বেসিক রিজনিং প্রয়োগ করি, তা হলে বুঝতে পারব যে মহাবিশ্বে এই সূত্রবদ্ধ প্রকৃতি, কল্পনাতীত সুনিপুণ সমন্বয়ের অজস্র নমুনা যেন এক অমোঘ সত্তার দিকে ইঙ্গিত করে। এমন ফাইন টিউনিং দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ বাস্তবতা স্বীকার করে নাস্তিক পদার্থবিদ লী স্মোলিন বলেছেন, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় এমন সুনিপুণভাবে সমন্বিত মহাবিশ্বের গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা $১/১০^{২২৯}$ অর্থাৎ পুরোপুরি

৫০. প্রাগুক্ত, p. 222-229

অসম্ভব![৫১]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ (ﷻ) ফিতরাহ্-কে জাগ্রত করার জন্য মানুষকে বারবার চিন্তার আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিশ্বজগতে বিদ্যমান সুনিপুণ সমন্বয় ও সুসজ্জাকে তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার আগেই মানুষের মননে এই নিদর্শন ধরতে পারার বীজ বুনে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ

"নিশ্চই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।" [ভাবার্থ, সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৯০]

এই *ফাইন টিউনিং* বা সুনিপুণ সমন্বয় বিজ্ঞানীদের কাছে বরাবরই অবাক করার মতো বিষয়। সেক্যুলার গবেষক পল ডেভিসের দৃষ্টিতে মহাবিশ্বে চোখ ধাঁধানো ডিজাইনের চিহ্ন রয়েছে![৫২] মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সুপরিচিত মহাকাশতত্ত্ববিদ ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী (নাস্তিক) স্টিফেন হকিং পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্রেগরি বেনফোর্ডকে বলেন :

"(এই মহাবিশ্বে) সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করা মতো। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি, ততই খুঁজে পাই যে এটি যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলে বলতেই পারে যে, এই সুশৃঙ্খলা স্রষ্টার কাজ। আইনস্টাইনও তা-ই ভেবেছিলেন।"[৫৩]

ব্রিটিশ হিউম্যানিস্ট গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক, নাস্তিক ও বিখ্যাত গণিতবিদ রজার পেনরোজ *A Brief History of Time* প্রামাণ্যচিত্রে বলেন :

৫১. Lee Smolin, The Life of the Cosmos; p. 45 (Oxford: Oxford University Press, 1997)

৫২. Paul Davis, The Cosmic Blueprint: New Discoveries in Nature's Creative Ability to Order the Universe; p. 203 (New York: Simon and Schuster, 1998)

৫৩. Professor Gregory Benford, Leaping the Abyss: Stephen Hawking on Black Holes, Unified Field Theory and Marilyn Monroe; Retrieved from: Reason Magazine (Issues : April 2002; online edition: https://reason.com/ archives/2002/04/01/ leaping-the-abyss/3)

"... আমি বলব মহাবিশ্বের (অস্তিত্বের পেছনে) কোনও উদ্দেশ্য আছে। এটা কেবল হঠাৎ করেই তৈরি হয়ে যায়নি। কেউ কেউ মনে করেন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে; ব্যস, কথা শেষ। আর আমরা কেবলই দুর্ঘটনাক্রমে এর মাঝে আবির্ভূত হয়েছি। (কিন্তু) আমি মনে করি মহাবিশ্বে অস্তিত্বের পিছে এর চেয়েও গভীর কোনও ব্যাপার আছে।"[৫৪]

ড. আজাদ দাবি করেছেন, জগৎ সুষমা আর মহৎ লক্ষ্য বা মহাপরিকল্পনা দেখা বিশ্বাসীদের দুরারোগ্য ব্যাধি (পৃ. ১১১)। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেক্যুলার বিজ্ঞানীরাও জগতের সুষমা দেখে অবাক না হয়ে পারেননি। ফাইন টিউনিং বিষয়ে গবেষণাকারী বাঘা বাঘা চব্বিশ জন পদার্থবিদদের নাম জ্যোতির্বিদ ড. লুক বার্নেস উল্লেখ করেছেন যারা কেউ বিশ্বাসী নন। সুতরাং এগুলো ধর্মবিশ্বাসীদের বানোয়াট গালগপ্প এমন ভাবার মোটেই সুযোগ নেই।[৫৫] এমনকি নব্য-নাস্তিক্যবাদের অন্যতম পুরোধা রিচার্ড ডকিন্সও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

"... জীবিত থেকে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, আপনিও কিন্তু তাই। আমরা এমন এক গ্রহে বসবাস করি, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একেবারে যথার্থ : বেশি গরমও না এবং বেশি ঠান্ডাও না, (যেন) মনোরম রবির কিরণে রোদ পোহাচ্ছে, আলগোছে পানি বয়ে চলছে; নম্রলয়ে (সে নিজ অক্ষে) ঘূর্ণায়মান, সবুজ ও সোনালি ফসলের উৎসবে মুখর এই গ্রহ। ... অধিকাংশ গ্রহের কথা বিবেচনা করলে এটি এক স্বর্গ যেন, এবং পৃথিবীর কিছু জায়গা আছে যা যে-কোনও বিচারে স্বর্গই বলা চলে। এলোপাথাড়ি কোনও এক গ্রহ বেছে নিলে পৃথিবীর মতো এমন উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রহ মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা কত ভাবুন তো? একেবারে সর্বোচ্চ আশাবাদী হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী এহেন সম্ভাবনা দশ লাখের মাঝে একেরও কম।"[৫৬]

সুনিপুণ সমন্বয়ের এসকল উদাহরণ দেখে আমরা যদি সোজাসাপ্টা যুক্তি, বেসিক রিজনিং কাজে লাগাই তা হলে বুঝব এর পেছনে এক অভাবনীয় সৃষ্টিশীল ও শক্তিমান স্রষ্টা ক্রিয়াশীল। নাস্তিক স্টিফেন হকিংও *A Brief History of Time* গ্রন্থে

---

৫৪. Roger Penrose in A Brief History of Time (Biographic Documentary), Burbank, CA, Paramount Pictues Inc. 1992

৫৫. Geraint F. Lewis and Luke A. Barnes, A Fortunate Universe : Life In A Finely Tuned Cosmos; p. 242-243 (Cambridge University Press, 2016)

৫৬. Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder; chapter 1: The Anaesthetic of Familiarity (Epub Edition, Houghton Mifflin Company, 2000)

বলেছেন কেউ চাইলে এই সুনিপুণ সমন্বয়কে ঐশ্বরিক লক্ষ্য বা মহাপরিকল্পনার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করতে পারে।[৪৩] কিন্তু আপনি যদি আগে থেকেই বস্তুবাদের অনুমান কোলে নিয়ে বসে থাকেন, তা হলে তো আর তা মেনে নাওয়া যাবে না। তখন কী মানবেন? গ্যালারির কর্মীর দেওয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অর্থাৎ *মাল্টিভার্স*! মানে মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য অগণিত মহাবিশ্ব রয়েছে, যার মধ্যে আমরা একটি যেখানে সৌভাগ্যক্রমে এমন সুনিপুণ সমন্বয় মিলে গেছে!

কিন্তু মজার কথা হলো, মাল্টিভার্সের পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই, এটি কেবলই বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস! *দ্য রয়েল এস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি*-এর জার্নালে প্রকাশিত *পিয়ার রিভিউড* পেপারের ভাষ্যমতে, মাল্টিভার্সের অস্তিত্বে বিশ্বাস চিরকাল প্রমাণহীন বিশ্বাসের মতোই রয়ে যাবে।[৫৭] কিন্তু এতে কিছু আসে যায় না। স্রষ্টাতে বিশ্বাসের চেয়ে মাল্টিভার্সে বিশ্বাস সুবিধাজনক, কারণ নৈতিকতার ঝুটঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়! তা ছাড়া বিজ্ঞানীদের যেহেতু বস্তুবাদ আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে তাই এই অন্ধবিশ্বাস করা ছাড়া উপায় যে নেই। এমন বিশ্বাসে মুক্তমনা (!) সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে আমেরিকান পদার্থবিদ এলান লাইটম্যান বলেন :

> "... আমাদের মাল্টিভার্সের ধারণায় অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য মহাবিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করার কোনও উপায় আমাদের নেই এবং এদের অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। তাই, জগতে আমরা যা দেখি তার ব্যাখ্যায় এবং চিন্তাভাবনার জগতে আমাদের অবশ্যই এমন জিনিসে বিশ্বাস করতে হবে, যা আমরা প্রমাণ করতে পারি না।"[৫৮]

ড. আজাদ বলেছিলেন, বিশ্বাস মানে হলো অসত্য, অপ্রমাণিত, কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণ (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)। উনি জোর গলায় বলেছেন, বিশ্বাসের সম্পর্ক ইন্দ্রজালের সাথে, বিজ্ঞানের সাথে নয়; এখনও মানুষ ইন্দ্রজাল দিয়ে আক্রান্ত, অভিভূত; বিজ্ঞান দিয়ে নয়। (পৃ. ২৩) উনার এত সাধের বিজ্ঞানও যে এমন অন্ধবিশ্বাস করে বসে থাকবে, উনি কি জানতেন?

---

৫৭. G.F.R Ellis, U. Kirchner & W.R. Stoeger, Multiverses and Physical Cosmology; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 347, Issue. 03, p. 921-936 (21 January 2004)

৫৮. Alan Lightman, The Accidental Universe : The World You Thought You Knew; Chapter 1: The Accidental Universe (Epub Edition, Pantheon Books 2014)

প্রাণের কথা বলব বলে

মাগুরা কেইভ, বুলগেরিয়া

উত্তর-পশ্চিম বুলগেরিয়ার রাবিসা গ্রামের কাছে থাকা মাগুরা গুহার সন্ধান পাওয়ার পর প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এতে সন্ধান চালাতে চলে আসেন। আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রাচীন গুহার বয়স অনুমান করা হয় প্রায় ১৫ মিলিয়ন বছর! ঘুরতে ঘুরতে তাদের চোখ হঠাৎ গুহার দেওয়ালে আটকে যায়। কিছু দাগ দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন সকলেই। কাছে আসার পর তাদের মুখে হাসি ফোটে। দেয়ালের এই আঁকিবুঁকি কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। তারা অনুমান করেন, কোনও এক প্রাচীন জনপদের কথা। সেখানকার মানুষদের কাঁচা হাতে আঁকা কিছু দাগ যেন জানান দিচ্ছে সেকালের জীবনের রূপ।

এমন অবস্থায় কোনও মোটা গোঁফওয়ালা যদি নাক উঁচু করে বলেন : এহেম, এইগুলা আসলে কিছু না। দেয়াল থেকে পাথর খসে গেছে, কোনও জায়গায় পাথর কালো হয়ে এসব ছবি তৈরি হয়েছে। এসব দেখে মানুষ এঁকেছে—এমন কল্পনা করা ঠিক না! এগুলো এমনি এমনি আঁকা হয়ে যেতে পারে। বুঝলেন? এট লিস্ট দেয়ার ইজ আ চান্স, হে হে।

আমাদের কমন সেন্স বলে মোটা গোঁফওয়ালার কথা ভুল। দাগ (ডিজাইন) যত সরলই হোক না কেন, উনার দেওয়া ব্যাখ্যা সঠিক নয়। গাণিতিকভাবে হয়তো এমন

সম্ভাবনা বের করা যায়, কিন্তু বাস্তবিক দিক থেকে চিন্তা করলে এমন সরল ডিজাইন ও এমনি এমনি হয়ে গেছে, এমনটা ভাবা অপরিপক্বের কাজ। ডারউইনের সময়ে কোষবিদ্যা আজকের মতো এতটা ডেভেলপড ছিল না। কোষকে বেশ সোজাসাপ্টাই ভাবা হতো। ডারউইনের কল্পিত ওয়ার্ম লিটিল পন্ডে বিদ্যুতের ঝলকানীতে হঠাৎ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এককোষী প্রাণ চলে আসা—তখন কল্পনা করা সহজ ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই কল্পনা দূর-থেকে-দূরতর হতে হতে আজ বাতুলতা মাত্র! এমনকি একেবারে ছোট্ট একটা ব্যাকটেরিয়ার কোষও এতটা জটিল, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়; অজ্ঞেয়বাদী জিনবিদ মাইকেল ডেনটনের ভাষায় :

> "(এটি হলো) এক যথার্থ অতিক্ষুদ্র ফ্যাক্টরি যাতে আছে হাজার হাজার অতি সুচারুরূপে ডিজাইন করা জটিল মলিকুলার মেশিনারি, যেগুলো কিনা শত-সহস্র-মিলিয়ন পরমাণু দিয়ে গঠিত। মানুষের তৈরি যে কোনও মেশিন থেকে বহু-বহু গুণে জটিল এবং জড় জগতে এর কোনও নমুনা একেবারেই অনুপস্থিত।"[৫৯]

বিবর্তনতত্ত্বের অনুমান হলো, সকল প্রাণ মূলত একটি এককোষী প্রাণ থেকে কালক্রমে উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম প্রাণটি কীভাবে এল? এই প্রশ্ন নিয়ে যারা কাজ করেন, সেই অরিজিন অব লাইফ ফিল্ডের বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্নে এখনও পর্যন্ত হিমশিম খাচ্ছেন। পুরো কোষ তো দূরে থাক, কোষের মৌলিক গঠন উপাদান কার্বহাইড্রেট-প্রোটিন-লিপিড কীভাবে গঠিত হলো, সেগুলোই-বা কীভাবে সুসজ্জিত ডিএনএ-তে রূপ নিল, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও আঁধারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ৬৩০ টি রিসার্চ পেপার ও ১২০ টি প্যাটেন্টধারী লিডিং অরিজিন অব লাইফ রিসার্চার জেমস টুর অকপটে স্বীকার করেছেন :

> "আমরা পুরোই আঁধারে আছি। আমি আমার সকল সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করেছি, তাদের মাঝে কেউ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির সদস্য, কেউ নোবেল বিজয়ী। অফিসে তাদের সাথে কথা বলেছি। কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। তাই, তোমার অধ্যাপক সাহেব যদি বলে সব সমাধা হয়ে গেছে, তোমার শিক্ষক যদি বলে সমাধান আমরা পেয়েছি; তা হলে তারা জানেই না কোন বিষয়ে তারা নাক গলাচ্ছে।"[৬০]

---

৫৯. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis; p. 250 (Chevy Chase, Maryland: Adler & Adler, 1986)

৬০. James Tour, The Origin of Life: An Inside Story—2016, University of Waterloo. Avilable at: https://youtu.be/_zQXgJ-dXM4?t=3m6s (quotation begins at 3:06 of lecture)
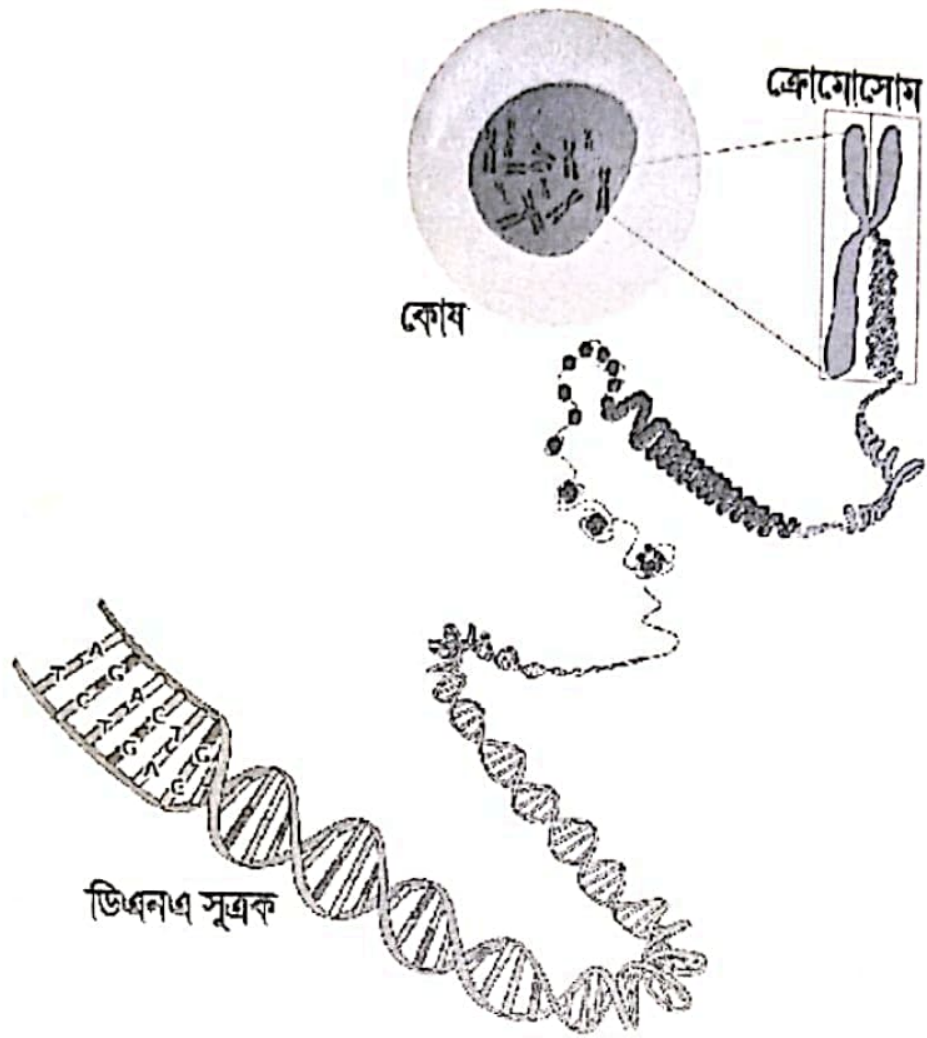
পলিনিউক্লিওটাইডের দ্বিসূত্রক, কয়েক রকম প্রোটিনের হাত ধরে প্যাঁচ খেতে খেতে ক্রোমাটিন তন্তু তৈরি করে। কোষ বিভাজনের সময় এই ক্রোমাটিন তন্তু আরও জিলাপির প্যাঁচ খেয়ে ক্রোমোসোম তৈরি হয়। এদের অবস্থান কোষের কেন্দ্র তথা নিউক্লিয়াসে।

ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যান্ডি কল বলেন :

"আমরা যদি স্রেফ এতটুকু বলেই কথা সারতে চাই যে, বেলা শেষে আমরা জেনে গেছি পৃথিবীর বুকে প্রাণের গভীর রহস্য সম্পর্কে, এর উৎপত্তি ও গঠনের ধাপ

সম্পর্কে—যা আমাদের চারপাশে দেখা জীবনের সূচনা করেছে; তা হলে আমার মতে এক্ষেত্রে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা এক ঘোলা চশমা দিয়ে চারপাশ দেখছি। কীভাবে এই পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হলো, তা আমরা জানি না। ঠিক কোন অবস্থায়, কখন এর সূচনা হয়েছে তাও জানা নেই।’[৬১]

আরেকটি সমস্যার দিকে আঙুল তুলেছেন পল ডেভিস। সেটা হলো, প্রাণ কেবলই কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার খেলা নয়; বরং প্রতিটি কোষ হলো অকল্পনীয় পরিমাণ তথ্যের আধার। প্রতিক্ষণে এই তথ্যের সাগরে প্রসেসিং, রেপ্লিকেশান চলছে। কীভাবে বুদ্ধিহীন জড়বস্তু থেকে এই সুনির্দিষ্ট তথ্য উৎপত্তি হলো, আর এই তথ্য রেপ্লিকেট করার মেশিনারি কীভাবে তৈরি হলো তা খুবই শক্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তুবাদীদের কাছে।[৬২]

এই তথ্যের বিষয়ের আলোচনায় ডিএনএ-র প্রসঙ্গ চলে আসে। ডিএনএ হলো প্রতিটি সজীব কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত, রাসায়নিক পদার্থ[৬৩] দিয়ে তৈরি ইয়া লম্বা সূতা। এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মানুষের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএ-র একটি ক্ষুদ্র একককে ‘জিন’ বলে। এমন সবগুলো জিনের সমষ্টি হলো জিনোম। মানুষের (হ্যাপ্লয়েড) জিনোম প্রায় ২.৮ – ৩.৫ বিলিয়ন (২৮০-৩৫০ কোটি) ক্ষারযুগল নিয়ে গঠিত! কোষপ্রতি হিসেব করলে দেখা যাবে ৬ বিলিয়ন ক্ষারযুগল নির্দিষ্ট অনুক্রমে সাজানো![৬৪] ক্ষারগুলোকে A, T, C এবং G দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। অন্যভাবে বললে ছয় শ কোটি বর্ণ দ্বারা গঠিত এক মহাবাক্য, প্রাণের নীল নকশা! এই সংকেতগুলোকে ট্রান্সক্রিপশান নামক জটিল প্রক্রিয়ায় কপি করে নেয় *mRNA* নামক রাসায়নিক পদার্থ; এই প্রক্রিয়াটি চলে কোষের নিউক্লিয়াসে। পরবর্তীতে এটি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে এসে জোট বাধেঁ কোষের প্রোটিন তৈরির অঙ্গাণু রাইবোসোমের সাথে। শুরু হয় আরেক জটিল প্রক্রিয়া, যার নাম ট্রান্সলেশান। এর ফলস্বরূপ নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি হয়; যা দেহের অগণিত কাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা

---

৬১. Andy Knoll quoted in Antony Flew, There Is A God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind; p. 130 (HarperCollins e-books, 2007)

৬২. প্রাগুক্ত, p. 128-129

৬৩. পলিনিউক্লিওটাইড চেইন, নাইট্রোজেন বেইস, ফসফেটের সমন্বয়

৬৪. ডিএনএ-তে বিদ্যমান নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারসমূহের (Adenine, Guanine, Cytocine, Thymine) নামের আদ্যক্ষর। আরও দেখুন: https://www.nature.com/scitable/nated/article?action=showContentInPopup&contentPK=310

পালন করে।[৬৪]

গুহার দেওয়ালে থাকা সামান্য কয়েকটি দাগ থেকে আমরা মনে করি, এটি কোনও বুদ্ধিমত্তার কাজ, দেওয়াল খসে পড়ে বা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে এমনিতেই দাগ হয়ে গেছে এটা কেউই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ডিএনএ-র বিপুল পরিমাণ সুসজ্জিত তথ্য, এর জটিল গঠন, এর সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপদ্ধতি দেখার পরও একদল মানুষ বলতে চায় এটা এমনি হয়ে গেছে বা হওয়া দরকার ছিল! কী আশ্চর্য! আপনার হাতের এই বইটিতে তথ্যের পরিমাণ যত নগণ্যই হোক না কেন, বইটি পড়ে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ সিদ্ধান্ত নিবে—এই বইটি কেউ-না-কেউ লিখেছে। যদিও সে তাকে দেখেনি, এই বই যারা প্রসেস করেছে তাদের কাউকেই দেখেনি। কেউ এই বই হাতে নিয়ে এই অঙ্ক কষতে বসবে না যে, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় কোনও বুদ্ধিমত্তার হাত ছাড়াই এই বই তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কত!

ডিএনএ-তে বিদ্যমান তথ্য এর চেয়েও অনেকগুণ বেশি জটিল, অনেক অনেক বেশি সুবিন্যস্ত! নব্য-নাস্তিকদের গুরু ডকিন্স ডিএনএ-র তথ্যসম্ভার বোঝাতে উদাহরণ দিয়েছেন, কোষের প্রতিটি নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান তথ্যের পরিমাণ বিখ্যাত বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র ৩০ খণ্ডে (প্রায় ৩০,০০০ পৃষ্ঠায়) বিদ্যমান তথ্যের চেয়েও ৩-৪ গুণ বেশি![৬৬] *পিয়ার রিভিউড* গবেষণাপত্র অনুযায়ী মানবদেহে মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩৭ লক্ষ কোটি![৬৭] সামগ্রিক তথ্যের পরিমাণ কল্পনারও বাইরে।

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির ও ম্যাক্সিম ভিনগ্রহে বুদ্ধিমত্তার খোঁজে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা প্রয়োগ করেছেন ডিএনএ-র ওপর। অর্থাৎ মহাকাশের পানে তাকিয়ে বুদ্ধিমত্তার যে নিদর্শন খোঁজা হচ্ছিল, সেই মূলনীতি অনুসরণ করে তাঁরা ডিএনএ-র মধ্যে অনুসন্ধান চালালেন। ফলাফল দাঁড়াল বিস্ময়কর, যা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সারির *পিয়ার রিভিউড* জার্নালে! তাঁরা দেখলেন ডিএনএ-তে যে বিন্যাস বিদ্যমান, তা কেবলমাত্র বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারাই সৃষ্টি সম্ভব; নিছক এলোমেলো বিবর্তন থেকে এমন প্যাটার্ন তৈরি হবার সম্ভাবনা ১ লক্ষ-কোটি ভাগের ১ ভাগের চেয়েও

---

৬৫. পুরো প্রক্রিয়ার এনিমেটেড ভিডিও দেখুনঃ DNA transcription and translation, McGraw-Hill Animations. Available at: https://youtu.be/2BwWavExcFI

৬৬. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design; p. 17-18, 116 (Norton, 1996)

৬৭. Bianconi E, et al., An estimation of the number of cells in the human body; Annals of Human Biology, vol. 40 (2013), Issue 6, p. 463-471

কম[৬৮], অর্থাৎ অসম্ভবের ওপর অসম্ভব! এরপরও বস্তুবাদীরা বলতে চায়, এটা জড় প্রক্রিয়ায় হঠাৎ করে হয়ে গেছে, উই ওয়ের লাকি অথবা হওয়া দরকার ছিল, ইট ওয়াজ নেসেসারি!

বিজ্ঞানী ট্রেভর ও অ্যাবেল *পিয়ার রিভিউড* পেপারে দেখিয়েছেন, এই চান্স/ নেসেসিটির গালগপ্পো দিয়ে ডিএনএ-র উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। হঠাৎ করে হয়ে গেছে এমন হাস্যকর বুলি আওড়ানোর দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। [৬৯] কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, বস্তুবাদ আঁকড়ে থাকতে হবে। তাই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াল্ডের মুখেই শুনুন কী করতে হবে :

> "প্রাণের উৎপত্তি (কীভাবে হলো সে) বিষয়ে কেবল দুটি সম্ভাবনা রয়েছে : (হয় কেউ তা) সৃষ্টি (করেছে) অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর উদ্ভব হয়েছে । তৃতীয় কোনও পথ নেই । স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভব (হওয়ার ধারণা) এক শ বছর আগেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের কেবল অন্য সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত করছে (আর) তা হলো ঐশ্বরিক সৃষ্টি । আমরা দর্শনগত (বস্তুবাদের) কারণে তা স্বীকার করতে পারি না; তাই আমরা অসম্ভবকে বিশ্বাস করব বলে বেছে নিই : তা এই যে, প্রাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হঠাৎ করে উদ্ভব হয়েছে ।" [৭০]

আপনারা মনে করেন বিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষতা, সততা আর নিষ্ঠার দোকান নিয়ে বসে আছে। নাস্তিকদের পুরোহিত বলে কথা! কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত। *পিয়ার রিভিউড* পেপারে যখন নাস্তিক বিজ্ঞানী হুবার্ট ইয়োকি স্বীয় গবেষণার দ্বারা প্রমাণ দেখালেন যে, বিজ্ঞানী-মহলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনের প্রচলিত বিশ্বাস কেবলই অন্ধবিশ্বাস,[৭১] তার ফল কী হলো? ভদ্রলোক ক্রিয়েশনিস্ট বলে গালও খেলেন বস্তুবাদী মহল থেকে। আহাহা! কী নিষ্ঠা, কী সততা!

তবে সবাই তো আর একই অন্ধবিশ্বাস করবে না, তারা অন্য অন্ধবিশ্বাস করবে। যেমন : কোষ, ডিএনএ ও এর ভেতরে থাকা তথ্যের জটিলতা দেখে ডিএনএ-র

---

৬৮. Vladimir I. shCherbak & Maxim A. Makukovb, The "Wow! signal" of the terrestrial genetic code. Icarus, Vol. 224, Issue 1, p. 228-242 (May 2013)

৬৯. J.T. Trevors, D.L. Abel, Chance and necessity do not explain the origin of life. Cell Biology International, Vol. 28, p. 729-739 (2004)

৭০. George Wald, The Origin of Life; Scientific American, 191:48. May 1954

৭১. Hubert P.Yockey, A Calculation Of The Probability Of Spontaneous Biogenesis By Information Theory; Journal of Theoretical Biology, Volume 67, Issue 3, 7 August 1977, Pages 377-398

ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারক ফ্রান্সিস ক্রিক ভাবলেন—হঠাৎ করে হয়ে গেছে যা হওয়া দরকার ছিল এমন গুল মেরে পার পাওয়া যাবে না। তিনি এক সমাধান বের করলেন। সেটা কী? বস্তুবাদী ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন! তিনি বললেন, প্রথম প্রাণ কোনও অ্যালিয়েন এসে রেখে গেছে (*Direct Panspermia*)![৭২] হাল আমলের ডকিন্সের মুখ থেকেও এমন অন্ধবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৭৩] ডকিন্স স্বীকার করেছেন :

> "... আপনি যদি খুঁটিনাটি খেয়াল করেন... আমাদের রসায়ন, মলিকুলার বায়োলজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, আপনি কোনও এক ডিজাইনারের হাতের ছাপ পেতে পারেন... "[৭৪]

তবে তার মতে এই ডিজাইনার হতে পারে কোনও অ্যালিয়েন প্রজাতি। যাক বাবা! খোদাকে মানা থেকে বাঁচা গেল, এবার দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করো। বলাই বাহুল্য, এই অ্যালিয়েনেরও কোনও প্রমাণ নেই। (অধ্যায় ৩ দ্রষ্টব্য)।

তো ড. আজাদ প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে সমাধা করেছেন? তিনি দাবি করেছেন, লাইবিগ নাকি উনিশ শতকেই দেখিয়েছিলেন যে, গবেষণাগারে প্রাণের উদ্ভব ঘটানো খুবই সম্ভব। (পৃ. ১২০) সাম্প্রতিক সময়ে অধ্যাপক সাহেবের ভাবশীষ্যরা আরেক বিজ্ঞানীকে নমঃ নমঃ করে বলছে, নাস্তিক জিনবিদ ক্রেগ ভেন্টর নাকি প্রথম কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করতে পেরেছেন; অবশেষে মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠল![৭৫] উভয়েই বড্ড হাস্যকর বাজে কথা! ভেন্টর নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, তিনি জড়বস্তু থেকে প্রাণ তৈরি করেননি[৭৬], বরং বলা যায় আল্লাহর দেওয়া উপকরণ ব্যবহার করে কিছু কপি তৈরি করেছেন মাত্র। নোবেলজয়ী ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী পল নার্স এই বাস্তবতা ইঙ্গিত করে *বিবিসি*-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, এটা কৃত্রিম প্রাণ নয়।[৭৭]

---

৭২. The Origin of Directed Panspermia, Available at: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-origins-of-directed-panspermia

৭৩. প্রামাণ্য চলচ্চিত্র Expelled: No Intelligence Allowed এর শেষ দিকে ডকিন্স তা নিজের মুখে বলেছেন। দেখুন: http://m.imdb.com/title/tt1091617/quotes

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. অভিজিৎ রায়, অবশেষে মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা : তৈরি হলো প্রথম কৃত্রিম প্রাণ। মুক্তমনা ব্লগ, ২১ মে ২০১০

৭৬. Scientist: 'We didn't create life from scratch', CNN, 21 May 2010

৭৭. Amit Bhattacharya, Did Venter create life? Not really, say experts. Times of India, May 24, 2010

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রাণের উৎপত্তির সমাধা যত সহজে নাস্তিকেরা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা ছেলেভুলানো কথা মাত্র; বাস্তবতা মূলত তাদের দর্শনের বিপক্ষে। এদিকে কেউ আবার ডিএনএ-র ডিজাইনের কথা শুনলেই জাংক ডিএনএ-র (*Junk DNA*) কথা তুলেন। আমরা দেখেছি ডিএনএ বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরির ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞানীরা একসময় খুঁজে পান—বিশাল এই ডিএনএ-র মাত্র ২% প্রোটিন কোড করে; বাকি ৯৮%ই কোনও কাজ না করে স্বার্থপরের মতো ডিএনএ-র বিশাল জায়গা দখল করে বসে আছে। বিজ্ঞানী সুসুমু ওহনো এদের নাম দেন জাংক ডিএনএ। নাস্তিকেরা এতে মহা খুশি হয়; বলে ওঠে, দেখেছ, ডিএনএ কত আবর্জনায় ভর্তি! স্রষ্টা থাকলে এত আবর্জনা থাকত? মানুষ অন্ধ, এলোপাথাড়ি, উদ্দেশ্যহীন, জড় বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়েছে বলেই তো এত সব ময়লা জমে আছে ডিএনএ-তে।[৭৮] এই প্রোপাগান্ডায় বিখ্যাত আস্তিক বিজ্ঞানী, হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের কর্ণধার ফ্রান্সিস কলিন্স পর্যন্ত ফেঁসে গেলেন! নাস্তিকদের কুযুক্তি (*Argumentum ad ignorantium*) বিশ্বাস করতে শুরু করলেন![৭৯]

এদিকে বিজ্ঞানীরা এসব আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি বাদ দিয়ে ডিএনএ-র যে অংশ প্রোটিন কোড করে, তা নিয়েই মেতে রইলেন। কিন্তু কয়েকজন ভবঘুরে বিজ্ঞানীর মাথায় পোকা কামড়াতে থাকল, এত আবর্জনা হয় কীভাবে? তারা গোঁয়ারের মতো লেগে রইলেন এই তথাকথিত আবর্জনার পিছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই ধীরে ধীরে জাংক ডিএনএ সম্পর্কে জ্ঞানের নতুন বাতায়ন উন্মোচিত হতে শুরু হয়েছে। জানা গেছে, জাংক ডিএনএ আসলে জাংক নয়, এর বহুবিধ কাজ রয়েছে।[৮০] জীববিজ্ঞানী নেসা ক্যারি একখান ঢাউস সাইজের বই লিখে ফেলেছেন জাংক ডিএনএ-র রহস্যের ওপর।[৮১] ডিএনএ-র এই রহস্যময় এলাকা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অগ্রগতির পথে।

ওপরে বর্ণিত তথ্য ব্যবহার করে একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখেছেন

---

৭৮. যেমন, অভিজিৎ রায় বলেছেন, মানুষের ডিএনএ-তে জাংক ডিএনএ নামে একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা আমাদের আসলে কোনও কাজেই লাগে না। তার দৃষ্টিতে এটা ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। দেখুন : রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, অবিশ্বাসের দর্শন; পৃ. ১১৩

৭৯. Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief; p. 135–136 (New York: Free Press, 2006)

৮০. Prof. Wojciech Makalowski, What is junk DNA, and what is it worth? Scientific American, Available at: https://www.scientificamerican.com/article/what-is-junk-dna-and-what

৮১. Nessa Carey, Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome (Columbia University Press, Reprint 2017)

প্রকৃতিতে ডিজাইনের ছাপ স্পষ্ট, আর এই ডিজাইন পরিকল্পিত প্রতীয়মান হয়। সেখান থেকে তারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আদলে এই পর্যবেক্ষণকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। যার ফলে নতুন মুভমেন্ট শুরু হয় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (*ID*) নামে। এসকল বিজ্ঞানীদের মাঝে আস্তিক-নাস্তিক সকল ঘরনার বিজ্ঞানীই রয়েছেন। কিন্তু ঝামেলা হলো ডিজাইন মেনে নিলে তা বিবর্তনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাই বিজ্ঞানীদের বড় অংশই এই মুভমেন্টের ব্যাপারে নাক সিটকান।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে *ID* কে বিজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বেশকিছু নাস্তিক গবেষক এর পক্ষে লিখেও চলছেন। যেমন : কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাস্তিক বিজ্ঞান-দার্শনিক ব্র্যাডলি মন্টন বহু দিন ধরেই *ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন* যে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করা যায়, এ ব্যাপারে লেখালিখি করে আসছেন। তাঁর *Seeking God in Science : An Athesit Defends Intelligent Design* বইতে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য হওয়ার দাবি রাখে। তা ছাড়া ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তিনি সেক্যুলার স্কুলের পাঠ্যসূচিতে রাখারও পক্ষপাতি। [৮২]

কিন্তু আমার দৃষ্টিতে *ID* এর সমস্যা হলো, এটি প্রচ্ছন্ন সাইন্টিজম থেকে উৎসারিত। তা ছাড়া *ID* কে বিজ্ঞান মেনে নিলে তা আস্তিকদের খুব একটা যে সাহায্য করবে, তাও না। কারণ বিজ্ঞান পদ্ধতিগত বস্তুবাদের দর্শন মেনে চলে। তাই সকল উপাত্ত যদি কোনও বস্তুজগতের বাইরের বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারীর দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এই সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া হবে; বস্তুজগতের কোনও প্রাণী বা অ্যালিয়েনকে ডিজাইনার ভাবতে হবে। (অধ্যায় ০১ দ্রষ্টব্য) তবে *ID* যে বস্তুবাদী অনুমানকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে।

প্রবলেম অব ইভল

ড. আজাদ ডিজাইন আর্গুমেন্টকে খণ্ডন করার জন্য যে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন, দর্শনের ভাষায় তাকে বলা হয় প্রবলেম অব ইভল (*Problem of Evil*)। নাস্তিকতার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যুক্তিগুলোর অন্যতম হলো এই মন্দ-সমস্যা যুক্তি। জার্মান কবি জর্জ বাচনার-এর দৃষ্টিতে মন্দ-সমস্যা যুক্তি হলো 'নাস্তিকতার অনড়

৮২. Bradley Monton, Seeking God in Science: An Athesit Defends Intelligent Design (Broadview Press, 2009)

পাথর'। সাবেক নাস্তিক দার্শনিক এনটনি ফ্লিউ, জিম আল খলিলি, স্টিফেন ফ্রাই, মাইকেল রুজ, বার্ট ডি. আরমেনসহ অনেকেই নিজের নাস্তিকতা বা অজ্ঞেয়বাদের পক্ষে এই যুক্তি দাঁড় করান। অধিকাংশ মানুষই জানে না, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম এক নিয়ামক এই প্রবলেম ছিল অব ইভল! [৮৩] বলতে গেলে নাস্তিপাড়ার ঘাঁটিতে এই যুক্তির স্থান এক নম্বরেই বলা চলে। ড. আজাদ বলেছেন :

"সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে ঘটছে এমন সব অশ্লীল ঘটনা, যা কোনও মহাপরিকল্পনার ফল নয়। একটি দূর্বত্ত একনায়ক দেখা দিয়েছে, এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ? দেশ জুড়ে অনাহার, বন্যা, মহামারী? এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ? ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা, গর্ভবতী হয়ে পড়ছে পরিচারিকারী : এটা কোন মহাপরিকল্পনার অংশ?" (পৃ. ১১১)

"মৃত্যু কী রূপে দেখা দিয়েছিলো আউসহ্বিট্জে, হিটলারের মানুষনিধনকুণ্ডে? ধার্মিকেরা বলেন বিধাতা করুণাময়, এটা কেমন করুণা তার? দুটি নগরের অসংখ্য মানুষ ধ্বংস করা হলো আণবিক বোমায়, আউসহ্বিট্জে পোড়ানো হলো লাখ লাখ মানুষ তারই করুণায়? নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা তার। তিনি কি দয়াময় নন? না কি তিনি মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন ওই সময়?" (পৃ. ১৫০)

১৮ শ শতকে ইউরোপের অ্যানলাইটমেন্টের হাত ধরে পশ্চিমে এক ব্যাপক রদবদল ঘটে। মানুষেরা জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজার বদলে জীবনযাত্রার মানের দিকে ফোকাস করতে শুরু করে। যখন এই জগতে বেঁচে থাকাই বড় করে দেখা শুরু হয়, মানুষ ভুলে যেতে থাকে যে জাগতিক জীবন মূলত আরও বৃহৎ এক অস্তিত্বের অংশমাত্র। ফলে আশু কল্যাণ-আনন্দ লাভ এবং কষ্ট-ব্যাথা এড়িয়ে চলাই জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে দেখা যাচ্ছে, বিলাসবহুল জীবন যাপন করার পরও পশ্চিমা মগজে মন্দ-সমস্যা পোকার মতো কিলবিল করে যাচ্ছে। ভিক্টর ফ্রাঙ্কেলের কলমে পাওয়া যায় :

"বহুদিন ধরে আমরা এক স্বপ্ন দেখেছি, যা থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের জাগরণ ঘটছে। আমরা ভেবেছি স্রেফ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাই সুখে ভাসবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বেঁচে থাকার সংগ্রাম বিগত হওয়ার পর, এই প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় : কেন বেঁচে থাকব? আগের

৮৩. Thomas Dixon, Science and Religion: A Very Short Introduction; p. 62 (Oxford University Press, 2008)

তুলনায় অনেক মানুষের আজ বেঁচে থাকার সরঞ্জাম আছে, কিন্তু বেঁচে থাকার কোনও উদ্দেশ্য নেই।'[৮৪]

উদ্দেশ্যহীন এই জীবনে সামান্য-থেকে-সামান্যতম আঘাতও অসহনীয় হয়ে পড়ে। তারা ভাবে এ জীবনই একমাত্র জীবন, ওপারের ডিঙি নৌকা কল্পনামাত্র। এসকল মানুষেরা এক রকম কগনিটিভ বায়াসে আক্রান্ত হন যাকে বলা হয় *ইগোসেন্ট্রিজম*। অর্থাৎ তারা কোনও কিছুকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য কোনও আঙ্গিকে দেখতে চান না। মন্দ-সমস্যা যুক্তিও এই বায়াসে আক্রান্ত, এই যুক্তির উভয় প্রকারেই স্রষ্টার প্রজ্ঞাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।[৮৫]

যখন আল্লাহ (ﷻ) পৃথিবীতে মানব-প্রজাতি প্রেরণের সিদ্ধান্ত মালাইকাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, তখন তারাও অবাক হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তে। আল-কুরআন জানায় :

> "আর তোমার রব যখন মালাইকাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাব; তখন তারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।" [ভাবার্থ, সূরা বাকারা, ২ : ৩০]

মালাইকাদের এই আশ্চর্য হয়ে পড়া মানবজাতির এক মহাকালের জিজ্ঞাসার নামান্তর। মালাইকারা যেমন আল্লাহর প্রজ্ঞা (হিকমাহ্) বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বলে উঠেছিলেন, আমরা তো আপনার ইবাদাত করছিই; কেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন সৃষ্টি বানানোর পরিকল্পনা; এরা তো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া কিছু করবে না? উত্তরে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ বলেছিলেন, এর পেছনে যে প্রজ্ঞা লুক্কায়িত, তা তাদের মগজের বাইরে। স্রষ্টার কাছে রয়েছে ছবির পুরোটা, আমরা শুধু একটা বিন্দু/পিক্সেল দেখি। সুতরাং আমাদের বুঝে আসবে না এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আর আমাদের বুঝে আসে না বলে কেউ যদি মানতে না চায়, এটা তার চিন্তার দীনতা ও কুযুক্তির আশ্রয়মাত্র। তাই *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* জানায়—অধিকাংশ চিন্তাবিদ এই মন্দ-সমস্যা

---

৮৪. Victor Frankl, The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism; p. 20-21 (New York: Simon Schuster, 1978)

৮৫. Chad Meister, Introducing Philosophy of Religion; p. 132-135 (Routledge, 2009)

যুক্তিকে স্থূলবুদ্ধির ফল মনে করেন।[৮৬] সাবেক নাস্তিক এনটনি ফ্লিউও পরিণত বয়সে বুঝেছিলেন—তিনি যে মন্দ-সমস্যা যুক্তির কারণে নাস্তিক হয়েছিলেন, তা ছিল অপরিপক্ক চিন্তার ফল।[৮৭]

একটা প্র্যাকটিকেল উদাহরণ দেওয়া যাক। শিশু মেডিসিন বিভাগে আমার কাজ করার সময় যে দিনগুলোতে রোগী ভর্তি হতো, সেসব দিন অনেকটা হাঙ্গামা বেঁধে যেত। একদিকে স্রোতের মতো রোগী আসছে, কাউকে রোগ বুঝিয়ে ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি; কাউকে আবার ভর্তি করতে হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরাপথে ওষুধ দেওয়া লাগে; এর জন্য শিরাপথে ক্যানুলা করা হয়। বাচ্চাদের ক্যানুলা করার জন্য নিয়ে গেলেই চিৎকার শুরু হয়। ব্যাথা পাবে দেখে তারা ক্যানুলা করতে চায় না, একে মন্দ ভেবে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে, মোচড়ামুচড়ি করতে থাকে। একবার তো এক ছেলে এমন বাজে গালিগালাজ শুরু করল যে কানে আঙুল গুঁজে বসে থাকতে হয়েছিল! এ ছাড়া রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ইঞ্জেকশান দিয়ে বারবার রক্ত নেওয়া দরকার পড়ে, মেনিনজাইটিসের বাচ্চাদের লাম্বার পাংচার করে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের তরল (সেরেব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড) বের করে পরীক্ষা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে শিশুরা ব্যাথা পায় ঠিকই, কিন্তু এই আপাত মন্দ তাদের কল্যাণের জন্যই। যা বুঝে ওঠা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়।

তেমনিভাবে খণ্ডিত ও সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবী দেখে স্রষ্টার কর্মকে সমালোচনা করা হলো সেই শিশুর আচরণতুল্য, যে জ্ঞানের অভাবে নিজের চিকিৎসায় বাধা দেয়, চিৎকার করে, গালিগালাজ করে। তা ছাড়া, মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। যার ফলে তার জন্য ভালো-মন্দ এই দুই পথ থাকা আবশ্যিক; তা না হলে তার বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকল কোথায়? আর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই বা থাকল কোথায়? মহান আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দের সহজাত অনুভূতি দিয়েছেন, এবং ওহি প্রেরণ করে ভালো-মন্দের পরম মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন, নবিকে শিক্ষকরূপে পাঠিয়ে তার প্র্যাকটিকেল রূপায়ন দেখিয়েছেন। ফলাফলের জন্য দুই জগৎ বিদ্যমান, অস্থায়ী-নশ্বর দুনিয়া; আর স্থায়ী অন্য জীবন। এ জীবনে হিসেব না মিললেও সে জীবনে হিসেব পইপই করে মিলানো

৮৬. Patrick Sherry, Problem of evil. Encyclopedia Britannica Online, November 17, 2017

৮৭. Antony Flew, There Is A God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind; p. 42

হবে, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।[৮৮] যেহেতু নাস্তিকেরা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই মন্দ-সমস্যার কোনও সমাধানও নেই তাদের কাছে।

তা ছাড়া মন্দ-সমস্যা যুক্তির প্রথমেই এমন অনুমান করা হয়েছে যে, নিশ্চিত মন্দ বা ভালো বলে কিছু আছে। কোনও কিছুকে মন্দ বা ভালো বলতে চাইলে কোনও মানদণ্ডের সাপেক্ষে তা বলতে হবে। স্রষ্টার অনুপস্থিতিতে কোনও কিছুকে নিশ্চিত করে ভালো/মন্দ বলার সুযোগ নেই। আলোচিত বেস্ট সেলার বই *স্যাপিয়েন্স*-এ নাস্তিক ঐতিহাসিক ইউভাল নোয়া হারারি বলেছেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার-আইন-সুবিচার এগুলো স্রেফ সমষ্টিগত কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) নাস্তিক দার্শনিক জে. এল. ম্যাকি স্বীয় দর্শনের আলোকে স্বীকার করেছেন, পরম ভালো/মন্দ অর্থাৎ মূল্যবোধের অস্তিত্ব নেই।[৮৯] এলোপাথাড়ি বিবর্তনের ফলেই যদি জীবের বিকাশ হয়, তা হলে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই, যা আছে তা কেবলই প্রকৃতি। নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স যেমন বলেছিলেন, ডারউইনিয় জীবনদর্শনে ভালো-মন্দ বলে কিছুই নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধির নির্মম-নির্দয় প্রতিযোগিতা। (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) তাই মন্দসমস্যা যুক্তির শুরুতেই স্ববিরোধী অবস্থান বিদ্যমান।

এই মন্দ-সমস্যা একজন মুসলিমের জন্য কোনও সমস্যাই নয়; সে জানে এই ক্ষণকালের জীবন এক পরীক্ষামাত্র, ওপারের জগতই আমাদের মূল লক্ষ্য। তা ছাড়া, প্রতি শুক্রবার একজন মুসলিম যে সূরা কাহাফ পঠনের আমল করেন, তাতেই এই সমস্যার জবাব দেওয়া হয়েছে মূসা (ﷺ) ও আল-খিদ্‌র/খিজির (ﷺ)-এর ঘটনার মাধ্যমে। তাই প্রতি সপ্তাহে একজন আমলদার মুসলিম তথাকথিত মন্দ-সমস্যা যুক্তির উত্তর ঝালাই করেন। তা ছাড়া ওহির আলোকে একজন মুসলিম এটাও আশা করেন যে, যত দিন যাবে, ওহির শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এই মন্দের পরিমাণ ততই বাড়বে; নববি ভাষ্যে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীই করা হয়েছে। জলে স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে মানুষে কর্মের ফলস্বরূপ, অন্যায়-অনাচার বাড়বে, মানুষ নিজ স্বার্থ রক্ষায় গণহত্যায় জড়াবে।

সর্বোপরি নাস্তিক পণ্ডিতদের মতেই প্রবলেম অব ইভল আস্তিকতার বিরুদ্ধে কোনও শক্তপোক্ত যুক্তি নয়, বরং আবেগী যুক্তি বলা যায়। [৯০] নাস্তিক জে. এল. ম্যাকি স্বীকার করেছেন :

---

৮৮. সূরা ইয়াসিন ৩৬:৫৪

৮৯. J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong; p. 15 (London, Penguine Books, 1990)

৯০. Chad Meister, Introducing Philosophy of Religion; p. 144

"পরিশেষে আমরা মেনে নিতে পারি যে, মন্দ-সমস্যা যুক্তি আস্তিক্যবাদের কেন্দ্রীয় মতবাদগুলো যৌক্তিকভাবে অবান্তর এমনটা প্রমাণে ব্যর্থ।"[১১]

নাস্তিক দার্শনিক উইলিয়াম এল. রোওয়ে বলেন :

"কিছু দার্শনিক বলতে চেয়েছেন—মন্দের অস্তিত্ব ধর্মে বর্ণিত খোদার অস্তিত্বের সাথে যৌক্তিকভাবে অসঙ্গত। আমার মতে কেউই এমন অসংযত দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়নি; যদিও এই অসঙ্গতি অনেকেই মেনে নেয়। তবে মন্দের অস্তিত্ব ধর্মের বর্ণিত খোদার অস্তিত্বের সাথে যৌক্তিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, এর পক্ষে এমন যুক্তি রয়েছে যা মানতে আমরা বাধ্য।"[১২]

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেও মন্দ-সমস্যা যুক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বের বিপক্ষে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ নয়। এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, নাস্তিকেরা মন্দ-সমস্যা যুক্তির ফেনা তুলে যে স্রষ্টাকে বাতিল করতে চায়, তারা সেই দুঃখ দুর্দশায় থাকা মানুষের জন্য কতটুকু সাহায্য করে? সাম্প্রতিক কালে গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, ধার্মিক মানুষ অধার্মিকের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও বেশি দানশীল; দেখা গেছে ধার্মিকতা বাড়ার সাথে সাথে দানের মানসিকতাও বাড়ে।[১৩] গবেষক রডনি স্টার্ট ও উইলিয়াম সিমস গবেষণার ফল উল্লেখ করেছেন যে ধার্মিক মানুষেরা অধিক দানশীল হন, অধার্মিক সামসময়িকদের থেকে। সমাজবিজ্ঞানী আর্থার ব্রুকসের বিস্তৃত গবেষণা জানায় দানে ও স্বেচ্ছাসেবায় ধার্মিকদের অংশগ্রহণ বেশি। তাই দেখা যায়, ২০০০ সালে ধার্মিকেরা সেক্যুলারদের চেয়ে ৩.৫ গুণ বেশি দান করেছেন, আর স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিয়েছেন সেক্যুলারদের দ্বিগুণ! দেখা গেছে যারা আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সময় ব্যয় করে তারা অধার্মিকদের চেয়ে দ্বিগুণ দানশীল।[১৪]

সুতরাং ডিজাইন আর্গুমেন্টকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য ড. আজাদ যে মন্দ-সমস্যা যুক্তির আশ্রয় নিলেন, তা আসলে অজ্ঞতাপ্রসূত অপযুক্তির নামান্তর। তিনি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করেননি, পশ্চিমাদের বইপত্রে ধর্মের বিপক্ষে আনা যায় এমন যা কিছু পেয়েছেন, তা-ই সাহিত্যের ঢঙে তুলে এনেছেন। সাধারণ পাঠক যাদের

---

১১. J. L. Mackie, The Miracle of Theism; p. 154 (Oxford University Press, 1982)

১২. William L. Rowe, The Problem of Evil & Some Varities of Atheism. American Philosophical Quarterly, Vol 16, No 04, p. 335 (October 1979)

১৩. Bradford Richardson, Religious people more likely to give to charity, study shows. The Washington Times, October 30, 2017

১৪. Bruce Sheiman, An Atheist Defends Religion; p. 28-29 (Alpha Books, 2009)

খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস নেই, তারা এগুলো পড়ে বিভ্রান্তি-সংশয়ে পড়ে যেতে পারে; কিন্তু যারা চিন্তাশীল পাঠক, তারা এগুলো পড়ে বিরক্ত হবেন এতে সন্দেহ নেই।

তব দেখা পাই?

ড. আজাদ কথার বুলি ছোটাতে ছোটাতে এক পর্যায়ে বেশ হাস্যকর দাবি জানিয়েছেন, আর তা হলো—স্রষ্টাকে দেখা যায় না কেন? তিনি লিখেন :

> "মহাজগতকে যদি জানতাম আমরা, তাহলে বিস্মিত হতাম, কেননা বিস্ময়কর বহু কিছু রয়েছে মহাজগৎ জুড়ে; কিন্তু এখন যেমন ভয়ের চোখে দেখি, নানা রকম বিধাতা দেখতে পাই দূরে, তেমন কিছু দেখতে পেতাম না। ওই তারা বা সূর্যই শুধু নয়, আমরাও মহাজগতের অধিবাসী, আমরাও ঘুরে চলছি মহাজাগতিক গগনে; কিন্তু আমরা কোনও দেবতা দেখি নি, বিধাতা দেখি নি, যদিও এদের কথা দিনরাত শুনতে পাই.." (পৃ. ৬৩, অনুরূপ পৃ. ১২০)

অধ্যাপক সাহেবের বিজ্ঞানের ওপর অগাধ বিশ্বাস তাকে এহেন মনোভাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু আসলেই কি তা-ই? বিজ্ঞান কি একদিন মহাবিশ্বের সব রহস্য জেনে ফেলবে? তিনি কল্পনা করেছেন, বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর রয়েছে সৌন্দর্য; কোনওদিন যদি আবিষ্কৃত হয় প্রকৃতির শেষসূত্র, যা ব্যাখ্যা করবে মহাজগতের সবকিছু, তাও হবে সুন্দর। (পৃ. ১২১) উনার মতে, বিজ্ঞানহীন আদিম মানুষ করেছিল মহাজগতের রহস্যীকরণ; আর বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে আর ততই করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; আকাশমণ্ডলকে উদ্ধার করেছে রহস্যজাল থেকে, করেছে মহাজগতের বিরহস্যীকরণ। (পৃ. ১২০)

কিন্তু বাস্তবতা তা বলছে না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এত উৎকর্ষের পরও একবিংশ শতকে এসে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের কত শতাংশ আনুমানিক বুঝতে পেরেছেন জানেন, অনুমান করুন তো? কেউ বলবে আরে ১০০%, কেউ বলবে, আরে নাহ ৯০%। বাস্তবে তারা যতটুকু বুঝতে পারার দাবি করেন তা মাত্র ৪-৫%! [১৫] অবাক হচ্ছেন? হওয়ারই কথা, বিজ্ঞান আমাদের কাছে ফ্যান্টাসি! বিজ্ঞানের গভীরে গিয়ে দেখুন, পাবেন অনিশ্চয়তার সাগর। বিংশ শতকের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ধারণা জানাচ্ছে—আমরা প্রকৃতির সবকিছু জেনে ফেলব এমন আশায় গুড়ে বালি।

---

১৫. 'Scientists only understand 4% of universe'. RT News, 29 Jul, 2012

পদার্থবিদ ড. জাফর ইকবাল বিজ্ঞানের ওপর অনেকটা ঈশ্বরের গুণ আরোপ করার পরও[৯৬] স্বীকার করে নিয়েছেন এই বাস্তবতাকে। তিনি বলেন :

"যারা বিজ্ঞান নিয়ে অল্পবিস্তর কাজ করেছে তারা সবাই ভাবে বিজ্ঞান সব সময় সবকিছু নিখুঁতভাবে বলে দেয় অন্তত বলার চেষ্টা করে। প্রকৃতি কী নিয়মে চলে বিজ্ঞান সেটাই বোঝার চেষ্টা করে, যখন বিজ্ঞান সেটা বুঝতে পারে তখন কখন কোথায় কীভাবে কী ঘটবে বিজ্ঞান সেটা আগে থেকে বলে দিতে পারে।... কাজেই যারা বিজ্ঞানচর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব তখন আমরা সব সময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনও একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না তখন বুঝতে হবে এর পেছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয় নি, যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এক কথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না, সে তার ভেতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনই সেটা জানতে পারবে না..." [৯৭]

বিজ্ঞানের এত এত আবিষ্কার, প্রযুক্তির নানারূপ আর গাদা গাদা নোবেল প্রাইজের পরও, কেন মহাবিশ্ব আবির্ভূত হলো—বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তরের ধারেকাছেই ঘেঁষতে পারেননি।

এদিকে বিশ্বখ্যাত পদার্থকণা বিষয়ক গবেষণা জগতের আইকন *সার্ন* (ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ-*CERN*) এর বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। তাঁদের গবেষণার ফল বলছে, আমাদের এই অবাক করা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকার কথা না, অস্তিত্বে আসার সাথে সাথেই এটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা! পদার্থ (*matter*) ও সমপরিমাণ প্রতিপদার্থ (*anti-matter*) এর পারস্পরিক ক্রিয়ার কারণে ঠিক এমনটাই হওয়ার কথা! এহেন

---

৯৬. বিজ্ঞানের উপকারিতা ও অপকারিতা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন : 'কাজেই মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায়, আবার যদি ভরসা না করে তাহলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?' দেখুন: ড. জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স; পৃ. ৯ (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

ফলাফলে তাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়![১৮]

বিজ্ঞানী মহলে বর্তমানে গৃহীত মডেল (*Concordance Model*) জানাচ্ছে, এই প্রকাণ্ড মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি ৫% এরও কম, যা আমাদের চেনাজানা পদার্থ দিয়ে গঠিত! তা হলে বাকিটুকু? বাকিটুকু বুঝতে হলে হয় মূল তত্ত্বের মাধ্যাকর্ষণ এর ধারণায় বদল ঘটাতে হবে অথবা কোনও রহস্য ঢুকিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞানীরা শেষমেশ রহস্যই ঢুকিয়ে দিলেন, ডার্ক রহস্য! তাঁরা বললেন, মহাবিশ্বের বাকিটুকুতে রয়েছে প্রায় ২৫% শীতল ডার্ক ম্যাটার আর প্রায় ৭০% ডার্ক অ্যানার্জি! গোঁড়া নাস্তিক জ্যোতির্বিদ নিল ডিগ্রাসি টাইসন বলেন :

> "আমি জানতে চাই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি কী দিয়ে তৈরি। এগুলো এখনও রহস্যই রয়ে গেল, পুরোপুরিই রহস্য। (এদের ধারণা) আবিষ্কারের পর থেকে (এখন পর্যন্ত) কেউ এই রহস্য সমাধানের ধারের কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।"[১৯]

তা ছাড়া জ্যোতির্বিদরা জানাচ্ছেন, আমাদের এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বিপুল এলাকা চিরকাল আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে রয়ে যাবে *(কসমোলজিক্যাল ইভেন্ট হরাইজন)*! সভ্যতার বিকাশে এতদূরে আসার পরও যেখানে বিজ্ঞান প্রকৃতির সামান্যই জানাতে পারছে, সেখানে বিজ্ঞানের কাঁধে ভর করে স্রষ্টাকে দেখতে চাওয়া, পরকাল দেখতে চাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। মহান আল্লাহ হলেন বস্তু জগতের বাইরের সত্তা। তাই আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

> কোনও দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল। [ভাবার্থ, আল কুরআন, সূরা আনআম, ৬ : ১০৩]

---

১৮. Andrew Griffin, The Universe shouldn't exist, scientists say after finding bizarre behaviour of anti-matter: We don't know why the universe isn't destroying itself. The Independent, 23 October 2017

১৯. Nei Degrasse Tyson Quotes. BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2018. http://brainy-quote.com/quotes/neil_degrasee_tyson_531119

সারমর্ম

বিশ্বাসের সাতকাহনে আমরা শুনলাম এক ভুলে যাওয়া গল্পের কথা, হাই ইবনে ইয়াকজানের জীবন সংগ্রামের কথা। জানতে পারলাম একাকী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে একসময় তার স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার কথা। মনের গহীনে ঘুমিয়ে থাকা স্রষ্টার অস্তিত্বের পূর্বজ্ঞানের প্রজ্বলনে তার ভাবনার জগতে ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন, সূচনা হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়ের।

প্রতিটি মানুষই মূলত স্রষ্টার অস্তিত্বের পূর্বজ্ঞান ও তাঁকে আপন করে নেওয়ার বাসনা নিয়ে জন্মায়। ইসলাম এই অনুভূতিকে ফিতরাহ্ বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এই ফিতরাহ্-র ডাক অনুভব করেছেন, সে ডাকে সাড়া না দেওয়ার যন্ত্রণায়-বেদনায় নীল হয়েছেন। আলোচিত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স এই ফিতরাহ্ অনুভব করেছেন, আরেক সেলেব্রিটি অজ্ঞেয়বাদী কার্ল স্যাগান অনুভব করেছেন; অনুভব করেছেন বিখ্যাত পদার্থবিদ আইনস্টাইনও! হাল আমলের বিজ্ঞানধর্মের অনুসারীরা বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টাকে আক্রমণের নানা পরিকল্পনার ছক এঁকে বেড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞান যে নিজেই এই ফিতরাহ্-র বাস্তবতা উচ্চকণ্ঠে জানান দিচ্ছে, তা তারা জানেই না, জানলেও চোখ বন্ধ করে ফিরে যায়। আলো এড়াতে চাইলে চোখ বন্ধ করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে?

এই ফিতরাহ্-র জাগরণ নিয়েই অধ্যায়ের বাকি কথাবার্তা। বিভিন্ন নিয়ামকের সংস্পর্শে এই সুপ্ত আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যাদেশ, প্রমাণ, যৌক্তিক আলোচনা, কঠিন বিপদের কোনও মুহূর্ত ইত্যাদি কালি দিয়ে ঢেকে যাওয়া অমল আলোকে উন্মোচিত করতে পারে। নমুনা হিসেবে দেখলাম ডা.

তসলিমা নাসরিনের ঘটনা ও হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতিচারণ। ফিতরাহ্-কে ঘষেমেজে ঝকঝকে করার বাসনায় সৃষ্টজগত নিয়ে মস্তিষ্ক-চর্চায় লিপ্ত হলাম; মহাবিশ্ব ও ডিএনএ-র দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম, আপ্লুত হলাম।

শেষদিকে এসে আমরা *প্রবলেম অব ইভল* নামক দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করলাম। দেখলাম আস্তিকতার বিরুদ্ধে মন্দ-সমস্যা যুক্তিকে যে ফলাও করে প্রচার করা হয়, তা মূলত স্বল্প দৃষ্টি ও সংকীর্ণ মানসিকতার ফল। এককালের খ্যাতনামা নাস্তিক দার্শনিক এন্টনি ফ্লিউ নাস্তিকতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন এই মন্দ-সমস্যার অনুভূতির ওপর ভর করে। আরও বেশ কিছু নাস্তিক বিদ্যানদের নাম শুনলাম—যারা নিজের নাস্তিকতাকে এই যুক্তির মোড়কে মুড়িয়ে উপস্থাপন করতে চায়। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এন্টনি ফ্লিউ শেষকালে বুঝেছিলেন এই মন্দ-সমস্যা যুক্তির কাঁধে ভর করে নাস্তিপাড়ায় টুঁ-মারা আসলে অপরিপক্ক পদক্ষেপ। তা ছাড়া আমরা নাস্তিক দার্শনিকদেরকেই এই স্বীকারোক্তি দিতে দেখলাম—এই যুক্তি আসলে ধর্মে বর্ণিত স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বলে যে অভিযোগ আনা হয়, তা বাতিল।

সবশেষে আলোচনা করলাম নাস্তিকদের স্রষ্টাকে দেখতে চাওয়ার বাতুল দাবি নিয়ে। এ দাবি অবশ্য পুরোনো নয়। আল-কুরআন ঘাঁটলে আরেক জাতির কথা পাওয়া যায়, যারা ঘোর অবাধ্যতাবশত স্রষ্টাকে চর্মচক্ষে দেখার দাবি জানিয়েছিল। আলোচনায় জানলাম এই দাবির অসারতা, দেখলাম বিজ্ঞানের কাঁধে ভর করে যারা এমন দাবি জানায়, তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের বড্ড অভাব।

অধ্যায়

৩ ধর্ম নিয়ে যত কথা

ধর্মের উৎপত্তি

মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়—সকল সভ্যতাতেই ধর্ম একটি মৌলিক উপাদান। ইতিহাসে এমন কোনও সম্প্রদায় খুঁজে পাওয়া যায় না, যারা সকলে মিলে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। গবেষকদের মতে সেই প্রাচীন যুগে আজকের প্রচলিত অর্থে নাস্তিক (অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এমন) কারও হদিস মেলা ভার।[১] ধর্মীয় বিশ্বাসের এমন প্রাচুর্য বস্তুবাদী গবেষকদের বিরক্তির কারণ। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট বলেন :

> "... ধর্ম সার্বজনীন বলে পুরোনো যে বিশ্বাস, তা সারগর্ভে সত্যি। দার্শনিকের নিকট এটি ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বের অসাধারণ ঘটনাগুলোর একটি। সে কিন্তু এতেই পরিতৃপ্ত নয় যে, সকল ধর্মেই প্রচুর আগড়ম-বাগড়ম আছে। বরং সে এহেন বিশ্বাসের প্রাচীনত্ব এবং সর্বব্যাপিতায় মুগ্ধ না হয়ে পারে না। মানুষের এ অবিনাশ্য অনুরাগের উৎস কী?"[২]

কীভাবে এই ধর্মের শুরু হলো, তা নিয়ে মানুষের জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে মুক্তমনা ব্লগে '*উত্তর পুরুষ*' নামে একজন লিখেছেন :

> "পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ণ অনুমান। থাকতে হবে কল্পনার প্রখর শক্তি। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, *ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ*। কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে 'প্রাকৃতিক পরিবেশে' বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে কল্পনা ও অনুমানের

---

১. Stephen Bullivant, Michael Ruse (etd.), The Oxford Handbook of Atheism; p. 154-155 (Oxford: Oxford University Press, 2013)

২. Will Durant, The Story of Civilization; part 1: our oriental heritage, p. 57 (New York: Simon and Schuster, 1942)

কঠিন সত্য দিয়ে।..."[৩]

পাঠক হয়তো এতক্ষণে হাসা শুরু করেছেন। যুক্তি-প্রমাণ বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলা মুক্তমনাদের এ কী দশা! কল্পনা ও অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে ধর্মের উৎপত্তি বুঝবে! তাও ভালো, উত্তর পুরুষ স্বীকার করেছেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা কল্পনা ও অনুমান নির্ভর। ড. আজাদ কি তাই করেছেন? না, করেননি। তিনি এই কল্পনা ও অনুমানকে এমনভাবে লিখেছেন—যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য ভেবে বসে! (পৃ. ৮১-৮২, ১১৬-১১৭)

ঊনবিংশ শতকের গবেষকগণ ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্বের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তারা বস্তুবাদের অনুমানের ওপর চড়ে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করাতে শুরু করেন, ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্রষ্টা আছেন এবং তিনি প্রত্যাদেশ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যপথে আহ্বান করেছেন, এই সম্ভাবনা তারা পাশ কাটিয়ে যান।[৪] আমরা আগেই আলোচনা করেছি—সকল তথ্যপ্রমাণ যদি স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তবুও বিজ্ঞানীরা তাতে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, স্রেফ পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন ও বস্তুবাদী তত্ত্ব উপস্থাপন করবেন (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী কালে চার্লস ডারউইনও এসকল মতের সাথে একমত পোষণ করেন।[৫]

তারা ধারণা করেন—আদিমানবের চিন্তাক্ষমতা ছিল অবিকশিত। তাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল, বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার মননশীলতা ছিল না। তারা অনুমান করেন—আদিম মানুষ ছিল অনেকটা শিশুর মতোই, যাকে তারা তথাকথিত *প্রিমিটিভ মাইন্ড* বলে অভিহিত করেন। নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর (১৮৩২-১৯১৭) মত দেন, আদিমানবের মনে মৃত্যু, স্বপ্ন, ছায়া প্রভৃতি থেকে আত্মার ধারণা আসে। তারপর এই আত্মার ধারণা ছড়িয়ে পরে সকল বস্তুতে। এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, সবকিছুরই আত্মা আছে। একে বলা হয় সর্বাত্মাবাদ বা সর্বপ্রাণবাদ (*Animism*)।

সর্বপ্রাণবাদের ধারণা কিন্তু শুরু থেকেই বস্তুবাদী মহলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যারেট দ্বিমত পোষণ করে বলেন : ধর্মের প্রথম স্তর হলো *প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ* (*Pre-Animism*)। এদিকে ফরাসি সমাজবিদ এমিল ডুর্খেইম বলেন :

৩. https://blog.mukto-mona.com/2010/07/06/8540 [http://archive.is/GNwBm]

৪. E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 121 (Oxford University Press, 1965)

৫. Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex; p. 469–470 (Toronto: Modern Library, no date)

তোমার কথা মানি না, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বরং *টটেমিজম*-এর থেকে। জেমস ফ্রেজার আবার অন্য কথা বলে বসলেন। তিনি বললেন, নারে বাবা, শোন, আগে জাদু এসেছে, তারপর ধর্ম, তারপর ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সূচনা। [৭]

ড. আজাদও মানুষের উদ্ভাবিত প্রথম ধর্ম হিসেবে সর্বাত্মাবাদের কথা বলেছেন। বলেছেন এর সাথে জড়িত ছিল *ফেটিশিজম* বা ইন্দ্রজালবাদ। (পৃ. ৮১) পশ্চিমের প্রতি উনার অগাধ ভক্তির কারণে এ ধারণাগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি! প্রচলিত মত বা প্রথায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন* জানাচ্ছে—এই সর্বাত্মাবাদের তত্ত্ব এখন পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে! [৬] এদিকে *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* বলছে, আজকের চিন্তাবিদদের মতে আদিমানব সম্পর্কে এমন ধারণা একেবারেই ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। [৭]

ড. আজাদ ফ্রেজারের উদ্ধৃতি দিয়ে এক পৃষ্ঠা জুড়ে জাদু-ধর্ম বয়ান দিয়েছেন। (পৃ. ১১৬) কিন্তু আধুনিক সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা এ ধরনের ধারণাকে গ্রহণ করতে নারাজ। *ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন* জানাচ্ছে, ফ্রেজারের মত এখন পুরোপুরি পরিত্যাক্ত। [৮] *ডিকশনারি অব সোশিয়াল সাইন্স*-এ বলা হয়েছে,

> "টেইলর আর ম্যারেট-এর সর্বপ্রাণবাদ ও প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ কোনটি আগে বা পরে উদ্ভব হয়েছে, এ নিয়ে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে যে বাদানুবাদ চলে আসছিল, এখন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। কাল্পনিক ছদ্ম-ইতিহাসের গল্প ফাঁদা বা সর্বত্র একইরূপে বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব হয়েছে এমন অনুমান করা, এসবে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।" [৯]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যার প্রফেসর, স্যার ইভানস প্রিটচার্ড ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত এসকল মতবাদ প্রসঙ্গে এককালের বহুল পঠিত বইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন :

---

৬. Robert S. Ellwood & Gregory D. Alles (etd.), The Encyclopedia of World Religions; p. 20 (Facts On File, Inc. 2007)

৭. George Kerlin Park, Animism in Encyclopedia Britannica. Retrieved from: http://www.britannica.com/topic/animism

৮. Britannica Encyclopedia of World Religions; p. 359 (Encyclopædia Britannica, Inc. 2006), আরও দেখুন: E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 28

৯. নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ; পৃ. ১৯৫ (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩)। মূল বইয়ের অনুবাদে কাঠিন্য থাকায় পুনরায় অনুবাদ করা হয়েছে।

"আমি কেবল বইটার নাম এজন্যই বললাম যে, আদিতে ধর্মের স্বরূপসংক্রান্ত মতবাদগুলো যে কতটা গলদ হতে পারে, তা জানার জন্য এই বইটি আমার মতে সেরা দৃষ্টান্ত।... এটি হলো অযৌক্তিক রিকনস্ট্রাকশান, অসমর্থনযোগ্য অনুকল্প ও আন্দাজ, বিচার-বিবেচনাহীন জল্পনাকল্পনা ও অনুমান, অসঙ্গত উপমা, ভুল অনুধাবন ও ভুল ব্যাখ্যায় ভরপুর। বিশেষ করে, টটেমিজম সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা স্পটতই ছাইপাঁশ ছাড়া কিছু নয়।" [১০]

ড. আজাদ এত কিছু খুঁজতে যাননি, ধর্মকে আক্রমণ করতে হবে তাই গদবাঁধা কথাবার্তা চালিয়ে দিয়েছেন। বলতে চেয়েছেন এসব প্রাথমিক ধারণার পরে ক্রমান্বয়ে বহুঈশ্বরবাদ দেখা দিয়েছে। তার আরও পরে, আজ থেকে প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছে। (পৃ. ৮৩-৮৪, ১০৩) কিন্তু এসব তথাকথিত ক্রমবিকাশের পর্যায় সম্পর্কে প্রফেসর ইভানস প্রিটচার্ড, গবেষক ফ্রেডেরিক শ্লেটার-এর সাথে একমত হয়ে বলেন :

"শ্লেটার ঠিকই বলেছেন, ধর্মের প্রারম্ভিক অবস্থা ও (তা থেকে) ধারাবাহিক পর্যায়ে তথাকথিত বিকাশের যত ছক আঁকা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই একেবারে খামখেয়ালিপূর্ণ ও লাগামহীন ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। কোনও তত্ত্বই এর ব্যতিক্রম নয়।" [১১]

স্কটিশ সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমও ধর্মের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত এসব তথাকথিত ধারণা সঠিক মনে করতেন না। [১২]

বস্তুত বস্তুবাদী গবেষকগণ বিবর্তন-তত্ত্ব সম্পর্কে ভুল বুঝেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে অধিক উন্নত ও বিকশিত প্রাণের উদ্ভব হয় (*Progress*)। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব অনুযায়ী এ ধারণা ভুল। জার্মানিতে ডারউইনের অন্যতম সমর্থক আর্নেস্ট হেকেলের দ্বারা এই প্রগ্রেসের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। বিবর্তনের অতি পরিচিত আইকন-বানর সদৃশ পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমান্বয়ে অধিক বিকশিত মানুষের উদ্ভব, আসলে পুরোই ভুল। [১৩] Nature জার্নালের বায়োলজির সিনিয়র এডিটর (নাস্তিক) বিজ্ঞানী ড. হেনরি গি তাঁর *The Accidental Species*

১০. E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 05

১১. E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 105

১২. Ernest Gellner, Muslim Society; p. 8-11 (Cambridge University Press, Reprint 1984)

১৩. রাফান আহমেদ, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা; পৃ. ৬০ (ঢাকা : সমর্পণ প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৮)

: *Misunderstandings of Human Evolution* গ্রন্থে বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমউন্নয়ন বা প্রগ্রেসের ধারণাকে হাস্যকর গল্প বলে অভিহিত করেছেন।[১৪]

নৃবিজ্ঞানী ইভানস প্রিটচার্ড বলেছেন, এসকল বস্তুবাদী তত্ত্বে আগেই এই অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আমরা হলাম ক্রম-উন্নয়নের পথের এক প্রান্তে, আর আদিমানবেরা হলো অপর প্রান্তে। তাই আদিমানবদের শিশুসুলভ, মোটা বুদ্ধির উড়নচণ্ডী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অনেকটা পশুতুল্য, আহাম্মক টাইপের ভাবা হয়েছে। ড. আজাদও তাই ভেবেছেন। (পৃ. ৬৪) প্রফেসর ইভানসের মতে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের গবেষণা বলছে, আদিমানব সম্পর্কে এমন ধারণা ক্রটিপূর্ণ ও আবর্জনায় ভরপুর।[১৫] এখনকার নৃবিজ্ঞানীরা ধর্মের উৎপত্তি খোঁজা বাদ দিয়ে সামসময়িক ধর্ম ও সংস্কৃতি গবেষণার দিকে ঝুঁকেছেন।[১৬]

আদিমানবদের এমনভাবে উপস্থাপন করা উপনিবেশবাদীদের স্বার্থোদ্ধারে বেশ কাজে লাগে। প্রফেসর ইভানস বলেন : আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ দাসপ্রথার পক্ষে সমর্থন যোগাতে আবার কেউ কেউ বিবর্তনের ধারায় বানর ও মানুষের মাঝে হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র (*missing link*) খুঁজে বের করার ধান্দায় এসকল লাগামছাড়া তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন।[১৬] তবে আসল কথা হলো, এসকল গবেষকদদের একটা বড় অংশের অন্য এজেন্ডা ছিল। আর তা হলো ধর্মকে আক্রমণ করা! পাঠক হয়তো এ পর্যায়ে অবাক হতে পারেন, সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের নামে এসব কী বলা হচ্ছে! অক্সফোর্ড প্রফেসর স্যার ইভানস প্রিটচার্ড অকপটে এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি বলেন :

> "আমি মনে করি, আমরা যদি এসকল পণ্ডিতদের (ধর্মসংক্রান্ত) তত্ত্বের কাঠামো বুঝতে চাই, তবে এদের একটা বড় অংশের অভিসন্ধি বুঝতে হবে। তারা খ্রিষ্টবাদকে (প্রকারান্তরে অন্যান্য ধর্মকে) পরাস্ত করতে প্রাণঘাতী অস্ত্রের সন্ধানে ছিলেন, এবং (ভেবে বসেন) আদিধর্মে তার খোঁজ পেয়ে গেছেন। যদি আদিধর্মকে মস্তিষ্ক বিকৃতি, মানসিক চাপ বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ফলে তৈরি মরিচিকাসদৃশ বলে দাঁড় করানো যায়, তা হলে এটা আর বলার বাকি থাকে না যে, উচ্চতর ধর্মগুলোকে একই পন্থায় নিন্দা করে ঝেড়ে ফেলা যাবে।"[১৭]

---

১৪. Henry Gee, The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution; chapter 1: An Unexpected Party (Epub Edition, University of Chicago Press, 2013)

১৫. E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 105-106

১৬. প্রাগুক্ত, p. 106

১৭. প্রাগুক্ত, p. 15

অন্যদিকে বস্তুবাদী গবেষকদের এসকল ধারণার বিপরীতে শুরু থেকেই মানুষ একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এমন প্রমাণ মিলতে শুরু করে। টেইলরের প্রিয় ছাত্র সাহিত্যিক ও নৃতত্ত্ববিদ অ্যান্ড্রু ল্যাং (১৮৪৪-১৯১২) ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Making of Religion* গ্রন্থে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, সৃষ্টিশীল, নৈতিক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ একক স্রষ্টার ধারণা পৃথিবীর একেবারে আদিমতম মানবদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। ল্যাং দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে, একেশ্বরবাদের অস্তিত্বই প্রথম। পরে তা বিভিন্নভাবে কলুষিত হয়ে পড়ে।[১৮]

কিন্তু ঝামেলা হলো আদিমানব একেশ্বরবাদী স্বীকার করলে বিবর্তন তত্ত্বের প্রতি তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বস্তুবাদী গবেষকদের অনুমিত ক্রমধারা অনুযায়ী, একেশ্বরবাদ আধুনিক মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের ফসল। তারা ভেবেছিলেন, আদিমানবের মস্তিষ্ক তো অনুন্নত ছিল। তাই তাদের মাঝেও যদি একেশ্বরবাদ পাওয়া যায় তা হলে, তাদের যে তথাকথিত *প্রিমিটিভ মাইন্ড* অর্থাৎ অবিকশিত মনন ছিল, তা আর ধোপে টিকবে না। তাই দেখা যায়, তৎকালীন বিজ্ঞানীরা একেশ্বরবাদের পক্ষে থাকা প্রমাণগুলো একেবারে উপেক্ষা করে যান![১৯] হায়রে সত্য সন্ধানী বিজ্ঞানীর দল!

পরবর্তী কালে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ উইলহেম স্মিত অ্যান্ড্রু ল্যাং-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। নিজের গবেষণা থেকে তিনি জানান যে, আদিমানবের মাঝে সর্বপ্রথম ধর্ম ছিল এক মহান খোদায় বিশ্বাস, যা কিনা "*Primal Monotheism*"। ড. পল রেডিন বলেন :

> "ল্যাং সাহেব তাঁর বই লেখার পর পঁচিশ বছর কেটে গেল, তিনি যা ভেবেছিলেন তার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি মিলেছে। আগের নৃবিজ্ঞানীরা পুরোই ভুলের ওপর ছিলেন। বিশেষজ্ঞ গবেষকদের পাওয়া নিখুঁত তথ্যপ্রমাণ ল্যাং সাহেবের অস্পষ্ট দৃষ্টান্তগুলোকে সরিয়ে আরও জোরালো প্রমাণ দাঁড় করিয়েছে। অনেক আদিম মানব যে এক সর্বোচ্চ-অদ্বিতীয় বিধাতায় বিশ্বাস করত, এনিয়ে এখন কারও তেমন একটা দ্বিমত নেই।"[২০]

---

১৮. E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; p. 32

১৯. H. Cornell Goerner, Ph.d., The Question of Primitive Religion: A Review of the Shifting of Scientific Opinion in Favor of the Theory of Primeval Monotheism. The Review and Expositor, Vol. XXXIII, No. 4, p. 362 (October, 1936)

২০. Paul Radin, Primitive Man as Philosopher, p. 346 (D. Appleton and Company, 1927)

উইলহেম শ্মিত ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদদের চিন্তাধারায় এক বিপ্লব ঘটান। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ওপর গবেষণা চালান। গবেষণার ফলাফল নিয়ে তিনি ১২ খণ্ডের *Der Ursprung der Gottesidee (The Origin of the Idea of God)* রচনা করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন :

> "... ১৯১২ সালে প্রথম প্রকাশিত *The Origin of the Idea of God* গ্রন্থে উইলহেম স্মিত বলেছেন, (প্রাচীনকালের) পুরুষ ও নারীরা একাধিক দেবতার উপাসনা শুরু করার পূর্বে (তাঁদের মাঝে) আদি একেশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল। শুরুতে তারা কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করত, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও দূর থেকে মানুষের নানা বিষয় নজরে রাখছেন। এমন মহান খোদায় বিশ্বাস (যাকে স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত করে কখনওসখনও আকাশের খোদাও বলা হত) এখনও অনেক আদিবাসী আফ্রিকান গোত্রের ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। তারা ব্যাকুলভাবে খোদার কাছে প্রার্থনা করে; বিশ্বাস করে যে, তিনি তাদের নজরদারি করছেন এবং খারাপ কাজ করলে তিনি শাস্তি দিবেন। কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হলো—তিনি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে (মূর্তরূপে) অনুপস্থিত: তাঁর কোনও বিশেষ পূজা-অর্চনা ছিল না এবং কখনোই তাকে প্রতিমায় রূপ দেওয়া হয়নি। আদিবাসীদের মতে তিনি অনির্বচনীয় এবং এমন সত্তা যিনি দুনিয়া দ্বারা কলুষিত হওয়ার নন। কেউ কেউ আবার বলে যে, তিনি অপগত। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, (সময়ের আবর্তে) এই খোদা (তাদের নিকট) এত দূরবর্তী ও সুউচ্চ মনে হতে থাকে যে, কার্যত তিনি ছোটখাটো ও আরও সহজলভ্য দেবতাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করেন। স্মিত-এর থিওরিও এমনটাই বলে যে, প্রাচীনকালে সেই মহান খোদা (ক্রমান্বয়ে) পৌত্তলিকতার বেড়াজালে আরও চকমকে দেবতাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যান। শুরুতে, তাই এক খোদাই ছিলেন। তাই যদি হয় তবে একেশ্বরবাদই হলো অন্যতম প্রাচীন ধারণা ...।"[২১]

গবেষণার ফল থেকে উইলহেম শ্মিত ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন আদিবাসীরা সম্ভবত কোনও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, যা পরে বিকৃত হয়ে পড়ে।[২২]

ইসলাম আমাদের জানায় মানুষ প্রথম মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস নিয়েই এই বসুধায় পদার্পণ করে। পরবর্তী কালে শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন মূর্তির বেড়াজালে পড়ে, পূর্বপুরুষদের মাধ্যম হিসেবে উপাসনা করে আল্লাহকে পাওয়ার কর্মে লিপ্ত হয়। এদের কয়েক প্রজন্ম পার হওয়ার পর, মূর্খ উত্তরসূরিরা সরাসরি

২১. Karen Armstrong, A History of God; p. 3-4 (New York: Ballantine Books 1993)

২২. Britannica Encyclopedia of World Religions; p. 915

দেবতারূপে মূর্তির উপাসনা শুরু করে। কিন্তু তারাও একথা স্বীকার করত, বিধাতা একজনই।[২৩] এখনও পৃথিবীর অনেক আদিবাসী মানবের মাঝে এক ঈশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়। উইলহেম স্মিত তার আলোচিত গ্রন্থে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে এর পক্ষে প্রমাণ এনেছেন।

ড. আজাদ ঊনবিংশ শতকের বাতিল-তত্ত্ব দিয়ে স্বীয় গ্রন্থের বেশ কয়েক পাতা কালিপূর্ণ করার আগে দাবি করে বসেছেন—পুরাণ থেকেই নাকি ধর্মের উৎপত্তি (পৃ. ৮০)। এই দাবির পক্ষে কোনও যাচাইযোগ্য প্রমাণ দেননি, স্রেফ দাবি ছুড়ে দিয়েছেন। উনার ধারণা যেহেতু পুরাণের সাথে এখনকার ধর্মের কিছু কিছু বিষয় মিলে; আবার বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলোর মাঝেও কিছু মিল পাওয়া যায়। তাই এগুলো একটা থেকে আরেকটা ধার করে তৈরি হয়েছে; হাস্যকর কুযুক্তি (*Faulty Generalisation*)।

ধরুন, একজন শিক্ষক পরীক্ষার খাতা দেখছেন। প্রশ্ন এসেছে, *মাইক্রোনিশিয়া* কোথায় অবস্থিত? ক্লাসের সবাই সঠিক উত্তর লিখেছে। এখন শিক্ষক কি এটা ভাববেন যে, যেহেতু সকলের উত্তর মিলে গেছে, সুতরাং কোনও সন্দেহ নেই যে সকলেই একে অন্য থেকে দেখে লিখেছে, তাই নাম্বার কাটা! নাকি এটা ভাববেন, সবাই একই যায়গা থেকে উত্তর শিখেছে? কেউ কেউ নকল করতে পারে, তার মানে এই নয় সবাই নকল করেছে।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি শাখা হলো ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, যেখানে ভাষাগুলো কীভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত হলো, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্ব ভাষাবিজ্ঞানের জনক হিসেবে খ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার *রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি*-তে তার তৃতীয় বার্ষিক বক্তৃতায় বলেন : ইউরোপীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি লক্ষ করেছেন, গ্রিক-ল্যাটিন-গথিক ও কেলটিক এবং সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের গাঠনিক সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এগুলো সবই একই ভাষা থেকে উদ্ভূত।

জোন্সের এই গবেষণার ভিত্তিতে ১৯শ শতক জুড়ে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসম্ভারের, শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা চালান। ফলে আবিষ্কার করেন যে প্রকৃতপক্ষেই ল্যাটিন, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষাগুলো পরস্পর সম্পর্কিত। ইউরোপের বেশিরভাগ ভাষার মধ্যে বংশগত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এগুলো সবই একটি আদি

---

২৩. তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নূহ (৭১) এর তাফসীর দ্রষ্টব্য

ভাষা প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত।[২৪]

এখানে যে চিন্তাধারা অনুসরণ করা হয়েছে, তা ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক চিন্তা পদ্ধতি—সাদৃশ্য একক উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে। ড. আজাদ নিজে ভাষাবিজ্ঞানী হয়েও ধর্মের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের এমন চিন্তাপদ্ধতি এড়িয়ে গেছেন। হতে পারে, এসকল ধর্মের উৎস ছিল এক, পরে তা পরিবর্তন, বিকৃতির শিকার হয়েছে—এমন চিন্তা তিনি করেননি; করলে নিজের প্রোপাগান্ডা সফল হতো না যে।

পৃথিবীর অনেক বিচ্ছিন্ন আদিবাসী পাওয়া যায়, যারা কখনোই বাইরের সভ্যতার সংস্পর্শ পায়নি, অথচ তাদের বিশ্বাসের মাঝে অদ্ভুত মিল! জানা যায়—তারা এক খোদার উপাসনা করত, তাদের কাছে খোদাপ্রেরিত বাণী ছিল কিন্তু সেটা হারিয়ে গেছে। তারা প্রতীক্ষায় আছে এমন একজনের, যে তাদের কাছে সেই হারিয়ে যাওয়া বাণীকে ফিরিয়ে আনবে। লাহু-কারেন-কাচিন-কুই-লিশু-মিযো-সাঁওতাল-সহ আরও অনেক আদিবাসীদের মূল বিশ্বাস এমন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে ড. আজাদের 'পুরাণ থেকে ধার করা' তত্ত্ব খাটছে না। বরং এই বাস্তবতা ইঙ্গিত করছে, তারাও স্রষ্টা থেকে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে সাধু পল প্রচারিত খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা এদের অধিকাংশকেই খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলে।[২৫]

ধর্মের উপকারিতা

একজন মুসলিম ইসলামের অনুসরণ করেন আখিরাতের জীবনে সফল হওয়ার জন্য। তবে ধর্মের বিধান মানার দ্বারা তার দুনিয়াতেও কল্যাণ সাধিত হয়। কয়েক দশক ধরে চলা শতাধিক গবেষণায় দেখা গেছে—যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারা শারীরিক, মানসিক ও আবেগী দিক থেকে অধিক সুস্থ থাকেন। পরীক্ষালব্ধ গবেষণার ফল জানাচ্ছে—যারা বৈজ্ঞানিক-বস্তুবাদি ওয়ার্ল্ডভিউতে বিশ্বাসী, তারা ধর্মে বিশ্বাসীদের চেয়ে কম আত্মতুষ্টি উপভোগ করেন। এই বাস্তবতা নাস্তিকদের পছন্দ হবে না এতে সন্দেহ নেই।

---

২৪. আবু তাহের মজুমদার, জোনস, স্যার উইলিয়াম। বাংলাপিডিয়া আর্টিকেল, দেখুন: http://archive.is/ONkfK

২৫. Don Richardson, Eternity in Their Hearts: Startling Evidence of Belief in the One True God in Hundreads of Cultures Throughout the World (Epub Edition, Bethany House Publishers 2014)

ড. আজাদ মনে করেন ধর্মের কোনও উপকারিতা দেখা যায়নি, কিন্তু অজস্র অপকারিতা নাকি সব সময়ই দেখা যায়; মানুষ নাকি মর্মমূলেই ধর্মবিরোধী। ড. আজাদের দৃষ্টিতে ধার্মিক মানুষ মানেই অসুস্থ মানুষ! (পৃ. ৭৭-৭৮) তিনি জোর গলায় বলতে চেয়েছেন:

"ধর্মের কোনও উপকারিতা নেই, বস্তুগতভাবে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না যে এর রয়েছে উপকারিতা; তবে এর অপকারিতা রয়েছে প্রচুর, বস্তুগতভাবে সব সময়ই তা প্রমাণ করা যায় ..." (পৃ. ১৩০)

এগুলো নিতান্তই নিচুমানের বাজে কথা! উনার সাধের বিজ্ঞান থেকেই এর বিরুদ্ধে ঢের প্রমাণ দেওয়া করা যাবে। সেক্যুলার-বস্তুগত গবেষণায় জানা যাচ্ছে, জীবনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, একাত্মতা, অন্তরের প্রশান্তি, মানসিক সমন্বয়, আশাবাদ, নৈতিক অনুপ্রেরণা এসকল কিছুর উৎসই হলো ধর্মীয় বোধ। যার ফলে দেখা যায়, ধার্মিক মানুষেরা জীবন সম্পর্কে অধিক আশাবাদী ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, জীবনের নানা চাপ অধিক ভালোভাবে সামলে নেয় এবং নৈতিকতা ও বদান্যতার ধারা গড়ে তোলে। যা তাদের সমাজকে অধিক কার্যকরি করে তুলতে ভূমিকা রাখে।

প্রায় ২০০-র অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে অধিক ধার্মিকতা (সপ্তাহে অন্তত একদিনও উপাসনালয়ে যাওয়া) হতাশা, মাদকাসক্তির ঝুঁকি কমায়; আত্মহত্যা প্রবণতা কমায় ও অধিক জীবনতুষ্টির অনুভূতি আনয়ন করে। পেনসিল্‌ভানিয়া স্টেট ফর রিসার্চ অন রিলিজিয়ন এবং আর্বান সিভিল সোসাইটি বিভিন্ন পিয়ার রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত ৪৯৮টি স্টাডি পর্যালোচনা করে জানায়—ধার্মিকতার সাথে অধিক আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কিত। পাশাপাশি এটি উচ্চরক্তচাপ, ডিপ্রেশন ও অপরাধপ্রবণতার ঝুঁকি কমায়। *Handbook of Religion and Health* প্রায় ২০০০ স্টাডি পর্যালোচনা করে জানায় যে, ধার্মিক ব্যক্তিরা অধার্মিকদের তুলনায় বেশিদিন বাঁচে ও অধিক শারীরিক সুস্থতা উপভোগ করে।[২৬]

পেনসিল্‌ভানিয়া ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী মার্টিন সিলভারম্যান বেস্ট সেলিং বই *Authentic Happiness* এ কয়েক দশক ধরে চলে আসা রিসার্চের ফলাফলের প্রেক্ষিতে বলেছেন, ধার্মিক মানুষেরা মাদকাসক্তি, অপরাধ, তালাক বা কাউকে খুন ইত্যাদি অপরাধে কম জড়ায়। জীবনের নানবিধ সমস্যার মোকাবিলা ভালোভাবে

২৬. Harold G. Koening et. al, Handbook of Religion and Health; p. 99-101 (Oxford University Press, 2001)

করতে পারে।[২৭] গবেষণায় আরও দেখা গেছে ধার্মিক মানুষেরা সেক্যুলারদের চেয়ে অধিক সুখী হন, পাশাপাশি তারা অধিক আশাবাদীও হয়ে থাকেন। গবেষক অ্যানড্রু ক্লার্ক ও ওরসলা লেলকিস এর সাম্প্রতিক গবেষণাও জানাচ্ছে ধার্মিকেরা নাস্তিক/সংশয়বাদীদের চেয়ে অধিক সুখী হয়ে থাকেন।

আমেরিকার ন্যাশনাল হেলথ ইন্টারভিউ সারভে এর ৮ বছরব্যাপী তথ্যের আলোকে গবেষকগণ খুঁজে পেয়েছেন, যারা সপ্তাহে একাধিকবার অংশ নিয়েছেন তাদের তুলনায় যারা কখনও ধর্মীয় অনুসঙ্গে অংশ নেয়নি তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ১.৮৭ গুণ বেশি। এদিকে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞানীরা প্রায় ৯০০০০ মানুষের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন—ধর্মীয় কর্মে মাসে একবারেরও কম যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের হৃদরোগ, ফুসফুসে এমফাইসিমা, লিভার সিরোসিস, আত্মহনন, বৃহদন্ত্র ও মলাশয়ের ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেশি! সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও জানা যায়, নিয়মিত উপাসনামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলে মৃত্যু ঝুঁকি ২০% পর্যন্ত হ্রাস পায়।[২৮]

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বলা হচ্ছে—মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও অধিকতর প্রশান্তি অর্জনে সাইকোলজিস্টরা রোগীদের পবিত্র কুরআন শ্রবণের পরামর্শ দিতে পারেন।[২৯] আরও গবেষণায় জানা যাচ্ছে, আইসিইউ-তে ভর্তি নবজাতক/প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের কুরআন শোনানো দ্বারা অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।[৩০]

ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার-এর রিসার্চ সাইন্টিস্ট ও সাইকায়াট্রিস্ট ড. হ্যারল্ড কোনিগ সহস্রের ওপর গবেষণার আলোকে বলেন :'

> "দৈনিক এক প্যাকেট করে চল্লিশ বছর সিগারেট খেলে যে ক্ষতি হবে, ধর্মহীনতা স্বাস্থ্যের জন্য একই রকম ক্ষতিকর।[৩১]

---

২৭. Martin E. P. Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment; p. 59 (Simon and Schuster, 2002)

২৮. বিস্তারিত দেখুন: Bruce Sheiman, An Atheist Defends Religion; p. 69-88 (Alpha Books, 2009)

২৯. Mahjoob, M., Nejati, J., Hosseini, A. et al. The Effect of Holy Quran Voice on Mental Health. J Relig Health Vol. 55, Issue 1, p 38–42 (February 2016)

৩০. Investigating the effect of listening to the Holy Quran on the physiological responses of neonates admitted to neonatal intensive care units: a pilot study https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212958817301647

৩১. Andrew Newberg, Eugene D'aquili & Vince Rause, Why God Won't Go Away; Chapter 7 (Epub Edition, New York: Ballantine Book, 2001)

এ বিষয়গুলো আমরা প্রায় কেউই জানি না। যে বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে উপর্যুপরি আঘাত হানার হীন চক্রান্ত করা হয়, সেই বিজ্ঞানই যে ধর্মের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তার সাক্ষী দিচ্ছে তা আমাদের থেকে গোপন রাখা হয়। নাস্তিকেরা জানে এগুলো পত্রপাঠ লেভেলে আনলে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মাঠে মারা যাবে। তারা শুধু আমাদের নাস্তিক মনোবিজ্ঞানী সিগমুয়েড ফ্রয়েডের সেই পুরান বয়ান শোনায়, যেমনটা শোনাতে চেয়েছেন ড. আজাদ উনার সাহিত্যের কলমে।[৩২]

এখানে ফ্রয়েডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খোলাসা করা জরুরি। ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নাস্তিকে পরিণত হননি, বরং নিজের নাস্তিকতাকে সমর্থন যোগাতে, সেই আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করেন। স্রষ্টার ধারণা স্রেফ বাজে ব্যাপার ছিল তার দৃষ্টিতে। ফুয়েরবাখের লেখনীতে প্রভাবিত হয়ে তিনিও ওয়ারফেয়ার মিথে (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) দৃঢ়বিশ্বাস করতে শুরু করেন; বিশ্বাস করতে শুরু করেন ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এই চেতনা নিয়েই তিনি ধর্ম ও মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে থাকেন, এবং একপেশে সিদ্ধান্ত দেন যে, ধর্ম বিশ্বাস স্রেফ একটা মানসিক রোগ![৩৩] ফ্রয়েডের প্রভাবে আমেরিকান সাইকায়াট্রিক এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাসকে মানসিক রোগ বলে আখ্যা দিত![৩৪] ড.আজাদ যার গুণে আপ্লুত সেই বার্ট্রান্ড রাসেলও মনে করতেন, ধর্ম হলো ভয় থেকে উৎপন্ন রোগ এবং মানবজাতির শোচনীয় দুর্দশার উৎস। (পৃ. ১১২) কিন্তু অগণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন এই অনুমানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে মানুষ যত বেশি ধার্মিক হয় (অন্যভাবে বললে মৌলবাদী হয়) সে তত বেশি সমাজমুখর হয়। আর কেউ যত বেশি, যত কট্টর নাস্তিক হয়, সে ততই একজন সাইকোপ্যাথে, মনোবিকলনগ্রস্থ ব্যাক্তিতে পরিণত হয়![৩৪]

একই গবেষণা জানায়, নাস্তিকেরা নাকি বেশি এনালাইসিস করে। আমরা ফিতরাহ্-র আলোচনায় দেখেছি, নাস্তিকতা হলো সাধারণত আমাদের সহজাত চেতনার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত, শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফসল। (অধ্যায় ০২ দ্রষ্টব্য) মাথা না

---

৩২. সিগমুন্ড ফ্রয়েড : অস্ট্রিয় মনোরোগ চিকিৎসক এবং মনস্তত্ত্ববিদ। তাকে মনোবীক্ষণের জনক গণ্য করা হয়। *মনোসমীক্ষণ* নামক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক তিনি। *ইডিপাস কম্পলেক্স* ও *ইলেক্ট্রা কম্পলেক্স* নামক মতবাদ সমূহের জন্য তিনি অধিক আলোচিত। তাঁর বিভিন্ন কাজ জনমানসে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। নাস্তিক এই মনস্তত্ত্ববিদ আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৩. Karen Armstrong, The Case for GOD: What Religion Really Means; p. 247-248 (London, Vintage books, 2010)

৩৪. Tony Jack, A scientific defense of spiritual & religious faith. TEDx Talks, Jul 10, 2015. Available at: https://youtu.be/BihT0XrPVP8?t=924

খাটালে কি আর সহজাত অবস্থা থেকে বেরোনো যাবে? বারুখ আবা শালেভ রচিত *100 years of Nobel Prizes* বইটি ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯০১-২০০০ পর্যন্ত ৬৫৪ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের ৯০% ই ছিলেন আস্তিক, ধর্মে বিশ্বাসী! তা ছাড়া বিজ্ঞানের সকল শাখার জনকদের নাম ঘেঁটে দেখুন, হাতে গোনা কয়জন নাস্তিকের নাম পান কিনা সন্দেহ। আর আজকের বিজ্ঞান যারা শুরু করেছিল সেই মধ্যপ্রাচ্যের চিন্তাবিদরা, তারা ছিলেন মুসলিম। (অধ্যায় ০৫ দ্রষ্টব্য) সুতরাং নাস্তিকেরা বেশি ক্রিটিক্যাল চিন্তা করে, ধার্মিকেরা মাথামোটা এহেন দাবি সামগ্রিক বিচারে মানা যায় না।

যাই হোক, সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উপকারিতা সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হলো কয়েক পাতায়। যা থেকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে ধর্মের বস্তুগত উপকারিতা সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা না। তাই দেখা গেছে নাস্তিক এলান ডি. বটন বই লিখে নাস্তিকদের আহ্বান জানাচ্ছেন ধর্মের এই ভালো দিকগুলো আমাদের চুরি করা দরকার![৩৫] আরেক নাস্তিক ব্রুস শেইম্যান ধর্মের নানাবিধ উপকারী দিক দেখে প্রশ্ন করেছেন :

> "উগ্রবাদী নাস্তিকদের সব সময় দাবি করতে দেখা যায় যে, তারা মানুষকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু ঠিক কোন ব্যাপার থেকে তারা মানুষকে উদ্ধার করতে চায়? কেন তারা মানুষকে অধিক আত্মতৃপ্তি, কৃতজ্ঞতাবোধ, আশা, সুস্বাস্থ্য ও সুখ থেকে 'বাঁচাতে' চায়? যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করছে ধর্মই এই অনুভূতিগুলো বাড়িয়ে তোলে!"[৩৬]

এত ধর্ম! মানব কোনটা?

অনেকদিন আগের কথা। নীল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এক শহরে প্রভাতের মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়ছে। এই রোদের উষ্ণতায় প্রাণটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। সেদিনটি অন্য সকল দিনের মতোই ছিল। বরাবরের মতোই সকালে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা শীতল বাতাসের শিহরনের সাথে নরম রোদের মায়া মাখতে সমুদ্রপারে এসেছে মানুষজন। কিন্তু আজ বাড়তি কিছু অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য, এক ডিঙি

---

৩৫. Alain De Botton, Religion for Atheists: A Non-believer's Guide to the Uses of Religion (Vintage, 2013)

৩৬. Bruce Sheiman, An Atheist Defends Religion; p. 88

নৌকা! তারা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল, দেখতে পেল এক লোক ছোট্ট এক শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নৌকার পাটাতনে পড়ে আছে। নড়াচড়া নেই মনে হচ্ছে, মরে যায়নি তো, মনের কোণে আশঙ্কার মেঘ জমে উঠতে লাগল।

কাছে যেতেই বোঝা গেল লোকটি বেঁচে আছে, তবে নড়ার কোনও ক্ষমতা নেই। লোকজন তাদের নিয়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে। কিন্তু হাসপাতালে আনার পথেই লোকটি মারা গেল। তবে মৃত্যুর আগে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে জানাল, শিশুটির মা তাদের সাথেই জাহাজে ছিলেন। জাহাজডুবির কবলে পড়ে তিনি ও তার সন্তান অন্যান্য যাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। লোকটি মৃত্যুর আগে সফেদ দাঁড়ির এক বৃদ্ধের হাত ধরে কাতর স্বরে প্রতিশ্রুতি চাইলেন, এই ছোট্ট শিশুটির দেখভাল করার এবং যদি তার মা এই দ্বীপের খোঁজ পায়, তা হলে তার হাতে সন্তানকে তুলে দেওয়ার। লোকজন আর কোন তথ্য লোকটির কাছ থেকে জানার আগেই সে পাড়ি জমাল না ফেরার দেশে।

ছয় মাস পর তাদের সমুদ্রের তীরে একের পর এক জাহাজ ভিড়তে লাগল। তিন-চার দিনের মাঝে সত্তর-আশিজন মাতৃত্বের দাবি নিয়ে সাগরের বুকে ভেসে আসল। সকলেই নিজের দাবিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সত্য বলে প্রচার করতে থাকল। নিজের দাবির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করল। শহরের লোকজন পড়ল মহাসমস্যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সেই সফেদ দাঁড়ির লোকটি এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকলেন। তিনি ছিলেন ওই শহরের শাসক। তিনি বললেন, এতগুলো মা হওয়া তো সম্ভব না, একজনের দাবি সঠিক প্রমাণিত হলে বাকি সবার দাবি ভুল। প্রমাণ ছাড়া স্রেফ দাবির কারণে যেমন কাউকে মা সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তেমনি এতজনের মাঝে শিশুটির প্রকৃত মা উপস্থিত নেই—এটাও তো নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। হে নগরবাসী! সমস্যার সমাধানকল্পে কী করা যায় বলুন।

হঠাৎ এক বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, আমি জানি এ সমস্যার সমাধান কী। যেহেতু সবাই নিজেকে সঠিক দাবি করছে, যেখানে প্রত্যেকের দাবি অন্যদের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এখানে কমপক্ষে ৯৯% দাবিদার মিথ্যাবাদী—অতএব স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে এই শিশুটির আসলে কোন মা-ই নেই! তাই আমরা ধরে নেব নৌকায় ভেসে আসা সেই ব্যক্তিও মিথ্যা বলেছে এবং মাতৃত্বের দাবিকারীরাও সবাই মিথ্যা বলছে। আর আমরা বিশ্বাস করব এই শিশুটির কোনও মা নেই, এবং তার কোনও পিতাও নেই। পিতা ও মাতা ছাড়াই এ শিশু এসেছে।

আর যেহেতু শিশুটির কোনও মা নেই, পিতাও নেই, তাই সেই ব্যক্তির কাছে

আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এটা মানতেও আমরা আর বাধ্য নেই। কেমন সমাধান দিলাম, দেখলেন? বলেই বাচ্চাটি বিজ্ঞের মতো হাসি দিলো।[৩৭]

ধর্ম নিয়ে এলার্জিতে আক্রান্ত মুক্তমনাদের কিছু গা বাঁচানো টাইপ রেডিমেইড যুক্তি থাকে। স্রষ্টা অস্তিত্বের স্বভাবজাত ও আনুসঙ্গিক প্রমাণ, তাঁর আনুগত্যের আবশ্যিকতা, পরকালের যৌক্তিকতা ইত্যাদির কথা বলা হলে যদি কেটে পড়ার কোনও উপায় না পায় তখন বলে, পৃথিবীতে এত এত ধর্ম আছে। প্রতিটি ধর্ম নিজ নিজ খোদার কথা বলে, সকলেই দাবি করে একমাত্র তাদের ধর্মই সঠিক ও মুক্তির একমাত্র পথ। এর মাঝে আপনার ধর্ম যে সঠিক, তার প্রমাণ কী?

তাদের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য সত্য খোঁজা নয়। তাদেরকে যে উত্তর দেওয়া হবে, তা শোনা বা সেটার সঠিকতা যাচাই করতেও তারা আগ্রহী নয়। কারণ তারা ইতোমধ্যেই সম্ভাব্য সব উত্তরকে ভুল ভেবে বসে আছে। এ প্রশ্নটা এমনভাবে তৈরি করা, যাতে করে সম্ভাব্য যে-কোনও উত্তরকে গ্রহণ না করার অজুহাত তৈরি করা যায় এবং তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলা যায়, বুঝলেন মশাই, সব ধর্মই আসলে মানুষের বানানো, আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, হচ্ছে। আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান এসব কিছু নেই, বুঝলেন তো?

পাঠক হয়তো এতক্ষণে আগের গল্পের সেই বাচ্চাটির দেওয়া সুরাহার সাথে নাস্তিকদের এই দাবির মিল খুঁজে পেয়েছেন। গল্পে বর্ণিত সমুদ্রপাড়ের শহরের মানুষ যদি উদ্ভূত সমস্যার সুরাহা চায়, তবে তাদেরকে মাতৃত্বের দাবিকারীদের দেওয়া প্রমাণ যাচাই করতে হবে অথবা অন্য কোনও পদ্ধতিতে প্রকৃত মা খুঁজে বের করতে হবে। সমস্যা বেশ জটিল, তাই এই শিশুর মা নেই, বাবা নেই—এই কথা বলে বসে থাকা কোনও সমাধান না। একইভাবে নাস্তিকরা এক্ষেত্রে যা বলে তা না কোনও প্রমাণ না কোনও সঠিক উত্তর। বরং প্রমাণহীন, যৌক্তিকতাহীন আরেকটি দাবি মাত্র।

ধর্মের সংখ্যাধিক্য এবং ধর্মগুলোর বক্তব্য পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া প্রতিটি ধর্মের ভুল হবার প্রমাণ না। যদিও এটা অবধারিত যে সবগুলো ধর্ম সঠিক হতে পারে না। একইভাবে অনেকগুলো ধর্ম থাকা, প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্য থাকা স্রষ্টার অনস্তিত্বেরও কোনও যৌক্তিক প্রমাণ হতে পারে না। তা না হলে তো একই সুর ধরে তাদের বলতে হবে, আরে বিগ ব্যাং ব্যাখ্যার সতেরোটি ভিন্ন ভিন্ন

---

৩৭. Adapted from: আসিফ আদনান, এত ধর্মের মধ্যে কোন ধর্মটি সঠিক, সত্যকথন; পৃ. ৬৪-৭২ (ঢাকা: সীরাত পাবলিকেশন, ২য় প্রকাশ ২০১৭)

প্রতিদ্বন্দ্বী মডেল রয়েছে,[৩৮] কোনটা মানব? সুতরাং বিগ ব্যাং বলে কিছু ঘটেনি। অথবা বিবর্তন ব্যাখ্যার পাঁচ-ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মডেল রয়েছে, তাই এগুলো সব ভুল। বিবর্তন বলে কিছু নেই। তারা কী এমনটা বলেবেন? না, ঘুণাক্ষরেও তারা এমনটি বলবেন না।[৩৯]

ড. আজাদও একই রেডিমেইড যুক্তির অবতারণা করেছেন, বলেছেন,

> "ধ্রুব বলতে বুঝবো তা যা অবিচল একক একমাত্র সত্য; কিন্তু বিশ্বাসের কোনও শেষ নেই, এবং বিশ্বাসগুলো পরস্পরবিরোধী। এগুলোর একটি ধ্রুব হ'তে পারে, সবগুলো ধ্রুব হ'তে পারে না; কিন্তু এগুলোর প্রতিটিই এতো ত্রুটিপূর্ণ যে এগুলোর একটিকেও ধ্রুব মনে করতে পারি না।" (পৃ. ২৪)

> "বহু ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে। একটি সরল প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিধাতা যদি থাকেন, তিনি যদি একলাই স্রষ্টা হন, তবে তিনি কেন এতো ধর্ম পাঠালেন? তিনি একটি ধর্ম পাঠালেই পারতেন, এবং আমরা পরম বিশ্বাসে সেটি পালন করতে পারতাম। তিনি তা করে নি কেন? তবে কি তিনি একলা নন? ওই অলৌকিক জগতেও কি রয়েছেন বহু প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁরা মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যগ্র?... যদি তিনি একলা, তাহলে এতো ধর্ম পাঠিয়ে কেন তিনি বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে?..." (পৃ. ৭৮)

উনার লেখার ধরণ থেকেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট। উনি শুরু করেছেন স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস আর ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ভুল থিওরি দিয়ে যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তারপর তাকিয়েছেন ধর্মের নানা মতের দিকে। যেহেতু আগেই সকল ধর্মই ভুল এই ধারণা মাথায় গেঁথে ছিল তাই সত্য আদৌ আছে কি না, খোঁজার নিরপেক্ষ চেষ্টা চালাননি বলেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে উনার অভিযোগ ও সমালোচনার প্রসঙ্গে সমাগত আলোচনায় এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ড. আজাদ বলেন :

> "কোনও পরম সত্তা যদি থাকতেন, এবং তিনি যদি পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন বোধ করতেন (-সম্ভবত বোধ করতেন না, তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছতর স্তব তাঁর ভালো লাগতো না), তাহলে একটি ধর্মই পাঠাতেন তিনি।" (পৃ. ৭৯)

৩৮. Hamza Andres Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Athesim; p. 80 (FB Publishing, 2016)

৩৯. ফিলোসফি অব সাইন্স এর ভাষায় এই সমস্যাকে বলা হয় *The Problem of Underdetermination of Theory by Evidence*

এখানে প্রথমেই যে ভুল ধারণায় অধ্যাপক জড়িয়ে গেছেন তা হলো—ধর্মকে কেবল তুচ্ছতর স্তরের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। ইসলাম এর সাথে একমত নয়; ইসলামে রয়েছে এক সুস্পষ্ট সংবিধান, এক জীবনব্যবস্থা। আসলে ইসলাম হলো একটি কমপ্লিট কোড অব লাইফ। আর উনার উত্থাপিত সরল প্রশ্নের সরল উত্তর হলো, আল্লাহ (ﷻ) কখনোই এত ধর্ম পাঠাননি। তিনি একটি ধর্মই পাঠিয়েছেন, আর তা হলো নিজের ইচ্ছাকে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম। কালের আবর্তে মানুষ সেই ধর্ম থেকে সরে গেছে। স্রষ্টা-প্রদত্ত বিধানকে নিজ স্বার্থ, অজ্ঞতা, দুনিয়ামুখীতা প্রভৃতি নানা কারণে অগ্রাহ্য করেছে, ভুলে গেছে, বিকৃত করেছে। তাদেরকে পথের দিশা দিতে আল্লাহ (ﷻ) যুগে যুগে বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। আগে তো পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠীদের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো ভালো ছিল না। তাই আল্লাহ (ﷻ) প্রত্যেক জনগোষ্ঠীতেই নবি প্রেরণ করেছেন যাদের মৌলিক আহ্বান ছিল একই, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাঁদের শারীআতে বিভিন্নতা ছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

> "আমি তোমার পূর্বে যত নবি পাঠিয়েছিলাম তাঁদের সবার কাছেই এই প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম যে, আমি ছাড়া কোনও (সত্য) উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমারই ইবাদাত করো।" [ভাবার্থ, সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫]

> "আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি..." [ভাবার্থ, সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬]

আল-কুরআন জানায় পূর্ববর্তী জনপদে প্রেরিত ধর্মগ্রন্থসমূহ সময়ের আবর্তে বিকৃত হয়ে গেছে। দেখা গেছে ধর্মগ্রন্থের সম্পূর্ণ বা একাংশ সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে, ধর্মগ্রন্থের মাঝে বাক্য সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়েছে, ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থের মূল বাণী থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।[৪০] ফলে কালের আবর্তে মানুষ মূল বাণী থেকে দূরে সরে গেছে।

---

৪০. সূরা মায়িদা, ৫:১৩, আ ল ইমরান, ৩:৭৮

বদলে যাও! বদলে দাও!

খ্রিষ্টান ধর্ম

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন খ্রিষ্টধর্মের কথা বিবেচনা করা যাক। বাইবেলের *নতুন নিয়ম* (New Tetament)-এর মূল গ্রিক পাণ্ডুলিপির ভিন্ন পাঠের (*variants*) সংখ্যাই ৫৭০-র ওপরে, সব ভাষার পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে কারও কারও মতে ভ্যারিয়েন্টের সংখ্যা চার লক্ষ বা তারও বেশি! সুপরিচিত বাইবেল বিশেষজ্ঞ বার্ট ডি. আরমেনের মতে, নতুন বাইবেলের মোট শব্দের সংখ্যার চেয়েও ভিন্নপাঠের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশি! [৪১]

তিনি আরও বলেন : এমন দুটি পাণ্ডুলিপিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যা হুবহু এক। তা ছাড়া এদের মাঝে বড় রকমের পার্থক্যের সংখ্যাও কম নয়।[৪২] বাইবেল যে বিকৃত হয়ে গেছে, তা জানার জন্য অন্য গবেষকের বক্তব্য কেউ মানতে না চাইলেও সমস্যা নেই। বাইবেলের *Revised Standard Version (RSV)* অথবা *New Revised Standard Version (NRSV)* খুলে ভূমিকাটা পড়লেই এই স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন, খ্রিষ্টান জগতে বহুল প্রচলিত, বাইবেলের *RSV* এর ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> "মূল লিপিগুলো যুগে যুগে হস্তান্তরের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মাঝে মাঝেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে মূল লিপিগুলোর কোনও সংস্করণই অর্থের সন্তোষজনক পুনরুদ্ধার দেখাতে পারেনি।"[৪৩]

দ্য ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া জানায় :

> "প্রাচীন যুগের কোনও পুস্তক লেখকের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঠিক সেরূপেই আমাদের নিকট আসেনি, সবগুলোই কোনও-না-কোনওভাবে বদলে গেছে। হাল আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের মানসিকতার তুলনায় আগের

---

৪১. Bart Ehrman, MISQUOTING JESUS:The Story Behind Who Changed the Bible and Why; p. 89-90 (HarperCollins Publishers, 1st Edition, 2005)

৪২. Bart Ehrman, Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew; p. 78 (Oxford: Oxford Univ.ersity Press, 2005)

৪৩. The Bible, Revised Standard Version; Preface, p. iv-v (2nd ed. 1971). Available Online: http://bible-researcher.com/rsvpreface.html

অবস্থা ছিল অনেক ভিন্ন। প্রিন্টিং আবিষ্কার হওয়ার আগে কোনও পাণ্ডুলিপির প্রসারে নানা জটিলতা, পাণ্ডুলিপির প্রতি অনুলিপিকারী, সংশোধনকারী ও ব্যাখ্যাকারীদের নগণ্য যত্ন; এসব নিয়ামকই একই পুস্তকের নানা পাণ্ডুলিপির মাঝে পাওয়া বিকৃতি ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট।"[৪৪]

এসকল বিকৃতির পাশাপাশি সাধু পল কর্তৃক ব্যাখ্যামূলক বিকৃতি যিশুর প্রচারিত ধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্মকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। যেমন, ইতিহাস ঘাঁটলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যিশুর একেবারে প্রথমদিকের অনুসারী যেমন, যিশুর ভাই জেমস, শিষ্য পিটার যিশু সম্পর্কে যে বিশ্বাস পোষণ করতেন, অনেকটা তেমনই বিশ্বাস পোষণ করতেন যিশুর অনুসারী ইবিওনাইটস (*Ebionites*) গোষ্ঠী। তারা কেউই যিশুকে খোদার অংশ বা তিনের এক মনে করা (*Trinity*) বা ইয়াহূদি আইন মানতে হবে না—এমন বিশ্বাস পোষণ করতেন না। তাঁরা যিশুকে খোদাপ্রেরিত একজন নবি ও মাসীহ হিসেবে বিবেচনা করতেন। [৪৫]

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইয়ে জানা যায়, অনেক গবেষকের মতে উপরি-উক্ত বিশ্বাসই ছিল যিশুর একেবারে প্রথমদিককার অনুসারীদের বিশ্বাস। [৪৬] তা ছাড়া এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, যিশু তাঁর মূল ভূমি মধ্যপ্রাচ্যে জীবদ্দশায় ও পরবর্তী প্রায় দু শ বছর নবি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছেন।[৪৭] সময়ের সাথে সাথে তাকে ঘিরে নানারকম বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। তাদের কেউ যিশুকে ঈশ্বর দাবি করে বসে (*Marcionites*), কেউ আবার স্ব স্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাবতে শুরু করে যিশুর মানুষ ও ঈশ্বর দুই গুণই আছে (*Subordinationist, Separationists, Proto-Trinitarians*)।

আজকের খ্রিষ্টানদের যে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস তা প্রথম তিন শতাব্দী পার হওয়ার

---

৪৪. Alfred Durand, *The New Testament* article in The Catholic Encyclopedia; Vol. 14. (New York: Robert Appleton Company, 1912. 4 Jun. 2018). Available on: http://www.newadvent.org/cathen/14530a.htm

৪৫. Bart D. Ehrman, Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (and Why We Don't Know About Them); p.191-193 (HarperCollins e-books, 2009)

৪৬. Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the NT; p. 48 (Oxford: Oxford University Press, 1993)

৪৭. James D.J. Dunn, The Evidence for Jesus; p. 96 (The Westminster Press, 1985); Albert Schweitzer, The Quest of the History Jesus; p. 28-29 (Translated by W. Montgomery; London, Adam and Charles Black, 2nd English edition 1911)

পরও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিশ্বাস ছিল না। এত রকমের বিশ্বাসের মাঝে কোনটি ঠিক, তা নির্ধারণ করার জন্য রোমান সম্রাট কনস্টানটিন ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নাইসিয়াতে (বর্তমানে তুরস্কের ইজনিক-এ) এক সম্মেলনের আয়োজন করেন (*Council of Nicaea*)। বিশুদ্ধ আকিদা রক্ষার জন্য কোনও মাথাব্যথা কনস্টানটিনের ছিল না, তিনি রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রটেস্টান্ট ঐতিহাসিক ফিলিপ স্কাফ স্বীকার করেছেন, সেই সম্মেলনে অংশ নেওয়া অধিকাংশ ধর্মবিদই প্রাক-ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৪৮]
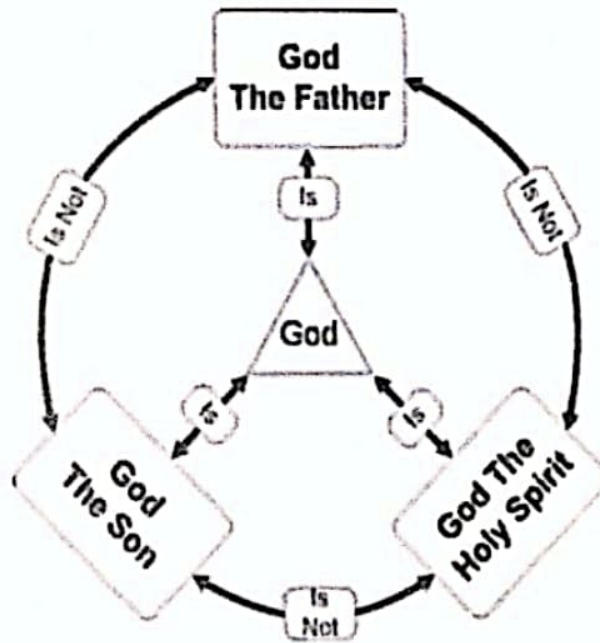
খ্রিষ্টানদের বর্তমান ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসের বহুল প্রচলিত চিত্র। সদাপ্রভু হলেন পিতা, তিনিই পুত্র, তিনিই পবিত্র আত্মা। কিন্তু পুত্র পিতা/পবিত্র আত্মার সমান নয়, পিতা পুত্র/পবিত্র আত্মার সমান নয় আবার পবিত্র আত্মা পিতা/পুত্রের সমান নয়! এই উদ্ভট বিশ্বাসের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা অর্থহীন। খ্রিষ্টানগুরুদের মতে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মানুষের অনুধাবনের অতীত। শুরুর দিকে পবিত্র আত্মাকে কিন্তু খোদার সমতুল্য ভাবা হতো না। ৩৮১ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব কনস্টানটিনোপল-এ পবিত্র আত্মাকেও খোদার সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়। ছবিসূত্র : ইন্টারনেট

৪৮. Philip Schaff, The Christian Church from the 1st to the 20th Century; Vol. III, chapter 9, section 120 (Ebook Edition, Delmarva Publications Inc., March 24, 2015)

তাদের একাংশ বিশ্বাস করতেন যিশু খোদার সমান নয়, উপাদানেও এক নয় বরং খোদা কর্তৃক সৃষ্ট, তবে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন আরিয়াস। অন্য দলে ছিলেন এথেনাসিয়াস এর নেতৃত্বে প্রাক-ত্রিত্ববাদপন্থি গোষ্ঠী। আর বাদবাকি অধিকাংশই ছিলেন মধ্যম অবস্থানে। নাইসিয়ান সম্মেলন চলাকালে, মত এক পর্যায়ে প্রাক-ত্রিত্ববাদপন্থিদের দিকে ভিড়ে যায়। রাজা কনস্টানটিন নিজেও এথেনাসিয়াসের অবস্থানের পক্ষে মত দেন। তাই রাজার সাথে ঝামেলা না গিয়ে মধ্যম অবস্থানে থাকা ধর্মবিদদের অধিকাংশই এই মতেই ঝুঁকে যান।[৪৯]

সম্মেলনের শেষে আকিদা বাক্য তৈরি করার পরও প্রায় আঠারো জন ধর্মগুরু তার বিরোধিতা করেন। সম্রাট কনস্টানটিন তাদের নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দেন। তারপরও আরিয়াস ও আরও দুজন ধর্মগুরু সাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন। তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাদের কিতাবাদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[৫০]

নাইসিয়ার সম্মেলনের পর সকল খ্রিষ্টানদের প্রাক-ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসে বাধ্য করা হয়। যারা বিরোধিতা করে তাদের নির্বাসনে পাঠানো হয়, হত্যা করা হয়। সাধু জিরোমের বিবরণে জানা যায়, প্রাণের ভয়ে যেসব ধর্মগুরু নাইসিন ক্রিডে সাক্ষর করেছিলেন তাদের মাঝে নিকোমেডিয়া শহরের ইউসেবিয়াস, ক্যালসেডন শহরের ম্যারিস ও নাইসিয়ার থিওগনেস প্রবল অনুশোচনায় ভুগে পরে এক চিঠিতে কনস্টানটিনকে বলেছিলেন,

> "হে রাজপুত্র! আমরা এক অধার্মিকের কাজ করেছি। আপনার ভয়ে (যিশুকে স্রষ্টা বানানোর) এই ব্লাসফেমি মেনে নিয়েছি।"[৫১]

অথচ মজার ব্যাপার হলো প্রাক-ত্রিত্ববাদকে চাপিয়ে দেওয়া সম্রাট কনস্টানটিন মৃত্যুর আগে নিজেই ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস থেকে সরে আসেন। নিকোমেডিয়া শহরের ইউসেবিয়াস তাকে আরিয়ানদের বিশ্বাসে তরিকাবন্দী করেন![৫২]

---

৪৯. Encyclopedia Britannica, vol. 16, p. 410-411 (14th ed.)

৫০. Richard E. Rubenstein, When Jesus Became God: The Epic Fight over Christ's Divinity in the Last Days of Rome; p. 83 (Harcourt Brace & Company, 1st Edition 1999); Abu Zakariya, Jesus: Man, Messenger, Messiah; p. 17 (London: iERA, 1st Edition 2017)

৫১. Ian Wilson, Jesus The Evidence; p. 168 (New York: Harper and Row, 1984)

৫২. Hans A. Pohlsander, The Emperor Constantine; p. 83 (Routledge, 2nd Edition, 2004)

অন্যতম দক্ষ বাইবেলবিদ ড. জোহানস ওয়েস *Paul and Jesus* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন :

"তাই বলা যায়, যিশুর শিক্ষার সাথে তুলনা করলে, প্রথমদিককার চার্চগুলো এবং সাধু পল যিশু সম্পর্কে যে বিশ্বাস পোষণ করতো—তা ছিল নতুন কিছু; মূলত এটি ছিল এক নতুন ধর্ম।"[৫৩]

বর্তমানে যে বাইবেল বিদ্যমান, তাতে সূক্ষ্মদৃষ্টির অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, সেখানে স্রষ্টার একত্বের কথা বলা হয়েছে। বাইবেল জানায় :

"একজন ধর্ম-শিক্ষক সেখানে এসে তাঁদের তর্কাতর্কি শুনলেন। যিশু যে তাঁদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তা লক্ষ করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মোশির দেওয়া আদেশের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী আদেশ কোনটা?" উত্তরে যিশু বললেন, "সবচেয়ে দরকারী আদেশ হল, '**ইস্রায়েলীয়েরা, শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর এক**। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।' তার পরের দরকারী আদেশ হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।' এই দুটা আদেশের চেয়ে বড় আদেশ আর কিছুই নেই।" তখন সেই ধর্ম-শিক্ষক বললেন, "গুরু, বেশ ভালো কথা। আপনি সত্যি কথাই বলেছেন যে, ঈশ্বর এক এবং তিনি ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই। আর সমস্ত অন্তর, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালোবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা পশু ও অন্য সব উৎসর্গের চেয়ে অনেক বেশি দরকারী।" যিশু যখন দেখলেন সেই ধর্ম-শিক্ষকটি বেশ বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য থেকে আপনি বেশি দূরে নন।"..." [মার্ক ১২:২৮-৩৪]

বাইবেলে অনেক জায়গায় একজন নবির আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, যা বলে গেছেন স্বয়ং যিশু! খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সত্য অস্বীকার করতে চান। কিন্তু সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যিশু স্বয়ং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমণের বার্তা জানিয়ে গেছেন।[৫৪]

৫৩. Johannes Weiss, Paul and Jesus; p. 130 (Translated By Rev. H. J. Chaytor; London: Herper & Brothers, 1909)

৫৪. Abu Zakariya, Jesus: Man, Messenger, Messiah; p. 187-237

ইয়াহুদি ধর্ম

বাইবেলের নতুন নিয়মের সাথে তুলনা করলে হিব্রু বাইবেলের (পুরাতন নিয়ম) অবস্থাও নড়বড়ে। *তানাখ* (תנ"ך) নামে পরিচিত হিব্রু বাইবেল তিনভাগে বিভক্ত—তোরাহ বা তাওরাত (תּוֹרָה), নাভিম (נְבִיאִים), কেতুভিম (כְּתוּבִים)। ধারণা করা হয় তোরাহ-এর পাঁচটি বই (পয়দায়েশ, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়, শুমারী, দ্বিতীয় বিবরণ) মূসা ( )-এর রচনা। কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে নিশ্চিত কিছু পাওয়া যায় না। বাইবেল পণ্ডিত রিচার্ড ফ্রিডম্যানের মতে এটি একটি নয় বরং চারটি ভিন্ন উৎস থেকে আসা বলে প্রতীয়মান হয়।[৫৫] তা ছাড়া বর্তমানে হিব্রু বাইবেলের যে রূপ পাওয়া যায় তার প্রথম দেখা মেলে যিশুর মৃত্যুরও ৬০ বছর পর! [৫৬] তাই অজ্ঞাত রচয়িতার বয়ান যা কিনা ঘটনার বহু বছর পরে সংকলিত, যাতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান; তার ওপর কীভাবে ভরসা করা যায়?

তবে ইয়াহুদিরা মনে করেন তাদের ধর্মের অধুনা রূপটি মূলত তালমুদ-এর ওপর নির্ভরশীল। ধারণা করা হয় তোরাহ এর দুটি রূপ ছিল, একটি লেখ্যরূপ যা হিব্রু বাইবেলের সংকলিত; অপরটি কথ্য বা মৌখিক রূপ যা তালমুদ নামে পরিচিত। এটি মূলত তোরাহ-র তাফসীর রূপে গণ্য আর এটি রাব্বাইনিক জুডাইজম-এর ভিত্তি। ইয়াহুদি পণ্ডিত জ্যাকব মনে করেন, ইয়াহুদি পণ্ডিতরা মূলত পবিত্র ও ঐশ্বরিক কর্ম করেন; উর্ধ্বাকাশ থেকে তারা বিশেষ কৃপালাভ করেন। এই ভিত্তির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে ধর্মগুরুরা, এমনকি নিজেকে খোদার চেয়েও বড় বানিয়ে নিয়েছে। যেমন ব্যাবিলনি ও তালমুদের এক জায়গায় (*Berakhot 7a*)পাওয়া যায়, স্রষ্টার ক্ষমা যে তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করেছে তা মূলত একজন রাব্বিই তাঁকে শিখিয়েছে, তাকে আশীর্বাদ করার মাধ্যমে!! আরেক জায়গায় (*'Abodah Zarah 3b*) বলা আছে খোদা নাকি দিনে ৩ ঘণ্টা তোরাহ অধ্যয়ন করেন!! অপর এক জায়গায় পাওয়া যায় (*Baba Mezi'a 59b*), এক রাব্বি খোদার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়, আর খোদা শেষমেষ হার স্বীকার করেন!!

এ তো গেল তালমুদের কথা। খোদ তোরাহতেই যে পরিমাণ অসম্ভব, আজগুবি, অশ্লীল কথাবার্তা রয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে তো আরেকটা বই লিখতে হবে। নবিদের নামের এমন অশ্লীল-নোংরা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা কল্পনারও বাইরে।

---

৫৫. Richard Elliot Friedman, Who Wrote the Bible?; p. 10 (Simon and Schuster, 2019)

৫৬. L. David Moore, The Christian Conspiracy- How the Teachings of Christ Have Been Altered By Christians; p. 33-34 (Atlanta: Pendulum Plus Press, 1994)

নবিদের নামে অযাচার-ব্যভিচার-মূর্তিপূজা-অন্যায় হত্যার নানা গল্প পাওয়া যায় তোরাহ জুড়ে। আত্মগরিমা ইয়াহূদিদের এতটাই অন্ধ করে দিয়েছিল তারা সত্য গ্রহণ তো দূরে থাক, নবিদের নামে নোংরা গল্প ফেঁদে নিজেদের কুকর্মের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিল। তার প্রভাবই চোখে পরে তোরাহ'র পাতাজুড়ে। ইয়াহূদিদের ধর্ম মূলত স্বীয় জাত, রক্তকে খোদার স্থানে বসিয়ে উপাসনা করার অপর নাম। তাই বারবার সত্য তাদের সামনে আসার পরও তারা সেটাকে ছুড়ে ফেলেছে।

এত বিকৃতির পরও ইয়াহূদি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার একত্বের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। এক প্রশ্নের উত্তরে রাব্বি চাইম মিনজকে বলতে শোনা যায়, আরবরা (মুসলিমরা) ও ইয়াহূদিরা একই খোদার উপাসনা করে।[৫৭] পাশাপাশি তোরাহতে এমন এক নবি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায় যিনি আর কেউ নন, বরং স্রষ্টার সর্বশেষ বার্তাবাহক মুহাম্মাদ (ﷺ)। বলা হয়েছে তিনি বানী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন এবং মূসা (ﷺ)-এর সাথে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর আনুগত্য না করলে বানী ইসরাঈলদের পাকড়াও করা হবে।[৫৮] তো বানী ইসরাঈল অর্থাৎ ইসহাকের বংশধরদের ভাই কে? তাওরাত বিভিন্ন পংক্তি অনুযায়ী ইসমাঈলের বংশধররা হলেন তাদের ভাই।[৫৯] আর এটা কারও অজানা নয় ইসমাঈলের বংশধরদের মাঝে একমাত্র নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)।

ইয়াহূদিদের কেউ হয়তো এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলতে চাইবে, বলবে : উহু, প্রতিশ্রুত এই নবি হলেন ইউশা ইবন নুন। আবার কেউ মাসিহ (দাজ্জাল) এর কথাও বলে বসতে পারে। কিন্তু খোদ তাওরাতই সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে বলেছে, বানী ইসরাঈলে মূসার মতো আর নবি নেই![৬০] তা ছাড়া যিশাইয়তে বিবৃত সেই নবির বর্ণনা পরে বোঝা যায় তিনি আর কেউ নন, তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)![৬১]

তাই ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্মের আগেই আরবে

৫৭. Jews and Muslims - What do They Have in Common? Youtube, Available at: https://youtu.be/URvtE-zPTiI

৫৮. ২য় বিবরণ/Deuteronomy/Devarim ১৮: ১৮-১৯

'আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার (মূসা আ.) মতো একজন নবি দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে। সেই নবি আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।'

৫৯. আদিপুস্তক/Genesis/Bereishit ২৫: ১৭-১৮, ১৬: ১১-১২

৬০. ২য় বিবরণ/Deuteronomy/Devarim ৩৪: ১০

৬১. যিশাইয়/Isaiah/Yeshayahu ৪২: ১-১৭, বিস্তারিত দেখুন : মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, অন্ধকার থেকে আলোতে; পৃ. ১৭৪-১৮১ (ঢাকা : সমর্পণ প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

ইয়াহূদিরা ভীড় জমাতে শুরু করে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের সন্ধানে। এক ইয়াহূদি আলেম সিরিয়া থেকে ইয়াসরিবে (মদীনা) আগমন করে সেখানকার ইয়াহূদিদের বলেছিলেন, তোমাদের আগে কেউ যেন তাঁর দেখা না পায়।[৬২] পণ্ডিত চাইমও মিন মিন করে স্বীকার করেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন নবি ছিলেন। রাব্বি বেন এব্রাহামসন, এলান ম্যালার প্রমুখ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবি বলে মনে করেন। তবে অধিকংশ ইয়াহূদি তা মানতে চান না।

হিন্দু ধর্ম

এবার হিন্দু ধর্মের দিকে তাকানো যাক। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে হিন্দু ধর্ম যতটা না ধর্ম, তারচেয়েও বেশি কালচার। আনুমানিক তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত বেদ অনেক হিন্দুর কাছে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। বেদের শ্লোকগুলো কার বিরচন, তা নিশ্চিত করে বলার কোনও উপায় নেই। এগুলো নানা মুনি-ঋষির রচনা মনে করা হয়। তা ছাড়া সুপরিচিত হিন্দু গবেষক ও দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের মতে, কালের আবর্তে বেদের বৃহত্তর অংশই হারিয়ে গেছে।[৬৩]

বেদের সংকলন করেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তবে আদিতে আজকের মতো চারটি বেদ ছিল না বলে হিন্দু গবেষকদের ধারণা। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেন :

> "কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বোঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল।"[৬৪]

সাধারণ হিন্দুদের অনেকেই বেদকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ মনে করেন। কিন্তু হিন্দু গবেষকদের মতে তা সঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে :

> "বেদ ভগবান প্রেরিত নয়। বেদ মানুষই লিখেছে" [৪০]

যদিও বেদকে অনেকেই ধর্মগ্রন্থ মনে করেন, কিন্তু বেদের সাথে সাধারণ হিন্দুর সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তাদের কেউ রামায়ণ, মহাভারতকে; কেউ আবার

---

৬২. Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet; p. 73 (London: Phoenix, 2001)

৬৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড ৮, পৃ. ৪১৭ (উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী : প্রবন্ধ - দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম; পৃ. ৭১০ (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৪০৫

উপনিষদ, গীতাকে ধর্মচর্চার অনুসঙ্গ করে নেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু পণ্ডিতদের মতে এগুলোর কোনওটিই স্রষ্টা প্রেরিত নয়। যেমন, রামায়ণ সম্পর্কে ড. রমনীমোহন দেবনাথ বলেন :

> "মূল রামায়ণ একটি ক্ষত্রিয় কাহিনী ছিল। শত শত বছর ধরে ব্রাহ্মণরা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এতে নানা কল্প কাহিনী সংযোজন করে/ঢুকিয়ে দেয়। এর জন্য তারা নানা অলৌকিক কাহিনী ও উপাখ্যান তৈরি করে। এসবের মাধ্যমে শূদ্রদের হেয় করা হয়, নারীকে অবমূল্যায়িত করা হয়। পাশাপাশি করা হয় ব্রাহ্মণদের মহিমা কীর্তন। সৃষ্টি করা হয় নানা সম্প্রদায় যথা : শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। প্রচার করা হয় এটিই হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। রচনা করা হয় আরও কুড়িটি ধর্মশাস্ত্র, আঠারোটি পুরাণ ও অসংখ্য উপপুরাণ। এভাবেই পৌরানিক আমলে তৈরি করা হয় চারবর্ণ ও চার আশ্রম ভিত্তিক একটি ধর্ম যা আজকের দিনে সনাতন ধর্ম/হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। এর কেন্দ্রে স্থাপন করা হয় পরিবর্তিত রামায়ণ ও পরিবর্তিত মহাভারত। ক্ষত্রিয় কাহিনীকে পরিণত করা হয় ধর্মে।"[৬৫]

এদিকে অনেক শিক্ষিত হিন্দু আবার গীতাকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মনে করেন। তাদের ধারণা গীতা হলো স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, গীতা স্বয়ম্ভু, সর্বতসারী ও স্বতঃপূর্ণ। তবে হিন্দু পণ্ডিতগণ তেমনটা ভাবেন না। গীতায় অনেক পরস্পর-বিরোধী মতবাদ সন্নিবেশিত হওয়া এর একটি কারণ। [৬৬] তাদের মতে গীতার রচয়িতা কে, তার কোনও হদিস নেই।[৬৭] তারা মনে করেন খ্রিষ্টাব্দের প্রথম চার শ বছরে এটি রচিত ও পল্লবিত। হিন্দু গবেষকদের বক্তব্যে গীতার মানবরচিত হওয়ার দিকটি ফুটে ওঠে। ড. রমনীমোহন দেবনাথ বলেন :

> "ড. রাধাকৃষ্ণণের মতে, 'গীতার উপদেশ কোনও বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি বা চিন্তাশীল গোষ্ঠীর ধারণাপ্রসূত অধিবিধ্যার পদ্ধতির আকারে প্রচারিত নয়। মানবসমাজে ধর্মজীবন থেকে যে পরম্পরার উৎপত্তি হয়েছে, তাকেই এতে রূপ দেওয়া হয়েছে।' এর অর্থ হচ্ছে গীতার উপদেশ কোনও ব্যক্তির নয়। এসব উপদেশ বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত হিন্দু ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকেই শ্রীকৃষ্ণ নামীয় একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। প্রচার করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ

---

৬৫. ড. রমনীমোহন দেবনাথ, সিন্ধু থেকে হিন্দু; পৃ. ৩৩ (ঢাকা : রিডার্স ওয়েজ, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫)

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৬৭. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা; পৃ. ০৬ (অনুবাদ : শুভেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ)

স্বয়ং স্রষ্টা অথচ দেখা যাচ্ছে তিনি একজন রক্তমাংসের মানুষ।"[৬৮]

জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় গীতা সম্পর্কে বলেন :

"গীতার শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র মাত্র, ঈশ্বরের অবতার অথবা অন্য কোনও ঐতিহাসিক মানুষ নন। জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতার ফলে সমকালীন আর্যসভ্যতা যে গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, যে ঐতিহাসিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে একদিকে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, ম্লেচ্ছ তথা ভূমিপুত্র অনার্যদের বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্ম এবং নাস্তিকতাবাদের কঠোর সমালোচনা করে, আর অন্যদিকে মনুস্মৃতির সংগে বৌদ্ধধর্ম ও ভগবত ধর্মের কিছু ইতিবাচক বক্তব্যকে সমন্বিত করে ভগবদ্গীতা রচিত হয়েছিল; আর তা আরোপিত হয়েছিল শ্রীভগবান চরিত্রের মুখে। গীতাকারদের আশা ছিল যে এভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের টোটাল আইডিওলজিকে, বিশেষত চাতুর্বর্ণ্য এবং শূদ্র ও নারীর হীনস্থান আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব এবং আর্থিক শোষণকে বিস্তারিত এবং চিরায়িত করা সম্ভব হবে।"[৬৯]

সুতরাং হিন্দু পণ্ডিতদের মত থেকে বোঝা যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম মূলত একটি ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতামূলক ধর্মমত। এরপরও যদি কেউ হিন্দুধর্মকে খোদাপ্রেরিত মনে করেন, তবে তাদেরকে আমরা আন্তরিক পরামর্শস্বরূপ বলতে পারি—আপনাদের গ্রন্থে এখনও এমন নিদর্শন বিদ্যমান, যা ইসলামের সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। এ নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম গবেষকগণ বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেছেন।

হিন্দু গবেষক ধর্মাচার্য বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়-এর বহুল আলোচিত গ্রন্থ—*বেদ ও পুরাণে হযরত মুহাম্মাদ* এবং *কল্কি অবতার এবং মুহাম্মাদ*, ডা. এম.এ. শ্রীবাস্তব রচিত *ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ* গ্রন্থগুলোতে দেখানো হয়েছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে থাকা বিভিন্ন শ্লোক কীভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের আগাম বার্তা জানাচ্ছে ও তাঁকে অনুসরণ করতে বলছে।[৭০] তা ছাড়াও স্বামী লক্ষ্মীশংকরাচার্য তাঁর *ইসলাম সন্ত্রাস*

---

৬৮. ড. রমনীমোহন দেবনাথ, সিন্ধু থেকে হিন্দু; পৃ. ৪৩-৪৪

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৭০. ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ ও পুরাণে হযরত মুহাম্মাদ (বঙ্গানুবাদ - অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, কলকাতা: বাংলা ইসলামী প্রকাশনা ট্রাস্ট, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৬); আরও দেখুন: ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মুহাম্মাদ (কলকাতা: বাংলা ইসলামী প্রকাশনা ট্রাস্ট, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৬); ডা. এম. এ. শ্রীবাস্তব, ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (বঙ্গানুবাদ - রবিউল ইসলাম, কলকাতা: বাংলা ইসলামী প্রকাশনা ট্রাস্ট)

না আদর্শ গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের শ্লোকগুলো আল্লাহর তাওহীদ, শিরক পরিহার, তাঁর উপাসনা করার কথা বলেছে; পাশাপাশি দুনিয়ার ভোগবিলাসে, পার্থিব বস্তু ও ধনসামগ্রী পাওয়ার ইচ্ছায় যার বিবেক নিঃশেষ হয়ে গেছে তারাই যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজার করে একথাও অকপটে জানিয়ে দিয়েছে।[৭১]

এসকল প্রমাণভিত্তিক আলোচনা এই দাবির জোরালো সমর্থন হিসেবে কাজ করে যে, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক যুগেই নবি ও প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলেন, যা কালান্তরে বিকৃত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছে।

প্রেসক্রিপশান সমাচার

ড. আজাদ প্রশ্ন করেছেন :

> "কেন তিনি একদলকে গরু খেতে নিষেধ করেন, আরেক দলকে খেতে বলেন; কেন তিনি একদলের জন্য নিষিদ্ধ করেন মদ্য, এবং সিদ্ধ করেন আরেক দলের জন্য?" (পৃ. ৭৯)

তিনি (ﷺ) আদৌ কাউকে গরু খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা অথবা মদ খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন কি না, সে উত্তর জানার আগে একটি দৃশ্যপট অবতারণা করা যাক। ধরুন, পাঁচজন রোগী এক ডাক্তারের চেম্বারে আসলেন। তাদের প্রত্যেকেই সর্দি-কাশির সমস্যা। প্রেসক্রিপশানে দেখা গেল ডাক্তার প্রথম জনকে *পিরিটন*® দিয়েছেন, দ্বিতীয় জনকে *ডেসলোর*® দিয়েছেন, তৃতীয় জনকে স্টেরয়েড ইনহেলার ধরিয়ে দিয়েছেন, চতুর্থ জনকে নাকের স্টেরয়েড স্প্রে কিনতে বলেছেন, পঞ্চম জনকে বলেছেন অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ইনজেকশান নিতে!

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পাঁচ জন তাদের সমস্যা শেয়ার করে একে অন্যকে প্রেসক্রিপশান দেখাল। এবং অবাক ও বিরক্ত হলো এই দেখে ডাক্তার প্রায় একই সমস্যার জন্য একেক জনকে একেক ওষুধ দিয়েছেন। ওষুধ কারোটার দাম পাঁচ টাকা, আবার কারোটার দাম দু শ টাকা! দামি ওষুধ যার ঘাড়ে পড়েছে সে তো গালিই দিয়ে বসল একটা, শালা কসাই কোথাকার! সে অন্যদের বলল চলেন, আজ দেখে নিব ওরে! বলেই দুম করে দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকে পড়ল।

---

৭১. স্বামী লক্ষীশংকরাচার্য, ইসলাম সন্ত্রাস না আদর্শ; পৃ. ৭৪-৮৫ (বঙ্গানুবাদ - আবুল হাসান, কলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনা ট্রাস্ট, ১ম প্রকাশ অগাস্ট ২০১৪)

তাদের রাগের মুখে ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, প্রথম জনের শ্রেফ ঠান্ডা লেগেছে তাই সেটা কম দামি ওযুধেই সারবে। দ্বিতীয় জনকেও ওই ওযুধ দেওয়া যেত কিন্তু এতে তার সকালে অফিসের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। কারণ ওই ওযুধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘুমঘুম ভাব আনে। তাই একই ধরনের কিন্তু ঘুম আনে না—এমন ওযুধ দেওয়া হয়েছে। আর তৃতীয় জনের সমস্যাটা একটু বেশি, এক ধরনের হাঁপানি, ডাক্তারি ভাষায় *কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা*। তাই দামি ওযুধ স্টেরয়েড ইনহেলার দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ জনের সমস্যাটার নাম *পোস্টন্যাজাল ড্রিপ* যা *এলার্জিক রাইনাইটিস* থেকে হয়েছে, তাই তাকে শুধু নাকের স্প্রে দেওয়া হয়েছে। আর শেষজন ছিল যে শিশুটি তার সমস্যাটার নাম *ব্রংকিওলাইটিস*। এটা অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ইনজেকশান ছাড়া ভালো হবে না। বুঝেছেন?

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, ডাক্তারের জ্ঞান আর রোগীর অবস্থা। প্রায় একই উপসর্গ নিয়ে আসার পরও ডাক্তার তার জ্ঞান দিয়ে তাদের অবস্থার ভিন্নতা বুঝেছেন এবং সেই অনুযায়ী বিধান দিয়েছেন। যদিও রোগীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়নি। বরং তাদের কাছে স্বেচ্ছাচারিতা মনে হয়েছে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মহান আল্লাহ (ﷻ) প্রত্যেক জনপদেই বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি অভিন্ন ছিল। কিন্তু স্থান-কাল ভেদে আহকাম তথা বিধানের ভিন্নতা ছিল। আবার কখনও কোনও বস্তু এক সময় হারাম ছিল, তা অন্য সময়ে হালাল করা হয়েছে। এর একটি কারণ হলো, আল্লাহ (ﷻ) স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী করে তাঁর নিদর্শন ও শারীআতের প্রেসক্রিপশান প্রেরণ করেছেন। তাই বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে থাকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত শারীআতে ভিন্নতা রাখা হয়েছে যদিও মৌলিক বিশ্বাস ছিল একই। সবশেষে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বারা সেই শারীআতকে সার্বজনীনতা প্রদান করা হয়েছে।

অপর কারণ হলো, মানুষকে পরীক্ষা করা। এটা দেখা, কে আল্লাহর (ﷻ) প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত; আর কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ, শারীআত প্রিয় হওয়া ও পৈত্রিক ধর্ম হিসেবে আবেগ জড়িত থাকার কারণে আল্লাহর (ﷻ) নির্দেশ অমান্য করে আর অন্ধভাবে বাপদাদার অনুসরণ করতে থাকে; কে জ্ঞানের বড়াই করে, স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়ে ওহির নিকট আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকে। [৭২]

এখন গোমাংস খাওয়ার ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা যাক। আদৌ কি গোমাংস

৭২. তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদা ৫:৪৮ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য

খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা স্রষ্টা প্রেরিত? সঠিক উত্তর, না! আগেই আলোচনা করা হয়েছে হিন্দুপণ্ডিতদের মতে বেদ বা হিন্দুদের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থই মানবরচিত। এগুলো একটাও খোদাপ্রেরিত নয়। তাই এখানকার বিধান খোদাপ্রেরিত বলে নিশ্চিত দাবি করা যায় না। তা ছাড়া হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ও পণ্ডিতদের বক্তব্য পড়লে দেখা যায়, একসময় গোমাংস হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না, বরং বেশ প্রিয়ই ছিল বলা যায়। গোমাংস না খেলে এককালে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বই থাকত না! তাদের মাঝে খাদ্য হিসেবে গো, মহিষ ও অশ্বের মাংস জনপ্রিয় ছিল।[৭৩]

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, রাম গোমাংস ভক্ষণ করতেন। তা ছাড়া মহাভারত, ঋগ্‌বেদ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র (যেমন বশিষ্ঠস্মৃতি, মনুস্মৃতি), অর্থশাস্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি-সহ আরও গ্রন্থে হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৪] পশ্চিমা বিশ্বকে হিন্দু-দর্শনের সাথে পরিচয়দানকারী খ্যাতনামা হিন্দুপণ্ডিত ও দার্শনিক, ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :

> "এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করানোর প্রথা ছিল।"[৭৫]

ভারতের জাতির জনক হিসেবে খ্যাত অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী *The Essence of Hinduism* গ্রন্থে গোমাংস খাওয়া সম্পর্কে বলেন :

> "আমি জানি পণ্ডিতদের একাংশ আমাদের বলেছেন বেদে গো-উৎসর্গ করার কথা উল্লেখ আছে। আমার মনে পড়ে, হাইস্কুলে থাকতে আমাদের সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ে এমন পড়েছি যে, পূর্বে ব্রাহ্মণরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন।"[৭৬]

তা ছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক

---

৭৩. ড. আর এম দেবনাথ, সিন্ধু থেকে হিন্দু; পৃ. ১৭, ১৯

৭৪. অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিছক গোরুর রচনা, গো-মাতা এবং হিন্দুগণের রসনা বিড়ম্বনা; নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, ৪ জানুয়ারি ২০১৪। [http://archive.is/0Y0iA]

৭৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড ৫, পৃ. ৬৩ (উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)

৭৬. M. K. Gandhi, The Essence of Hinduism; p. 29 (Navajivan Publishing House, Second Edition, May 1996)

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা তাঁর *The Myth of the Holy Cow* গ্রন্থে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহ গবেষণা করে দেখিয়েছেন প্রাচীন সময় থেকেই হিন্দুরা গোমাংশ ভক্ষণ করতেন, এটা মুসলমানদের আবিষ্কার নয়।[৭৭] যদিও এই বই বের করার পর তিনি কট্টরপন্থীদের তোপের মুখে পড়েন। তো কেন গোমাংশ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হলো? স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :

> "ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভালো ভালো ষাঁড়গুলি হত্যা করিলে সমগ্র জাতি বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই গোহত্যা-প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল।" [৭৩]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, গরু খাওয়ার নিষেধ স্রষ্টা প্রেরিত নয়। তা হলে ড. আজাদের এহেন দাবির কারণ কী হতে পারে? অজ্ঞতা না স্রেফ তর্ক? নাকি অজ্ঞতাপ্রসূত তর্ক?

ঋণ

> "প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম নয়; এগুলোর একটির সাথে আরেকটির নানা মিল রয়েছে। অনেক সময় এক বা একাধিক ধর্ম থেকে জন্মেছে আরও এক বা একাধিক ধর্ম। তবে প্রতিটি ধর্মই নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন ব'লে দাবি করে, যেনো এইমাত্র বিধাতা সেটি তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন। ভারতীয় ধর্মগুলোর মধ্যে মিল অত্যন্ত স্পষ্ট; একটি মূল ধর্ম থেকেই ভারতে দেখা দিয়েছে পরবর্তী ধর্মগুলো। মধ্যপ্রাচ্যেও তাই রয়েছে; কানান বা প্যালেস্টাইন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলোর মাতৃভূমি। প্যালেস্টাইনের মানুষ নানা কিংবদন্তি থেকে সৃষ্টি করেছিলো ইয়াহূদিধর্ম; তার থেকে উদ্ভূত হয় খ্রিষ্টধর্ম; এবং ইহুদি-খ্রিষ্ট ও মক্কায় প্রচলিত পৌত্তলিক আরবদের ধর্ম থেকে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলামের ধর্মগ্রন্থে বিধাতার প্রেরিত ধর্মরূপে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম স্বীকৃত; এবং এ গ্রন্থে রয়েছে বহু উপাখ্যান, যেগুলোর উৎস পুরোনো ও নতুন বাইবেল।" (পৃ. ৯৬)

ড. আজাদ বলতে চেয়েছেন যেহেতু আল-কুরআনে থাকা বিভিন্ন উপাখ্যানের সাথে বাইবেলের বর্ণিত উপাখ্যানের দৃশ্যত মিল পাওয়া যায়, এবং বিভিন্ন ইসলামি আচারের সাথে ইসলামপূর্ব পৌত্তলিক আরবের বিভিন্ন আচারের সাদৃশ্য বিদ্যমান; তাই ইসলাম মূলত এসকল ধর্ম থেকে ধারদেনা করে তৈরি করা হয়েছে! ইতিহাস

৭৭. D. N. Jha, The Myth of the Holy Cow (New Delhi: Navayana Publishing, 2009)

বিষয়ে কী শোচনীয় জ্ঞান! আসলে ড. আজাদ পশ্চিমের মোহে আক্রান্ত হয়ে তাদের দেওয়া কোনও তথ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করেননি।

মূলত আরব পৌত্তলিকদের শতভাগ কাজই ভুল ছিল, তা ঠিক নয়। তারা ছিল ইবরাহীম (ﷺ)-এর পুত্র ইসমাঈল (ﷺ)-এর বংশধর। নিজেদের গর্বভরে ইবরাহীমের অনুসারী বলে পরিচয়ও দিত তারা। কিন্তু কালক্রমে তারা ইবরাহীমের দ্বীন থেকে সরে গিয়ে নতুন এক ধর্ম তৈরি করে বসে; যার মাঝে ইবরাহীন প্রচারিত দ্বীনের কিয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। ইসলাম মূলত এসকল কাজ থেকে দূষণ দূর করে ইবরাহীমি চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে ইয়াহূদি-খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে ইসলাম ধার করা—সর্বপ্রথম এমন দাবি জানান পশ্চিমা গবেষক অ্যাব্রাহাম জিইগার। পরবর্তী কালে আল-কুরআনে বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে—এ দাবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন খ্রিষ্টান গবেষক উইলিয়াম মুর। তারপর আরও কয়েকজন প্রাচ্যবিদ এই দাবির সমর্থনে বইপত্র লিখতে শুরু করেন।[৭৮] তাদের এই প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রচার হয়। নাস্তিকেরাও তা লুফে নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস ও উভয় ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করলেই এই অভিযোগগুলোর ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। প্রথমত, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) ছিলেন উম্মী, যার অর্থ নিরক্ষর।[৭৯] অর্থাৎ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি পাননি, তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না। আল-কুরআনেও বারবার এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।[৮০] শুধু তিনি নন, মক্কার তৎকালীন অধিকাংশ মানুষই ছিলেন নিরক্ষর। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিজের জবানেই জানা যায় :

"আমরা উম্মী জাতি। লিখতে জানি না, হিসেব-নিকেশও করতে জানি না।..."[৮১]

---

৭৮. Muhammad Mohar Ali, The Qur'an and the Orientalists: An Examination of their Main Theories and Assumptions; p. 26 (Ipswich: Jamiyat Ihyaa Minhaaj As Sunnah, 1st Edition 2004)

৭৯. অর্থ : নিরক্ষর, আসমানি কিতাব পায়নি এমন জাতি। দেখুন : রাগীব ইস্পাহানি, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন; খণ্ড ০১, কিতাবুল আলিফ, পৃ ২৯ (মাকতাবাতু নাযার মুস্তাফা আল-বায)

৮০. সূরা বাকারা, ০২:৭৮, আ ল ইমরান, ০৩:২০, ৭৫, আ'রাফ, ০৭ : ১৫৭-১৫৮; জুমুআ, ৬২ : ০২; আনকাবূত, ২৯ : ৪৮

৮১. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুস্ সিয়াম; খণ্ড ০৩/হাদীস ২৩৮২ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১০), বুখারি, ১৭৯২

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিরক্ষর হওয়ার ব্যাপারটি স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৮২] তবে কেউ কেউ উদ্ভট দাবি করেছেন যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না, এবং যেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ) ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি সম্ভবত প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত্ব করেছিলেন। সেক্যুলার ঐতিহাসিক ক্যারেন আর্মস্ট্রং এমন আজগুবি দাবি প্রসঙ্গে বলেন :

> "আমরা দেখেছি প্রায় হাজার বছর ধরে পশ্চিমারা মুহাম্মাদের নব্যুওয়াতের সত্যতা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। (উম্মী-র অর্থ বাতিল করার) এই চেষ্টাও (তাঁর নব্যুওয়াতের দাবিকে) ব্যাখ্যার দ্বারা এড়িয়ে যাওয়ার আরেক প্রয়াস। বস্তুত, মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত উম্মী-র অর্থকে চ্যালেঞ্জ করা বিকৃতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। মুহাম্মাদের পড়তে বা লিখতে পারা সম্পর্কে প্রাথমিক সূত্রে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোথাও চিঠি পাঠানোর দরকার পড়লে তিনি আলীর মতো সাক্ষর কাউকে দিয়ে শ্রুতিলিখন করাতেন। নিজের পড়া-লেখার ক্ষমতা সারাজীবন গোপন রাখা এক বিরাট প্রতারণার শামিল বলা চলে। এটি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী; তা ছাড়া, এমন ধোঁকা চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল, কারণ আপন গোত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করেছেন তিনি।"[৮৩]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পড়ার ক্ষমতা ছিল না। তা ছাড়া তৎকালীন সময়ে বাইবেলের কোনও আরবি অনুবাদও ছিল না। বাইবেলের প্রথম আরবি অনুবাদ করা হয় ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দেরও পরে।[৮৪] সুতরাং বাইবেল থেকে পড়ে কপি করা হয়েছে এমন দাবি স্রেফ বাতুলতা।

এখন কেউ বলতে পারে, যেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আমলে আরব উপদ্বীপে ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদের বসবাস ছিল তাই তিনি হয়তো তাদের থেকে মৌখিকভাবে তথ্য পেয়েছেন। কারণ সে সময় ধর্মীয়-সহ অন্যান্য সবধরণের বর্ণনা মৌখিকভাবে সংরক্ষণের রীতি ছিল।

---

৮২. Dr. Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, p. 43 (New Delhi, Goodword Books Pvt. Ltd., 1st Published 2004); Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, p. 51 (New York, Longmans, Green and CO., 1906)

৮৩. Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet; p. 88; এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন : Muhammad Mohar Ali, Sirat Al-Nabi and The Orientalists, vol. I A, p. 179-181, 241-252 (Madina Munawwara, King Fahd Complex, 1st edition, 1997)

৮৪. Sidney H. Griffith, The Bible in Arabic : the Scriptures of the "People of the Book" in the language of Islam; Chapter III : The Earliest Translations of the Bible into Arabic (Epub Edition, Princeton University Press, 2013)

তবে এক্ষেত্রে সমাধানের চেয়ে প্রশ্নই উদয় হয় বেশি। কারণ অমনযোগী দৃষ্টিতে আপাত মিল দেখা গেলেও পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অধিকাংশই বাইবেল থেকে ভিন্ন। ড. আজাদ মিল প্রসঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের কথা বলেছেন। কিন্তু ঝামেলা হলো এক্ষেত্রে বাইবেল আর কুরআনের রূপায়নে যথেষ্ট ও গুরুতর পার্থক্য পাওয়া যায়। ড. আজাদ এত গভীরে খুঁজতে যাননি। শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। চলুন, আমরা একটু ভেতরে যাই।

◈ আদম-হাওয়া সংক্রান্ত বাইবেলে বর্ণিত বিশাল কাহিনির অনেকটাই কুরআনে নেই।[৮৫] কুরআনের বর্ণনা ধারা বাইবেলের মতো নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।[৮৬] বাইবেলের বর্ণনায় পাওয়া যায় শয়তান আগে হাওয়াকে প্রতারিত করে, পরে তাঁর দ্বারা আদম প্রতারিত হন। অর্থাৎ দোষ পুরোটাই হাওয়ার ঘাড়ে।[৮৭] ড. আজাদ *নারী* গ্রন্থে বলেছেন, সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবী। নারীর কাজ হলো নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা।[৮৮]

কিন্তু আল-কুরআন বা নির্ভরযোগ্য কোনও হাদীসে এমন কথা পাওয়া যায় না।[৮৯] কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায়—হয় শয়তান আদমকে প্ররোচিত করছে বা উভয়কে একসঙ্গে প্ররোচিত করছে[৯০], আগে হাওয়াকে প্ররোচিত করা হয়েছে এবং তাঁর কারণে পুরুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে—এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না। বরং কুরআনে

---

৮৫. Seyyed Hossein Nasr (etd.), The Study Quran: A New Translation and Commentary; Sura Baqara 2:35 (Epub Edition, HerperCollins, 1st Edition, 2015)

৮৬. Muhammad Abdel Haleem, Understanding The Qur'an Themes And Style; p. 123-136 (London, I.B.Tauris Publishers, 2001)

৮৭. আদিপুস্তক ০৩: ১-২৪, ১ তিমথীয় ২/১২-১৫, ২ করিন্থিয় ১১:৩। যেমন সাধু পৌল বলেন :

"শিক্ষা দেবার ও পুরুষের ওপর কর্তা হবার অনুমতি আমি কোনও স্ত্রীলোককে দিই না। তার বরং চুপ করে থাকাই উচিত, কারণ প্রথমে আদমকে ও পরে হবাকে (হাওয়া) সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা ছাড়া আদম ছলনায় ভোলেননি, কিন্তু স্ত্রীলোক সম্পূর্ণভাবে ভুলেছিলেন এবং ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিলেন। তবে তিনি সন্তান জন্ম দেবার মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাবেন..." (১ তিমথীয় ২/১২-১৫)

৮৮. হুমায়ুন আজাদ, নারী; পৃ. ৮২ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ মে ২০০৯)

৮৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা; পৃ. ২৮৮ (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ ২০১৩); ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবিদের কাহিনী; খণ্ড ০১, পৃ. ২০ (হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ অক্টোবর ২০১০)

৯০. সূরা ত্বহা, ২০:১২০, সূরা আ'রাফ, ০৭:২০

দুজনকেই সমভাবে দায়ী করা হয়েছে।[১১] সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উদয় হয়, তিনি (ﷺ) যদি বাইবেল থেকেই তথ্য নিয়ে থাকেন, তা হলে এত ভিন্নতা কেন?

◈ ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, ঈসা (ﷺ) স্বীয় অনুসারীদের নিজ মুখে কখনোই 'খ্রিষ্টান' বলে সম্বোধন করেননি। তাঁর অন্তর্ধানের বহু বছর পর সর্বপ্রথম অ্যান্টিঅকে তাঁর অনুসারীদের 'খ্রিষ্টান' বলে অভিহিত করার রীতি শুরু হয়েছিল।[১২] পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীর খ্রিষ্টানদের মধ্যে এর প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সমকালীন খ্রিষ্টানদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই তারা নিজেদের পরিচয় দিত 'খ্রিষ্টান' (আরবিতে 'মাসিহিয়্যিন') বলে। কারণ সে সময় ঈসা (ﷺ)-এর অনুসারীদের বোঝাতে 'মাসিহিয়্যিন' শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত! এখনও পর্যন্ত আরবের খ্রিষ্টানরা নিজেদের 'মাসিহিয়্যিন' বলে চিহ্নিত করার প্রথা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারীরা নিজেদের 'খ্রিষ্টান' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

মুহাম্মদ (ﷺ) যদি বাইবেল থেকেই তথ্য নিয়ে থাকেন, তা হলে ঈসা (ﷺ)-এর অনুসারীদের কোন নামে সম্বোধন করা স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়? অবশ্যই 'মাসিহিয়্যিন'। কিন্তু কুরআনের কোথাও এই নামটির উল্লেখ নেই! কুরআনে অসংখ্যবার তাদের প্রসঙ্গ এলেও একবারও 'খ্রিষ্টান' কিংবা 'মাসিহিয়্যিন' বলে উল্লেখ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে 'নাসারা' (নাযারীন)।[১৩] কিন্তু কেন? এই 'নাসারা' শব্দটি দীর্ঘদিন মানুষের মুখ থেকে হারিয়ে গেলে কী হবে, বাইবেলে কিন্তু ঠিকই ঈসা (ﷺ)-কে 'নাযারীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'খ্রিষ্টান' বলে নয়।[১৪] সুতরাং মনে প্রশ্ন জাগে, এ তথ্য মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কানে কে পৌঁছে দিলো? কীভাবে তিনি জানলেন, সারা পৃথিবী 'খ্রিষ্টান' নামে ডাকলেও ঈসা (ﷺ)-এর অনুসারীদের প্রকৃত নাম নাসারা?

◈ বাইবেলে মূসা (ﷺ) ও ইউসুফ (ﷺ)-এর উভয়ের সময়ের ক্ষেত্রেই রাজ্যপ্রধানকে ফিরআউন বলা হয়েছে।[১৫] কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া যায় মিশরের প্রধানকে ফিরআউন বলে সম্বোধন করা শুরু হয় নবরাজত্ব কালের দিকে, খ্রিষ্টপূর্ব

---

১১. S. H. Nasr (etd.), The Study Quran: A New Translation and Commentary; Sura Al-A'raf 7:21-22; হিফযুর রহমান সিওহারবি, কাসাসুল কুরআন; খণ্ড ০১, পৃ. ২৯-৩০ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

১২. Acts 11:26

১৩. সূরা মায়িদাহ, ৫:১৪, ১৮, ৮২; তাওবা, ৯:৩০

১৪. https://www.biblestudytools.com/dictionary/nazarene

১৫. জেনেসিস ৩৯-৫০, এক্সোডাস ৫

১৪শ শতকের পরে (১৫৫২-১০৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। [১৬] এই সময়কালের মাঝেই মূসা (ﷺ) এই পৃথিবীতে ছিলেন। ইউসুফ (ﷺ)-এর সময়ে (১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে) হিকস রাজপরিবার শাসন করত, যাদের ক্ষেত্রে কখনোই ফিরআউন উপাধি ব্যবহৃত হয়নি। এমনকি এর মৃত্যুর দুই শ বছরেও ইতিহাসে কোথাও ফেরাউন নামের হদিস পাওয়া যায় না। তাই ইউসুফ (ﷺ)-এর সময় ফিরআউন নামের ব্যবহার একটি ঐতিহাসিক ভুল। কিন্তু দারুন ব্যাপার হলো, আল-কুরআনে মূসা (ﷺ)-এর সময়ের রাজ্যপ্রধানকে ফিরআউন বলা হলেও, ইউসুফ (ﷺ)-এর সময়ের রাজ্যপ্রধানকে ফিরআউন বলা হয়নি, স্রেফ রাজা বলা হয়েছে।[১৭] নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) যদি বাইবেল থেকেই কপি করে থাকেন, তা হলে এই বদল কেন? কে এসে তাঁকে কানে কানে এসব বলে গেল?

◈ আল কুরআনে অত্যাচারী শাসক ফিরআউনের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় হামান নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষ্যমতে ফিরআউন তামাশার ছলে হামানকে এক সুউচ্চ ইমারত তৈরির আদেশ দেয়, যাতে সে আকাশে উঁকি দিয়ে মূসা (ﷺ)-এর খোদাকে দেখতে পায়।[১৮] বাইবেলের পুরাতন নিয়মেও হামানের কথা পাওয়া যায়, যে উঁচু ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু বাইবেল অনুযায়ী সে মূসা (ﷺ) এবং ফিরআউনের সময়ের নয়, বরং প্রায় হাজার বছর পরের পারস্যের রাজা জারেক্সেস-এর সমকালীন।[১৯]

প্রাচীন মিসরীয় ভাষা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শত শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যুগ ৭ম শতাব্দীতে পৃথিবীতে কেউ প্রাচীন মিসরীয় ভাষা জানত না। প্রাচীন মিসরীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সময় থেকে এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় পরে, ১৮ শতকে। ফলে জানা যায়, প্রাচীন মিসরে পাথরের নির্মাণ শ্রমিকদের নেতার টাইটেল ছিল 'হামান', যা আল-কুরআনের বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কীভাবে বাইবেলের ভুল তথ্যের বদলে প্রাচীন মিসরের হারিয়ে যাওয়া তথ্য আল-কুরআনে

---

১৬. I. Shaw & P. Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt; p. 222 (London: British Museum Press, 1995) .

১৭. Abu Zakariya, The Eternal Challenge: A Journey Through The Miraculous Quran; p. 86-92

১৮. সূরা কাসাস, ২৮: ৬,৮, ৩৮; আনকাবুত, ২৯: ৩৯, মু'মিন, ৪০: ২৪, ৩৬

১৯. ইষ্টের বিবরণ/Book of Ester 3, 5: 9-14, 6:5-14, 7: 1-10, 8: 1-7

স্থান পেল?[১০০]

◈ প্রাচীন মিসরের লোকদের বিশ্বাস ছিল, আকাশ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন গ্রিসেও এ রকম মতবাদ প্রচলিত ছিল; তারা বিশ্বাস করত যে, আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে! বাইবেল ঘেঁটেও এমন তথ্যের দেখা মেলে। [১০১] কিন্তু আল-কুরআন কি তা-ই বলেছে? মোটেই না, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত (রা'দ, ১৩:২)। বর্তমানে আমরা জানি যে, এমন কোনও স্তম্ভ দ্বারা আকাশ বা পৃথিবী দাঁড়িয়ে নেই। বরং মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা আকাশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : পৃথিবীসহ বিভিন্ন গ্রহ, সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্র ইত্যাদি তাদের ভারসাম্য রক্ষা করে আছে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে।

আল কুরআনে সরাসরি বলা হচ্ছে কোনও প্রকার স্তম্ভ বা পিলার ছাড়াই আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে কুরআনে চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুর কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে। যার সঙ্গে পৌত্তলিক পৌরাণিক মতবাদ, বাইবেলের তথ্য ইত্যাদির কোনও মিল নেই। কুরআন যদি কপি করেই লেখা হতো, তা হলে কি এমনটি হতো? এ কেমন "কপি করে লেখা" গ্রন্থ যার সাথে তৎকালিন অবৈজ্ঞানিক তথ্যের কোনও মিল নেই? কীভাবে এই ভুলগুলো শুধরে গেল?[১০২]

ওপরের এ সমস্ত বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে ছোটখাটো ব্যাপার বলে মনে হলেও এগুলোর গুরুত্ব অনেক। কেননা লোকচোখে উপেক্ষিত এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারেই সাধারণত ভণ্ড নবিরা হোঁচট খেয়ে থাকেন। কেউ তো কখনও বড় দালানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে না, ফুটপাথে পড়ে থাকা ছোট ছোট প্রতিবন্ধকই পথিকের পদস্খলন ঘটায়।

যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল তথ্যের ওপর নতুন করে প্রলেপ দেবার পরিবর্তে কুরআনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা শুধরে দেওয়া হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে আল-কুরআন বাইবেল থেকে কপি করে লেখা এই দাবি এতটাই অমূলক যে, পুনরায় কোনও যুক্তিবোধসম্পন্ন ও সত্যান্বেষী মানুষের পক্ষে এমন বাতুল প্রলাপ

---

১০০. বিস্তারিত দেখুন : মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, ফিরআউনের সময়ে আসলেই কি কোনও হামান ছিল? মুসলিম মিডিয়া, ১৩ অক্টোবর ২০১৮

১০১. আইয়ুব/Job ৯:৬, ২৬:১১; Pslams/গীতসংহিতা ৭৫:৩; Isaiah/যিশাইয় ২৪:১৮

১০২. মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, কুরআন ও বাইবেল : কোন গ্রন্থটি আসলে কপি করে লেখা? রেস্পন্স টু অ্যান্টি ইসলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

আওড়ানো সম্ভব না।[১০৩]

যিশু : আসল নাকি ভেলকি?

পশ্চিমের গুণমুগ্ধ ড. আজাদ এক পর্যায়ে বলেছেন,

"মানুষ কতোটা মিথ্যা বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে, তার অসামান্য উদাহরণ জেসাস বা খ্রিষ্ট। জেসাস মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্পচরিত্র : গত দু-শো বছরের বাইবেলবিজ্ঞানীরা, যাঁদের অনেকেই ধার্মিক ও পুরোহিত, প্রমাণ করেছেন যে জেসাস নামে কেউ ছিলো না।... জেসাসকে সৃষ্টি করা, তাকে ঘিরে পুরাণ, ও একটি নতুন ধর্ম বানানোর সমস্ত কৃতিত্ব খ্রিষ্টান সুসমাচারপ্রণেতাদের। ক্রাইস্ট এক কিংবদন্তি বা পুরাণ..." (পৃ. ৯০)

তিনি ডেভিড স্ট্রস-এর বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন উনার দাবির পক্ষে। স্ট্রস এককালে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন, উনার বইয়ের কারণেই জন্ম হয়েছিল আরেক আলোচিত নাস্তিকের, যার নাম ফ্রেডেরিক উইলহেম নিৎশে।[১০৪] নাস্তিকতার ইতিহাসে নিৎশে একটি বহুল আলোচিত নাম।

ডেভিড একজন বস্তুবাদী গবেষক হিসেবে মিথতত্ত্ব (*Myth theory*)-এর দৃষ্টিতে যিশুর জীবনকে দেখার চেষ্টা করেন এবং সিদ্ধান্ত দেন যিশু বলে কারও অস্তিত্ব ছিল না, বরং সুসমাচার (*Gospel*) লেখকেরা জেসাস ক্রাইস্টকে তৈরি করেছেন। তৎকালীন সময়ের অনেকেই নাকি দাবি করেছেন যে জেসাসকে তৈরি করা হয়েছে তাইয়ানার দার্শনিক অ্যাপোলোনিয়াসের আদলে। উনার দৃষ্টিতে সুসমাচারগুলো উপন্যাসের থেকে সত্য নয়, জেসাসও সত্য নন উপন্যাসের নায়কের থেকে (পৃ. ৯১)। সাম্প্রতিক সময়ে নাস্তিক ফরাসি দার্শনিক মাইকেল অনফ্রে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থেও বলতে চেয়েছেন, যিশু হলেন কেবলই এক অনুকল্প!

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো অধ্যাপক সাহেবের আরও অনেক দাবির ন্যায় এই

১০৩. বিস্তারিত দেখুন : M. M. Ali, The Qur'an and the Orientalists: An Examination of their Main Theories and Assumptions; p. 26-61; আরও দেখুন : Dr. Mohammad khalifa, The Sublime Quran and Orientalism; p. 13-17 (Kaachi: International Islamic Publishers, 2nd Edition 1989)

১০৪. Nick Spencer, Atheists: The Origin of the Species; p. 195

দাবিও ভুল। অধ্যাপক সাহেবের নিজের এজেন্ডার সাথে মিলে যাওয়ায় তিনি ডেভিড স্ট্রসের বক্তব্যকে প্রশ্ন করেননি; যদিও তিনি নাকি বিনা প্রশ্নে কিছু মানতে চাইতেন না। আমরা প্রশ্ন করি চলুন। মিথতত্ত্বওয়ালাদের বক্তব্য কি সঠিক? সঠিক উত্তর, না। যিশুর অস্তিত্ব যে আসলেই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে।[১০৫] আমেরিকার প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশারদ এবং ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির রিলিজিয়ন এন্ড কালচার বিভাগের সাবেক প্রফেসর মার্কাস বর্গ এ প্রসঙ্গে বলেন :

> "যদিও সাম্প্রতিক গুটিকয়েক বই এ দাবি উত্থাপন করছে যে যিশুর অস্তিত্বই কখনোই ছিল না। তবে তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা অধিকাংশ খ্রিষ্টান বা অখ্রিষ্টান পণ্ডিতকেই এমতে প্ররোচিত করেছে যে, সত্যি তাঁর অস্তিত্ব ছিল।"[১০৬]

সাম্প্রতিক বাইবেল গবেষক মরিস কেইসি *Jesus: Evidence and Argument or Mythicist Myths?* গ্রন্থে মিথতত্ত্বওয়ালাদের উত্থাপিত নানা দাবির উত্তর দিয়ে দেখিয়েছেন যিশু অস্তিত্ব আসলেই ছিল।

বর্তমান কালের বিখ্যাত বাইবেল বিশারদদের আরেকজন হলেন ড. বার্ট ডি. আরমেন। খ্রিষ্টধর্মে বড় হয়ে সেই ধর্মের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করতে তিনি বাইবেল পড়া শুরু করেন। বাইবেলের নানা অসংগতি চোখে পড়তে থাকলে তা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে ভাবার চেষ্টা করেন। বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্ম গবেষণাকেই নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিশেষে, দর্শনগত কারণে খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অজ্ঞেয়বাদী, হিউম্যানিস্ট হিসেবে পরিচয় দেন। তবে অন্যান্যদের সাথে উনার পার্থক্য হলো, উনি গোঁড়া ধর্মবিদ্বেষী নন।

আসলেই যিশুর অস্তিত্ব ছিল কি না, সেটা তিনিও গবেষণা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণা শেষে তিনি তাঁর *Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth* গ্রন্থে বাইবেলের পাশাপাশি অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রাচীন নথিপত্র উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন, যিশুর অস্তিত্ব ছিল; কেউ তা পছন্দ করুক বা নাই করুক, কিছুই যায় আসে না। দার্শনিক অ্যাপোলোনিয়াসের অস্তিত্ব যেমন ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, যিশুর অস্তিত্বও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

---

১০৫. Dr Simon Gathercole, What is the historical evidence that Jesus Christ lived and died? The Gurdian, 14 Apr 2017

১০৬. Natalie Wolchover, Was Jesus a Real Person?; Live Science, April 14, 2011

পাশাপাশি যারা যিশুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়, তিনি তাদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : যিশুর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী মিথতত্ত্বওয়ালারা মূলত চরম ধর্মবিদ্বেষী। তাদের চারপাশে প্রধানত খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাধান্য ছিল। তাই ধর্মকে আক্রমণ করতে চাইলে খ্রিষ্টবাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র যিশুর অস্তিত্ব নিয়ে ভেজাল লাগিয়ে দেওয়ার চেয়ে সহজ কাজ আর কীই হতে পারে?

ড. বার্ট ডি. আরমেন-এর মতে মিথতত্ত্বওয়ালাদের এহেন আচরণও ধর্মান্ধদের আচরণের সমতুল্য। তবে তিনি এটাও দেখিয়েছেন, খ্রিষ্টানরা আজ যে যিশুকে চেনে, আসল যিশু তেমন ছিলেন না। তিনি বলেন :

> "আমার দৃষ্টিতে, হিউম্যানিস্ট, সংশয়বাদী, নাস্তিক, মিথতত্ত্বওয়ালা বা অন্য কেউ যারা যিশুর অস্তিত্বকে মানতে চান না, তাদের জন্য যিশুর অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না এমন ভুল দাবি করার চেয়ে, ইতিহাসের যিশু আর আজকের খ্রিষ্টবাদের যিশু যে এক নয়, এদিকটায় জোর দেওয়াই অধিক উত্তম। যিশুর অস্তিত্ব ছিল। তবে আজকের খ্রিষ্টবাদে বিশ্বাসীরা তাকে যেমনটা ভেবেছে তিনি তেমন ছিলেন না, ব্যস।"[১০৭]

প্রফেসর বর্গের মতেও, যিশু নতুন কোনও ধর্ম বানাতে চাননি। তিনি ইয়াহূদি ধর্মের মাঝেই নিজেকে দেখেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা তাঁকে খোদার আসনে বসায়।

দ্য ডেভিল্স অ্যাডভোকেট!

ড. আজাদ বলতে চেয়েছেন, শয়তান কোথাও নেই (পৃ. ১০১)। উনি বোধহয় ভেবেছেন শয়তান হলো কেবলই অতিপ্রাকৃত কোনও মন্দসত্তা, যাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ঝামেলা হলো ইসলামে শয়তানের ধারণা এতটা সংকীর্ণ নয়। অভিধান অনুযায়ী শয়তান মানে এমন সত্তা, যে সত্য থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে।[১০৮] অপর অর্থ, শয়তান হলো প্রত্যেক গর্বিত ও বিদ্রোহী জিন, মানুষ ও প্রাণী; যে শক্তি মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দান করে ও কুপরামর্শ দিয়ে মানুষকে

---

১০৭. Bart D. Ehrman, Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth; Part III : conclusion (Epub Edition, HarperCollins e-books, 2012)

১০৮. T. P. Hughes, A Dictionary Of Islam; p. 84 (New York : Scribner, Welford, & Co., 1885)

পথ ভুলিয়ে দেয় ও বিপথগামী করে সেই শয়তান। ইমাম তাবারির মতে, অবিশ্বাসীরা আল্লাহর বদলে যার আনুগত্য স্বীকার করে সেই শয়তান।[১০৯] অর্থাৎ শয়তান মূলত গুণবাচক বা কর্মবাচক নাম।

জিনেরা এই বস্তুজগতেরই অংশ, তবে তারা ভিন্ন মাত্রায় বিরাজমান। তাদেরকে সরাসরি দেখা যায় না, তবে তাদের প্রভাব সরাসরি দেখা যায়। ড. আজাদ সেই প্রভাব কোনওদিন দেখেননি বলে সরাসরি জিন শয়তানকে অস্বীকার করে বসেছেন। অথচ একই বইয়ে অন্যত্র দাবি করেছেন, অ্যালিয়েন অর্থাৎ ভিনগ্রহে কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি (পৃ. ৬৬)! যে অ্যালিয়েন নিজেও ভিন্ন মাত্রার, একই সাথে ভিন্ন জগতেরও। আসলে পশ্চিমের ওপর অধ্যাপকের ঈমান ভালই মজবুত প্রতীয়মান হয়। আরও অনেক সেক্যুলার পশ্চিমা গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিকও এমন বিশ্বাস করেন যে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমাণ প্রাণী থাকতে পারে।[১১০]

ভিনগ্রহে বুদ্ধিমত্তার অনুসন্ধান *(Search for Extraterrestrial Intelligence-SETI)* শুরু হয় সেই ১৯৬০ সালে। হার্ভাড গ্রাজুয়েট ফ্র্যাংক ড্রেইক সর্বপ্রথম *প্রোজেক্ট ওযমা* (*Project Ozma*) নামক গোপন প্রজেক্ট দ্বারা এই অ্যালিয়েনের খোঁজ শুরু করেন। [১১১] সেই থেকে প্রায় ৬০ বছর ধরে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ চষে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বখ্যাত *মাইক্রোসফট*-এর প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেন ভিনগ্রহের প্রাণী-খোঁজার এই প্রজেক্টে অনুদান প্রদান করেছিলেন ১৬ লক্ষ পাউন্ড! বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজকারী ক্যালিফোর্নিয়ার *সেটি ইন্সটিটিউট*-এর বাৎসরিক ব্যায়ের পরিমাণ ৭০ লক্ষ ডলার! [১১২] এদিকে আবার এলিয়েন থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য *নাসা* অফিসার ভাড়া করছে, যার বাৎসরিক বেতন হবে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার![১১৩]

এত বছর ধরে এমন হুলুস্থুল কাণ্ড করে, অগণিত অর্থ ব্যয় করে ফলাফলটা কী? নিশ্চয়ই কাড়ি কাড়ি প্রাণী খুঁজে পাওয়া গেছে, তাই না? সে আশায় গুড়ে বালি!

---

১০৯. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ; খণ্ড ০২, পৃ. ৩৪২ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৭)

১১০. John Brockman (etd.), What We Believe but Cannot Prove; p. 1-2, 11, 15, 18-19, 21, 23 etc.

১১১. SETI, Encyclopaedia Britannica Online. Available at: https://www.britannica.com/event/SETI

১১২. Seti: The hunt for ET. The Independent, 27 September 2009

১১৩. Rachael Revesz, Nasa Offering Six-Figure Salary for New 'Planetary Protection Officer' to Defend Earth from Aliens. The Independent, 2 August 2017

পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ জেসন রাইট নেতৃত্বে এক গবেষকদল প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বড়সড় গ্যালাক্সি চুলচেরা অনুসন্ধান করেও কোনও এলিয়েনের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি।[১১৪] এরপরও ড. আজাদদের এলিয়েনের অস্তিত্ব খুবই সম্ভব মনে হয়, আর শয়তান নেই মনে হয়! বড় অদ্ভুত তাঁদের চিন্তাধারা!

তবে বৈজ্ঞানিক মহলেও এখন শয়তান নিয়ে কথা ওঠা শুরু হয়েছে। প্রথিতযশা সাইকিয়াট্রিস্ট এবং ১০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হওয়া বেস্ট সেলিং বইয়ের লেখক ডা. স্কট পেক তাঁর এক বইতে শয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি এককালে শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জীবনের পরিক্রমায় এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হন, যার দ্বারা তাঁর চিন্তার জগতের মোড় ঘুরে যায়। এমন কিছু আবিষ্কার করে বসেন, যা নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া বা স্ট্যান্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস দ্বারা সমাধা করা যায় না। চলুন তাঁর নিজের মুখ থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতার কিয়দাংশ শোনা যাক :

> "জার্সির সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম না। অথবা আরও সঠিকভাবে বললে, তার সাথে সাক্ষাতের তিন ঘণ্টা পরও আমি ৯৯% নিশ্চিত ছিলাম যে শয়তান বলে কিছু নেই। বরং শয়তানের অনস্তিত্বকে যতটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে পারা যায় প্রমাণ করার কৌশল হিসেবে আমি জার্সির ঘটনাকে কাজে লাগানোর চিন্তাভাবনা করতে থাকি। কিন্তু যখন জার্সিকে বলতে শুনি, 'ওদের জন্য আমার খারাপ লাগে। তারা আসলেই বড্ড দুর্বল ও করুণা পাওয়ার যোগ্য', তখন আমার অভিজ্ঞতা যেন আমাকেই ব্যাকফায়ার করে বসে। তার সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরে যখন বাসায় ফিরে আসি তখনও শয়তানের অস্তিত্বে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি, সর্বসাকুল্যে ফিফটি-ফিফটি বলা যায়। তারপরও বলতে হয়, মনের কী অদ্ভুত বিচলন! সংশয়বাদী থেকে একদিনের মাঝেই নিরপেক্ষ অবস্থানে এসে দাঁড়ানো, আসলেই, আরও খতিয়ে দেখতে হবে দেখছি! টেরি আর আমি জার্সির সম্মুখীন হয়ে তার মাঝে লুকিয়ে থাকা এক ভয়ংকর খারাপ সত্তাকে আবিষ্কার করি। এ নিয়ে ম্যালাকাইয়ের সাথে আলোচনা করে তা হজম করতে আমার বেশ সময় লেগেছে। তিনমাস পর আমার মনে হয় আমি বিশ্বাস শুরু করেছি। আমি তখন ৯৫% নিশ্চিত ছিলাম, এতটুকু নিশ্চিত যে বিনাদ্বিধায় ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিতাম। যদিও আমি জানতাম আমার নিজের ডাক্তারি পেশাই হয়তো আমাকে এহেন আচরণের জন্য বিদায় জানাবে। দুমাস পর ঝাড়ফুঁকের চরম মুহূর্তে যখন দেখি জার্সি আমার দিকে

১১৪. Lee Billings, Alien Supercivilizations Absent from 100,000 Nearby Galaxies. Scientific American, April 17, 2015

তাকিয়ে আর্তচিৎকার দিচ্ছে, সাথে সাথে হাসছেও। তখন আমি প্রায় ৯৯% নিশ্চিত হই যে সে আসলেই শয়তানের আসরে আক্রান্ত। চারদিন পর আমি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যাই, পুরোপুরি! আর কখনোই আমি শয়তানের অস্তিত্বে সন্দেহ করব না।"[১১৫]

তা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আরেকজন প্রথিতযশা বোর্ড সার্টিফাইড আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট ও নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি-এর প্রফেসর এ নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি হলেন ডা. রিচার্ড গ্যালাঘার। পড়াশোনা করেছেন প্রিন্সটন, ইয়েল এবং কলম্বিয়ায়। তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সামান্য কিছু অংশ লিখেছেন *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর এক দীর্ঘ আর্টিকেলে।[১১৬] তাঁকে নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে *দ্য টেলিগ্রাফ*, *ডেইলি মেইল*, *সিএনএন* ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

নিজেকে গর্বের সাথে 'বিজ্ঞানের মানুষ' বলে পরিচয় দেওয়া ডা. রিচার্ড নিজেও শয়তানের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন। তিনি শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সংক্রান্ত বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা জানতেন। তবে তিনি মনে করতেন প্রাচীন মানুষ বিভিন্ন রোগের (যেমন : মৃগীরোগ) কারণ বুঝতে না পেরে এগুলোকে শয়তানের আসর মনে করত। কিন্তু বিগত পঁচিশ বছর ধরে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতা যেন অন্য এক জগতের দিকে ইঙ্গিত করছে! ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে মেডিসিন পড়ার সময় তিনি কস্মিনকালেও ভাবেননি একদিন তাঁকে শয়তানের চ্যালাদের সাথে টক্কর লাগতে হবে![১১৭]

ডা. রিচার্ড গ্যালাঘার শতের ওপরে শয়তানের সম্ভাব্য আক্রমণের কেসের মুখোমুখি হয়েছেন। *দ্য টেলিগ্রাফ*-এ দেওয়া এক বিস্তারিত ও দুর্লভ সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন—কেন তিনি শয়তানের অস্তিত্ব ও তার আক্রমণকে আসল মনে করেন। তিনি একা নন, আরও অনেক সাইকিয়াট্রিস্টও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এ বিষয়ে জনসম্মুখে মুখ খুলতে চান না। ডা. রিচার্ড তার ব্যতিক্রম। তিনি শুধু মুখই খুলছেন না, শীঘ্রই শয়তানের আসর

---

১১৫. Dr. M. Scott Peck, M.D., Glimpses of The Devil: A Psychiatrist's Personal Accounts of Possession, Exorcism & Redemption; Part III: conclusion (Free Press, 2005)

১১৬. Richard Gallagher, As a psychiatrist, I diagnose mental illness. Also, I help spot demonic possession. The Washington Post, July 1, 2016

১১৭. John Blake, When exorcists need help, they call him. CNN, August 4, 2017

বিষয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে যাচ্ছেন *Demonic Foes, A Psychiatrist Investigates Demonic Possession in the Modern United States* শিরোনামে, যা প্রকাশিত হবে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক প্রকাশনী *হারপার কলিন্স* থেকে।

ডা. রিচার্ড এর মতো আরও কতিপয় সাইকিয়াট্রিস্ট নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে শয়তানের আসর সম্ভব মনে করেন। যেমন : ডা. মার্ক আলবানিজ, নিউ ইয়র্ক সাইকিয়াট্রি ইন্সটিটিউটের পরিচালক ও সিজোফ্রেনিয়া বিশেষজ্ঞ ডা. জেফরি লাইবারম্যান, নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ডা. জোসেফ ইংলিশ প্রমুখ। যেমন : ডা. জোসেফ ইংলিশ বলেন :

> "(সম্ভাব্য শয়তানের আসরের) এমন ঘটনাগুলোর নজির আজকের আধুনিক দুনিয়াতেও পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তা আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণার বিপরীত। এহেন সমস্যাগুলোকে স্রেফ মেডিকেল বা সাইকিয়াট্রিক-ব্যাধি বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে এমন ঘটনা ঘটেই চলছে।"

নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ডা. রিচার্ড গ্যালাঘারের অনুধাবন হলো, এই শয়তানেরা খুবই স্মার্ট, মানুষের চেয়ে এদের ঘটে ঘিলু অনেক বেশি। তাই তারা মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে। মাঝে মাঝে মানুষকে বাঁদর বলে গালি দেয়![১১৮] ড. আজাদ শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন জানতে পারলে উনাকে শয়তানরা কী বলে সম্বোধন করত সেটা ভাবার বিষয়।

১১৮. Rachel Ray, 'Demonic possession is real and victims seeking exorcism should not be ignored': Prominent psychiatrist on the world beyond. The Telegraph, 3 June 2018.

সারমর্ম

এই অধ্যায়ের শুরুটাতেই বড় রকম একটা চমক বিদ্যমান। স্কুল জীবনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়া সমাজবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে আমাদের নানা হাবিজাবি গেলানো হয়েছিল। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত নানারকম তত্ত্বের আসল চেহারা উন্মোচনে এই সূচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ। বাংলা ভাষায় এই টপিকে আর কাজ হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। আশাকরি শুরুর আলোচনাটা এ বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। তারপরই যে আলোচনার অবতারণা, তা আমার জন্যই বেশ চমকপ্রদ ছিল। ধর্মের বস্তুগত উপকারিতা নিয়ে যে এত গবেষণা হয়েছে, এই বই লেখার কাজে হাত না দিলে তা হয়তো অজানাই রয়ে যেত।

ধর্মের নানাবিধ উপকারিতা দেখে কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে, উপকার আছে বুঝলাম; কিন্তু ধর্মের তো অভাব নেই! মানব কোনটা? তারই উত্তরে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা এসেছে; যেখানে আমি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছি—ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্মের মর্যাদায় আসীন। এর ধারাবাহিকতায় ধর্মের বিভিন্ন আদেশের প্রজ্ঞা অনুধাবনের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। এই প্রসঙ্গ আলোচনা দাদাদের দেশে যে গরু ভক্ষণ নিয়ে মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন চলে তার স্বরূপ কিছুটা হলেও বোঝা গেছে, অন্তত পরোক্ষভাবে।

তারপর আলোচনায় এসেছে নাস্তিকদের চিরচেনা অভিযোগের একটি, আল-কুরআন মূলত বাইবেল থেকে ধার করে লেখা। প্রামাণ্য উত্তরের শেষে যিশুকে নিয়ে যারা জলঘোলা করতে চায় তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে সাহেবিয় রেফারেন্স দিয়ে। অধ্যায়ের আলোচনায় সমাপ্তি এসেছে শয়তানের কথা নিয়ে। এই অংশটুকুও আমার জন্য বেশ মজাদার ছিল। শয়তান নিয়ে করা অভিযোগকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উত্তর দিতে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম; তারই ফল—দ্য ডেভিলস অ্যাডভোকেট!

ওপারে

নয়নে তোমারে পায় না দেখিতে

মাতৃগর্ভে থাকা দুজন জমজ শিশুর মধ্যে কথা হচ্ছে। একজনের নাম দেওয়া যাক মনন, অপরজনের নাম অহং।

মনন বলল, ভাই আমি জানি তোর জন্য এটা বিশ্বাস করা কঠিন, তবুও বলি- আমি সত্যিই বিশ্বাস করি এই জীবনের বাইরেও আমাদের একটা জীবন আছে!

উত্তরে অহং বলে উঠল, আরে ধুর গাধা, আবোলতাবোল বকবি না বলে দিলাম! চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, এই জগতই সব। এর বাইরেও জগৎ থাকতে পারে, তুই এমন কেন ভাবিস বল তো? এই জীবনে যতটুকু কপালে জুটেছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর, এইসব প্রসব-পরবর্তী-জীবন মার্কা বাকওয়াজ ভুলে যা!

মনন অনুক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু ওর ভেতরের খুঁতখুঁতভাব কাটছে না। সে আবার বলে উঠল, এই অহং শোন, খেপিস না কিন্তু বললাম, আমার আরও কী মনে হয় জানিস? আমাদের একজন মা আছে!

অহং হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, মা? আরে বলিস কী তুই! হা হা হা, তুই কি লুলু পাগলা হয়ে গেলি? মা বলে কিছু তুই কখনও দেখেছিস? কখনোই দেখিসনি। আচ্ছা, এই জগতের বাইরে যে কিছু নেই, তা তুই কেন মেনে পারিস না বল তো? মা আছে! যত্তসব আজগুবি কথাবার্তা! শোন, তুই এখানে আমার সাথে আছিস, এটাই তোর জগৎ, বুঝলি? নে, এবার তোর নাড়িটা ভালোমতো ধর, আর কোনায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাক। আকাট মূর্খের মতো বকবক করবি না আর। আমার কথা মেনে নে, মা বলে কিছু নেই।

মনন মন খারাপ করে চুপ করে রইল। কিন্তু ওর ভেতরটা তো বসে থাকতে চাইছে না। সে মিনতির সুরে অহংকে বলল, এই অহং, শোন না, আমার কথা এভাবে উড়িয়ে দিস না ভাই। আমার কেন জানি মনে হয়, আমরা সব সময় যে চাপ অনুভব করি, যে নড়াচড়ার কারণে মাঝে মাঝে অস্বস্থিতে পড়ে যাই, বেড়ে ওঠার সাথে সাথে জায়গা

বদল হয়—এসবই আমাদের এক জগতের জন্য তৈরি করছে। সেখানে নিত্যদিন আলোর খেলা, আমরা শীঘ্রই বোধহয় সে আলোর ছোঁয়া পাব, বুঝলি?

অহং মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠল, হুম, বুঝছি। তোর মাথা পুরা গেছে মনে হচ্ছে। ওই ব্যাটা, অন্ধকার ছাড়া জীবনে কিছু দেখেছিস? আলো আবার কী জিনিস রে? জীবনে কোনওদিন আলো দেখেছিস? এমন আজগুবি কথা বলিস কী করে তুই? এই যে নড়াচড়া আর চাপ অনুভব করিস, এটাই তোর জীবনের বাস্তবতা। তুই এক বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র সত্তা। এটাই তোর জীবনযাত্রা, আঁধার, চাপ আর মাঝেসাঝে খানিকটা দমবন্ধ অনুভূতি—এ নিয়েই আমাদের জীবন। যতদিন বেঁচে আছিস, এর সাথেই সংগ্রাম করে যেতে হবে। নে, এখন নিজের নাড়ি ধরে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাক।

মনন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। অহংকে বলল, এই শোন, আর একবার কথা বলব, তারপর আর তোকে বিরক্ত করব না, শোন না!

অহং অধৈর্য ও বিরক্তির সাথে জবাব দিলো, বল, কী আর করা!

মনন বলল, আমার কী মনে হয় জানিস, চাপ ও অস্বস্তির এই জীবন শেষে আমরা নতুন সুন্দর আলোর দেখা পাব। শুধু তাই নয়, সেই আলোর ছোঁয়া যখন পাব, তখন মায়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে! এবং আমাদের এই জগতের অভিজ্ঞতার বাইরে নব-অভিজ্ঞতার পরমানন্দের স্বাদ আস্বাদন করব। তুই দেখে নিস, এমনটাই হবে!

বুঝেছি, হতাশ হয়ে অহং বলে উঠল, আমার এখন কোনও সন্দেহ নেই যে তুই পুরো পাগল হয়ে গেছিস। আগাগোড়া বদ্ধ উন্মাদ তুই![১]

এই ঘটনাকল্প থেকে একজন বিশ্বাসী এবং একজন অবিশ্বাসীর মনস্তত্ত্বের পার্থক্য ফুটে ওঠে। মাতৃজঠরে জমজ শিশু দুটি যেরকম মায়ের ভালোবাসা, যত্নআত্মির মাঝে আম্বিলিকাল কর্ড দিয়ে আসা খাদ্যরস, অক্সিজেন শোষণ করে তিল তিল করে বেড়ে ওঠে; ঠিক তেমনি মানুষ এই নশ্বর বসুধায় মহান স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া ভালোবাসার অনুগ্রহ আলো-বাতাস-পানি-অক্সিজেন-বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতির এক নিবিড় তত্ত্বাবধানে জীবন ধারণ করে; নীল আকাশ দেখে উদাস হয়ে শব্দের মালা গাঁথে, সমুদ্রের প্রকাণ্ড জলরাশি সাথে সংগ্রাম করে ভেসে বেড়ায়, নীল গগনে যান্ত্রিক পাখি হয়ে মেঘের

১. Adapted from: Wayne W. Dyer, Your Sacred Self : Making the Decision to be Free (HerperCollins, 2009)

সাথে মিতালি করে।

একই যত্ন, ভালোবাসা, দেখভালের মাঝে বেড়ে ওঠার পরেও যমজ শিশুদ্বয়ের এক জন তাদের জীবনরস দানকারী মায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে স্বীয় সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণে। নিজের সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় তাকে তার গণ্ডির বাইরের জগৎ নিয়ে ভাবতে প্রবল বাধা দেয়, সে তার অনিবার্য পরিণতি প্রসব-পরবর্তী-জীবনকে অস্বীকার করে বসে। অন্যজন এসবে স্বীকার করে, বিশ্বাস করে, তা নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

একইভাবে সৃষ্টজগতের অভাবনীয় সমন্বয়, শৃঙ্খলা; পৃথিবীকে ঘিরে থাকা আলো-বাতাস-পানি-নৈসর্গিক প্রকৃতি ভোগ করেও মানুষের মাঝে কেউ কেউ স্রষ্টাকে, পরকালকে বিশ্বাস করে। আবার কেউ করে না। কেউ তার অনিবার্য পরিণতি পরকালকে স্বীকার করে, কেউ করে না। কিন্তু কারও অস্বীকার করার দ্বারাই কী কোনও কিছু অপ্রমাণিত হয়ে যায়? না, যায় না। বরং এহেন আচরণ কেবলই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন পরকালকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়? এর কারণ বিভিন্ন রকম। অনেকে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চান না, আর স্রষ্টাই যদি না থাকে, তা হলে পরকাল আর সেখানের হিসেবনিকেশ, শাস্তি-পুরস্কার কোনওটাই থাকবে না; ফলে নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন করা যাবে। এসকল মানুষেরা প্রমাণ দাও, প্রমাণ দাও বলে বুলি ছোড়ে। পরকালের পক্ষে এরা বস্তুগত প্রমাণ দাবি করে। এরা মূলত এই ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে বসে থাকে যে, ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে থাকা হলো অনস্তিত্বের প্রমাণ। যদিও নিজেরা অনেক কিছু প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয় (অধ্যায় ০১ দ্রষ্টব্য)।

অন্য ভুবন

রাতবিরেতে সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যামবুলেন্স এসে থামল হাসপাতালের সামনে। স্ট্রেচারে করে গাড়ি থেকে এক অচেতন মানুষকে বের করা হলো। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াতে (*Cardiac Arrest*) তার সারা শরীর নীলাভ বর্ণ ধারণ করেছে (*Cyanosis*), কোমায় থাকা মধ্যবয়সী এই মানুষটিকে দ্রুত ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। জানা গেল প্রায় আধা ঘণ্টা আগে তাকে পাবলিক পার্কে পড়ে থাকতে দেখে কিছু পথচারী। তারা হার্ট মেসেজ করা শুরু করে ইমার্জেন্সিতে ফোন

দেয়।

লোকটিকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়, পাশাপাশি কার্ডিয়াক মেসেজ ও হার্ট সচল করার জন্য শক দেওয়া হয় (*Defibrillation*)। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য শ্বাসনালীতে নল দেওয়ার সময় ডাক্তার লক্ষ করেন—তাঁর কৃত্রিম দাঁত লাগানো আছে। নল দেওয়ার সুবিধার্থে কৃত্রিম দাঁতগুলো খুলে ট্রলিতে রাখা হলো। চলতে থাকলো মানুষটির প্রাণ ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। প্রায় নব্বই মিনিট অক্লান্ত খাটনির পর কিছুটা আশার আলো দেখা গেল। লোকটির হৃদছন্দ ও রক্তচাপ ফিরে এল, কিন্তু শ্বাসনালীতে নল নিয়ে সে কোমায় পড়ে রইল।

এমন নাজুক অবস্থায় তাকে আইসিইউতে পাঠানো হলো শ্বাস চালানোর ভালো-ব্যবস্থার আঞ্জাম দেওয়ার জন্য। প্রায় এক সপ্তাহ কোমায় থেকে অবশেষে চেতনা ফিরল লোকটির। তাঁকে আবার করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হলো। সেখানে লোকটি কাকে যেন খুঁজছিল, ইতিউতি চোখে তাকাচ্ছিল এদিক-সেদিক। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই ডাক্তারকে, যে তাঁর শ্বাসনালীতে নল পড়িয়েছিল, এবং কৃত্রিম দাঁত খুলে রেখেছিল। ডাক্তারকে দেখামাত্র সে বলে উঠল, এই যে আপনি, আরে আপনাকেই তো খুঁজছি। আপনিই তো আমার দাঁত খুলে রেখেছিলেন। এখন ওগুলো দিন তো দেখি!

এই কথা শুনে ডাক্তারের আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়, হতভম্ব হয়ে সে তাকিয়ে রইল মানুষটির দিকে। মানুষটি বলে চলল, হ্যাঁ আপনিই, ওরা যখন আমাকে এই হাসপাতালে নিয়ে আসে, তখন আপনিই আমার মুখ থেকে নকল দাঁত সরিয়ে রেখেছিলেন। ওই যে ট্রলিটা দেখছেন, ওটার ওপরে নানান কিসিমের বোতল ছিল। আপনি এটার নিচের ড্রয়ারটাতে আমার দাঁত রেখেছিলেন। হুম, আমার মনে আছে।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাব কেটে উঠতেই ডাক্তারের খেয়াল হলো, আরে! এই লোকটা তো কোমায় ছিল যখন তাঁর দাঁত খুলে রাখা হয়েছিল! ও আমাকে কীভাবে দেখল! ডাক্তার অবাক হয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। ডাক্তার সাহেব আরও অবাক হলেন যখন শুনতে পেলেন, লোকটিকে যে রুমে বাঁচানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছিল সেই রুমের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিচ্ছে সে, এমনকি যারা তখন রুমে উপস্থিত ছিল তাদের চেহারার বর্ণনা দেওয়াও শুরু করল সে!

আরও প্রশ্ন করতে সে বলে উঠল, আপনারা যখন আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন তখন আমি ওপর থেকে তা দেখছিলাম। বিছানায় নিথর হয়ে শুয়ে-থাকা

নিজের শরীর দেখছিলাম। আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখে আপনারা যখন আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা থামানোর কথা বলেছিলেন, তা শুনে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম! আমি মরিয়া হয়ে চিৎকার করে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম যে, আমি বেঁচে আছি, প্লিজ চেষ্টা থামাবেন না। ভাগ্যিস, আপনারা চেষ্টা করেছিলেন।'[১]

এই ঘটনাটি কারো কাছে নিছক গল্প মনে হতে পারে। কোনও রহস্য উপন্যাসের গন্ধও পেতে পারে কেউ কেউ। কিন্তু আসল কথা হলো, এই ঘটনাটি এবং এমন অনেক ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে। এ নিয়ে বিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল *The Lancet*-এ পেপারও প্রকাশিত হয়েছে! এসকল ঘটনাকে বলা হয় *Near-Death Experience (NDE)*। এগুলো হলো এমন কিছু অভিজ্ঞতা যার সম্মুখীন হন মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি অথবা ক্লিনিক্যালি ডেড ব্যক্তি। সাইকিয়াট্রি ও নিউরোবিহেভিয়োরাল সাইন্স-এর অধ্যাপক ব্রুস গ্রেইসন *NDE* এর সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> "*NDE* হলো অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক উপাদান সম্বলিত নিগুড় মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাসমূহ, যা সচরাচর মৃত্যুর নিকটবর্তী অবস্থায় অথবা প্রবল দৈহিক বা মানসিক বিপদের সময় ঘটতে দেখা যায়।"[২]

বিগত প্রায় ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে *NDE* নিয়ে কাজ হচ্ছে বিজ্ঞান মহলে। সর্বপ্রথম এ নিয়ে আলোচনা করেন সাইকোলজিস্ট ড. রেমন্ড মুডি, তাঁর বেস্ট সেলিং বই *Life after Life*-এ। এই বইয়ের দ্বারাই বিজ্ঞানীমহল ও সাধারণ মানুষ *NDE* এর সাথে পরিচিত হন। তারপর থেকে অনেকেই গবেষণা চালাচ্ছেন। গবেষকগণ *NDE* এর ১২ রকম প্রকার খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমানে *NDE* বিষয়ে পিয়ার রিভিউড গবেষণাপত্রের সংখ্যা ২০০-রও বেশি।

NDE নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন—ড. জেফরি লং, ড. গ্যারি শোয়ার্টস, ড. ম্যারি নীল, ড. কেভিন নেলসন, ড. পিটার ফেনউইক, ড. স্যাম পারনিয়া, ড. মারিও বিয়াউরেগার্ড, ড. পিম ভ্যান লোমেল প্রমুখ। ড. জেফরি লং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাগুলোকে একাট্টা করে বই লিখেছেন *Evidence of the Afterlife : The Science of Near-Death Experiences* শিরোনামে। বইটি প্রকাশ করেছে বিখ্যাত প্রকাশনা-সংস্থা হারপার কলিন্স। এই বইয়ের ভূমিকায় জানা যায় *Dr. Jeffrey* একসময় নিজেই বিশ্বাস করতেন—মৃত্যুই হলো মানুষের শেষ পরিণতি। পচে-গলে

২. Pim Van Lommel, Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experiences; Chapter 2: What is a Near-Death Experience? (epub Edition, Harper-Collins e-books, May 2010)

মাটিতে মিশে যাওয়া, কিলবিল করতে থাকা ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যে পরিণত হওয়াই মানুষের চূড়ান্ত অবস্থা।

কিন্তু ১৩০০-রও বেশি *NDE* কেইস নিয়ে গবেষণা করার পর তাঁর চিন্তার বদল ঘটে। এর জন্য সময়ও লেগেছে বেশ। জন্মেছেন বিজ্ঞানীর ঘরে, নিজেও বিজ্ঞানী; এত সহজে কি আর মন বদলায়! তিনি উল্লিখিত বইতে নয় স্তরের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তাঁর মতে এ সকল প্রমাণ সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করে—মৃত্যুই শেষ নয়! মৃত্যুর পর শুরু হয় অন্য জীবন, অন্য ভুবন![৩]

NDE-এর ঘটনাগুলো বিজ্ঞানের যে অন্যতম বস্তুবাদী অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করছে তা হলো, মন বলে কিছু নেই, সবই মস্তিষ্কের নানা তরল ও বিদ্যুতের খেল। এসকল ঘটনায় দেখা যাচ্ছে মন—যেটাকে আমরা আত্মবোধ (*Consciousness*) বিবেচনা করতে পারি—তা মূলত জাগতিক মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন অস্তিত্বে বিরাজ করে (*Dualism*)। তাই যখন হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ড পরেই মস্তিষ্ক সকল সংবেদনে সাড়া দেওয়া থামিয়ে দেয়, তখনও মানুষ চারপাশের অনুভূতি পেতে পারে।[৪] যেহেতু মৃত্যুর সাথে আত্মবোধ বা মনের ধ্বংস হয় না তাই পরকালের পথে যাত্রার সীমিত প্রমাণ হতে পারে এসকল প্রমাণিত আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলো।

হুমায়ুন আজাদ বিশ্বাস করেন যে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পূর্ণ বাজে কথা; যারা এ ধরনের অনুভূতি চায়, এবং পেয়েছে বলে দাবি করে, তারা মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। (পৃ. ৯৬) অথচ নিউরোলজিস্ট ড. কেভিন নেলসন তার তিন যুগের বেশি গবেষণায় দেখেছেন—আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মানুষের বেসিক বায়োলজিক্যাল মেকআপের অংশ।[৫] আরেক গবেষক ডেভিড হে স্বীয় বিশ্লেষণের আলোকে বলেছেন, আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি বা নাই করি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমাদের জীবতত্ত্বের আবশ্যকীয় অংশ।[৬] আজাদ সাহেবের এত সাধের বিজ্ঞানের ব্যাপারীরা যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পক্ষে মত দেবেন, এটা জানলে কি উনি বিজ্ঞানকেও বাজে বলতেন?

বলাই বাহুল্য, নাস্তিক বিজ্ঞানীরা *NDE*-কে খুব অপছন্দ করেন, নানা ব্যাখ্যা

---

৩. Jeffrey Long & Paul Perry, Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death Experiences; Introduction

৪. Matt McMillen, Does Your Brain Know When You're Dead? *WebMD*, Nov. 8, 2017

৫. Dr. Kevin Nelson, The Spiritual Doorway in the Brain: A Neurologist's Search for the God Experience (Plume, 2012)

৬. John Bowker, God: A Very Short Introduction; p. 35 (Oxford University Press, 2014)

দিয়ে বাতিল করার চেষ্টা করেন; বলতে চান মৃতপ্রায় মগজ অক্সিজেনের অভাবে এসব হাবিজাবি দেখে! কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ, *NDE* ফিল্ডের সেক্যুলার বিজ্ঞানীরা তাই জানাচ্ছেন।[৭] তো নাস্তিকেরা বা গোঁড়া বিজ্ঞানীরা কেন *NDE* নিয়ে অসন্তুষ্ট? আমরা আগেই দেখেছি বিজ্ঞান পদ্ধতিগত বস্তুবাদ মেনে চলে, বস্তুজগতের কোনও ঘটনার ব্যাখ্যায় কেবল জাগতিক কারণ দাঁড় করায় (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)। আর এটাই হলো গ্রহণ করতে না চাওয়ার প্রধান কারণ, তাদের বস্তুবাদী দর্শন! বিজ্ঞানী ড. লোমেল বলেন :

> "যখন কোনও নতুন ধারণা সাধারণভাবে গৃহীত (বস্তুবাদী) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খায় না, তখন অনেক বিজ্ঞানী একে হুমকিস্বরূপ মনে করেন। তাই যখন প্রমাণলব্ধ গবেষণায় নতুন কোনও ঘটনা বা ফ্যাক্ট উঠে আসে—যা কিনা বিজ্ঞানের প্রভাবশালী (বস্তুবাদী) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে না—তখন হয় এদের অস্বীকার করা হয়, অথবা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, এমনকি বিদ্রুপও করা হয়; এতে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। (কারণ) বিজ্ঞানের ইতিহাস এমন উপাখ্যানই জানায় আমাদের। নবধারণা কদাচিৎ উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করে, সর্বদাই তারা বাধার সম্মুখীন হয়।"[৮]

তবে মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, পরকালের সামগ্রিক চিত্র হলো মূলত গায়েবের বিষয়, তাই এর প্রকৃতরূপ জানতে ওহির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে পরকালের যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তা একজন মুসলিম বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেন।

পুনরুত্থান নিয়ে ইতংবিতং

ড. আজাদ পুনরুত্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন :

> "কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে মৃতরা? যারা প'চে গেছে, বিনষ্ট হয়ে গেছে যাদের অস্থিমাংস আর অন্ত্রতন্ত্র, যারা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা কীভাবে ফিরে পাবে

---

৭. Emma Young, No Medical Explanation for Near-Death Experiences. The NewScientist, 14 December 2001

৮. Pim Van Lommel, Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experiences; Chapter 15: Some Implications of NDE Studies

তাদের শরীর? যারা হারিয়ে গেছে। সমুদ্রে, যারা গেছে বাঘভালুকের পেটে, কীভাবে পাওয়া যাবে তাদের? বলা হয় শেষবিচারের দিনে সবাইকে জাগানো হবে পার্থিব শরীরে। বলা হয় কিছুই অসম্ভব নয় বিধাতার পক্ষে, তিনি সব পারেন।" (পৃ. ১০০)

ড. আজাদের এমন জিজ্ঞাসা নতুন কিছু নয়। প্রায় ১৪৫০ বছর আগেই আরবের মুশরিকেরা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। হাতে করে নিয়ে আসা পচা হাড় চাপ দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠেছিল :

"... কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?" [সূরা ইয়াসিন, ৩৩ : ৭৮]

ড. আজাদ-সহ মক্কার তৎকালীন মুশরিকেরা এখানে মূলত কুযুক্তির অবতারণা করেছেন, যাকে বলা হয় *Fallacy of incredulity* ; অর্থাৎ কোনও বিষয় কারও মাথায় না ধরার কারণে সেটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।[১] সহজ ভাষায় বললে, চিন্তাশক্তির দৈন্যের কারণে কোনও কিছুর অস্তিত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়া, আর শিশুর মতো বলে ওঠা—এগুলো ভুয়া! এর বেশ সোজাসাপ্টা জবাব দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

"মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।" [সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৬-৬৭]

অর্থাৎ, যে স্রষ্টা অস্তিত্বহীনতা থেকে মানুষকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি পুনরায় তাকে মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করতে পারবেন না, এমনটা ভাবা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। ড. আজাদও জানেন বিধাতার পক্ষে এমন করা অসম্ভবপর কিছু নয়। কিন্তু এটা মানতে তিনি চান না। তাই হাস্যকর কুযুক্তির অবতারণা করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন :

"তিনি সব পারেন, কিন্তু একটি ছোটো সমস্যা রয়েছে; কেউ ম'রে যাওয়ার, মাটিতে মিশে যাওয়ার কোটি কোটি বছর পর, মনে করা যাক, অবিকল তাকে সৃষ্টি করা হলো; কিন্তু তখন তো সে আগের মানুষটি নয়, সে অন্য এক মানুষ,

১. Argument from incredulity, appeal to common sense, or personal incredulity, asserts that because something is so incredible or difficult to imagine, it is wrong.

বা আগের মানুষটির অবিকল নকল। একজনের পাপপুণ্যের জন্যে তার অবিকল নকলকে স্বর্গে বা নরকে পাঠানো হচ্ছে অবিকল যমজ ভাইদের একজনের পাপপুণ্যের জন্যে আরেকজনকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার মতো অন্যায়।" (পৃ. ১০০)

পরকালের শাস্তি বা পুরস্কার ইত্যাদি মানুষের পার্থিব শরীরের ওপরই কেবল নির্ভরশীল নয়। যে-কোনও মৃত প্রাণই পচে-গলে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে যায়। শাস্তির জন্য প্রয়োজন হলো রুহ। আর শরীরের ব্যাপারে বলতে হয়, জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজকের আপনি গতকালের আপনি নন। কি, অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মানবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কোষ ধ্বংস হয়, আবার তৈরি হয়। অন্ত্রের আবরণী কোষের জীবন প্রায় ৪ মিনিট মাত্র, তারপরই নতুন কোষ দ্বারা বদলে যায়; প্রতি চার মাসে রক্তের লাল কোষ (*Erythrocytes*) মরে যায়, আবার নতুন কোষ রক্তস্রোতে মুক্ত হয়; প্রতি দশ বছরে মানব দেহের পুরো চর্বি কোষ (*Fat cells*) বদলে যায়। মেডিকেলে পড়ার সময় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের কোষ নবায়ন হয় না, জন্মের পর থেকে একই রকম থাকে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম ২৫ বছর বয়সী একজন মানুষে প্রতি বছর হৃদপিণ্ডের মোট কোষের ১% নবায়ন হয়।[১০] মস্তিষ্কের কোষ (নিউরন) পর্যন্ত নবায়ন হয়; মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাস এলাকায় দৈনিক ১৪০০ করে নতুন নিউরন তৈরি হয়![১১]

এখন ১০ বছর আগে করা কোনও অপরাধের শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি যদি বলে, আমি আগের আমি নই, অনেক বদলে গেছি। সব চর্বি কোষ বদলে গেছে, লাল কোষ বদলে গেছে, অন্ত্রের একটা কোষও আগের মতো নেই, আমি একজন নতুন মানুষ তাই আমাকে শাস্তি দেওয়া মহা অন্যায়! এ কথা শুনে বিচারক কি তার শাস্তি মওকুফ করবে? কখনোই না।

কারণ এখানে বিবেচ্য হলো তার ব্যক্তিসত্তা, শরীর মুখ্য বিষয় নয়। তেমনই শাস্তি-পুরস্কারের জন্য মূল হলো ব্যক্তিসত্তা বা রুহ, শরীর একমাত্র নিয়ামক এমনটা ভাবা সঠিক নয়। তা ছাড়া এখানে আরেক কুযুক্তি হলো পুনর্ত্থিত দেহকে জমজ

---

১০. Monya Baker, Carbon dating shows humans make new heart cells. Nature, 2 April 2009

১১. Douglas Heaven, Nuclear bomb tests reveal brain regeneration in humans. The NewScientist, 7 June 2013

বলার চেষ্টা। পৃথিবীতে দুজন জমজের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, আত্মবোধ (*consciousness*) ও জীবন থাকে। ফোনের ফেসিয়াল রিকগনিশন যদিও দুজনকে আলাদা করতে পারে না, কিন্তু *DNA* টেস্ট করে ঠিকই তাদের আলাদা করা সম্ভব।[১২] অন্যদিকে পরকালের দেহ মূলত একই ব্যক্তিসত্তা, রুহ বা আত্মবোধ বহনকারী। তাই এই তুলনাও স্রেফ কুযুক্তির অবতারণা (*Fallacy of Equivocation*) ছাড়া কিছু নয়।

ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট

> "সব ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি ভয়। বহু ধর্মে বিধাতা চরম ক্রুদ্ধ ও হিংস্র; ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে থাকা ছাড়া তার আর কোনও কাজে নেই; অবিশ্বাসীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তিনি ব্যগ্র, এবং বিশ্বাসীকেও সব সময় রাখেন ভীতির মধ্যে। বিশ্বাসী কোনও উন্নত নৈতিকতাবোধ দিয়ে চালিত হয় না; সে ভয়েই করে পুণ্যকাজ, এবং থাকে সম্পূর্ণ অনুগত। ভয় আর লালসা দূষিত করে সব ধরনের নৈতিকতাকে। ধর্মীয় নৈতিকতা থেকে মানবিক নৈতিকতা অনেক উন্নত।" (পৃ. ১০০)

ড. আজাদ কেবল ভয়কে ধর্মীয় নৈতিকতার একমাত্র ভিত্তি বলতে চেয়েছেন। এই ধারণাও ইসলামের সাথে মিলে না। আল্লাহ (ﷻ) এর নামটি যে ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে (ألَه يألَه فهو مألوه) সেটার অর্থের মাঝে ভালোবাসা ও উপাসনা দুটোই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ (ﷻ) হলেন এমন একজন মহাসত্তা যিনি ভালোবাসা ও প্রশংসার হকদার; যাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণ আশা ও ভয় রাখেন। মূলত ধর্মীয় নৈতিকতার সাথে ভালোবাসা, ভয়, কৃতজ্ঞতাবোধ, আশা-ভরসা, প্রজ্ঞা সবই জড়িত।[১৩]

যারা ভালোবাসা সম্পর্কে জানেন তারা হয়তো দেখেছেন, ভালোবাসার মানুষের জন্য মানুষ কত কী করে! পছন্দের জিনিস কিনে দেওয়া, পছন্দের খাবার খাওয়ানো, পছন্দের কাজ করা, যেভাবে পছন্দ করে সেভাবে পোষাকআশাক পড়া, এমনকি অনেকে ভালোবাসার মানুষের জন্য এমন কাজও করে যা অন্যায়। এর কারণ হলো সে এই ভালোবাসাকে হারাতে ভয় পায়, চায় যে-কোনও মূল্যে অক্ষত থাকুক এই ভালোবাসা। শারীআতের পরিভাষায় ইবাদাত বলতে বোঝায়—প্রকৃত ভালোবাসার

---

১২. Jessica Hamzelou, Police can now tell identical twins apart – just melt their DNA. The NewScientist, 24 April 2015

১৩. https://islamqa.info/en/1930

ভিত্তিতে আল্লাহর সামনে একনিষ্ঠভাবে বিনয়ী হওয়া।[১৪] আল্লাহর প্রতি ভয়ের একটা কারণ হলো বান্দা চায় না, তাঁর ভালোবাসাকে অবমূল্যায়ন করা হোক।

আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা বোঝানোর জন্য একটি উপমা দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। একবার কয়েকজন বন্দীকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। বন্দীদের মধ্যে থেকে একজন নারী কেবলই অনুসন্ধানে রত ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোনও শিশুকে পাওয়ামাত্র তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে জড়িয়ে ধরে তাকে দুধপান করাতো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, এ মহিলাটি কি তার সন্তানদেরকে আগুনে ফেলতে রাজি হবে? রাসূলের সাথিরা বললেন, আল্লাহর শপথ! সে কখনোই তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সন্তানের ওপর এ মহিলাটির দয়া হতেও আল্লাহ বেশি দয়ালু![১৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের সালাতে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলিয়ে ফেলতেন। আশেপাশের মানুষেরা দেখে বলত, এত কষ্ট কেন করছেন? আপনার তো গুনাহ নেই। উত্তরে তিনি সহাস্যে বলতেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব না? তিনি রাতের সালাতে দুআ করতেন :

> "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কল্যাণমূলক কাজ করার, খারাপ কাজ বর্জন করার, অভাবীদের ভালোবাসার তৌফিক চাই; আরও চাই যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন ও আমার প্রতি রহম করেন। আর যখন আপনি কোনও কওমকে পরীক্ষায় নিপতিত করতে চান, তখন আমাকে পরীক্ষা ছাড়াই মৃত্যু দিন। আমি আপনার কাছে চাই আপনার ভালোবাসা, আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং এমন আমলের ভালোবাসা যা আমাকে আপনার ভালোবাসার নিকটে নিয়ে যাবে।"[১৬]

দ্বিতীয় নিয়ামক হলো আল্লাহর প্রজ্ঞা। যেহেতু মহান আল্লাহ (ﷻ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাই তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন কীসে মানুষের কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ। তাই তিনি যা হালাল করেছেন তাতে যেমন মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ নিহিত;

---

১৪. ইবনু তাইমিয়্যা, আল-উবুদিয়্যাহ (দাসত্বের মহিমা); পৃ. ১৮ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা : মাকতাবাতুল বায়ান, ২০১৮)

১৫. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আস-সহীহ; খণ্ড ০৬, হাদীস ৬৭২৫ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০)

১৬. সহীহ হাদীসে কুদসি, হাদীস ১৩৬ (অনুবাদ : ইসলাম হাউজ)

তেমনিভাবে তিনি যা হারাম করেছেন, তাতে মানুষের জন্য অকল্যাণ নিহিত। মানুষ তা বুঝতে পারুক বা নাই পারুক। একটি ছোট শিশু বুঝতে পারে না কেন তার মা তাকে বেশি বেশি চকলেট খেতে দিতে চায় না, কেন আগুনের কাছে যেতে দিতে চায় না, কেন ধারালো জিনিস ধরতে দিতে চায় না, কেন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বাধা দেয়; সে বুঝতে পারে না কেন তার মা বিচ্ছিরি দুধ খেতে বলে, কেন হলুদ হলুদ খিচুরি নামের জগাখিচুরি মুখে চেপে ধরে, কেন রাবারের মতো ডিম নিয়ে পিছে পিছে দৌড়ে বেড়ায়! সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ইসলামে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ সেটার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে মহান আল্লাহর (ﷻ) প্রজ্ঞা মূল্যায়ন করার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

তবে এগুলোর পাশাপাশি ভয়ও জরুরি। দেশে পুলিশ আছে, আইন আছে, এরপরও কি চুরি বন্ধ হয়? ছিঁচকে চোর থেকে শুরু করে ধূসর ভবনের রাঘব বোয়ালেরা সবাই মহাসমারোহে চুরি করছে এই সোনার দেশে। তারা কেউই পুলিশ বা আইনকে ভয় পায় না। কারণ পুলিশের একটা বড় অংশই অসৎ; আর আইন হলো ফাঁকা বুলি। যদি সৎ ও কঠোর পুলিশ এবং অনড় আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে অপরাধপ্রবণতা এমনিতেই কমে আসবে। অপরাধ-দমনে নিবৃত্তকরণ তত্ত্ব (*Deterrence theory*) এই বাস্তবতাকেই জোর দিতে চায়। সেক্যুলার গবেষকদের মতে :

> "(অপরাধ-দমন সংক্রান্ত) বইপত্র ঘেঁটে ও আমাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আমরা খুঁজে পেয়েছি যে, কোনও ব্যবস্থায় শাস্তিকে যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে শাস্তি যত কঠোর হয় অপরাধ ততই কমে আসে। নিবৃত্তকরণ তত্ত্ব আমাদের তাই বলতে চায়।"[১৭]

এক্ষেত্রে ইসলামও চায় এসকল অপরাধ থেকে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু ড. আজাদের সেটা মোটেও ভালো লাগেনি। তাচ্ছিল্যের সাথে তিনি বলেছেন, চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা বা অবিবাহিত সঙ্গমের জন্যে পাথর ছুড়ে হত্যা নীতির দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু ধর্মে একেই মনে করা হয় নৈতিকতা। (পৃ. ১০১)

প্রথমত, চুরির অপরাধে হাত কাটার কিছু শর্ত আছে। কেউ কিছু চুরি করল আর

১৭. Mendes, Silvia M., and Michael D. McDonald, Putting Severity of Punishment Back in the Deterrence Package, Policy Studies Journal, Vol. 29 , No. 4, p. 588-610 (2001)

বাছবিচার না করেই হাত কেটে দেওয়া হলো এমন বিধান ইসলামে নেই। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় এমন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে সম্পদের প্রান্তীকরণ না হয়; যাতে কাউকে চরম দারিদ্র্যে থাকা না লাগে। আর চুরিকৃত বস্তুটি যদি একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের বেশি ও দরকারী কিছু হয়, চুরি যাবার আগে জিনিসটি যদি সম্পদ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখার স্থানে রাখা হয় (খোলাস্থানে অরক্ষিতভাবে ফেলে রাখা না হয়), চুরির যদি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, চুরি যাওয়া জিনিসটির মালিক যদি দাবি করে—ইত্যাদি শর্ত বিবেচনায় চোরের হাত কাটা যায়; তা না হলে অন্য শাস্তি দেওয়া হয়। সামগ্রিক শর্ত-বিবেচনায় ইসলামের এই বিধান বাস্তবায়ন করা কঠিন; তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুরো জীবদ্দশায় হাত কাটার ঘটনা নিতান্তই কম। তা ছাড়া, শর্ত বিবেচনায় হাত কাটার বিধান থাকলে অনেক প্রাণ অকালে মরে যাওয়া থেকে রক্ষা পেত। দেখা গেছে, চোরকে তো বটেই, স্রেফ চোর সন্দেহ করেই অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে; যার মধ্যে শিশুরাও রয়েছে![১৮]

ড. আজাদ আরেকটি অভিযোগ করেছেন যে, ইসলামে নাকি অবিবাহিত সঙ্গমের জন্যে পাথর ছুড়ে হত্যা করার নীতি রয়েছে। এদিকে উনার ভাবশিষ্যদের কেউ কেউ আরও অদ্ভুত কথা বলেছেন! যেমন অভিজিৎ রায় বলেছেন, ইসলামে নাকি বেগানা নারীদের পাথর মারতে বলা হয়েছে![১৯] বেগানা অর্থ অপরিচিত! উনারা মনে করেন ইসলামে অপরিচিত নারী দেখলেই পাথর ছুড়তে বলা হয়েছে! কী সর্বনাশ!

অথচ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, কেবল বিবাহিত নর বা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়; এবং চারজনের চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা গর্ভধারণ সাব্যস্ত হয় কিংবা তাদের স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তা হলে আল্লাহর কিতাবে তাদের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যার (রজম) বিধান সত্য; অবিবাহিতদের জন্য বিধান হলো বেত্রাঘাত।[২০]

তো এত কঠিন বিধান কেন? বৃহত্তর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ক্ষতি বেছে নেওয়া। এই কঠিন বিধানের উদ্দেশ্যও মূলত মানুষকে এই অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাই দেখা গেছে যারা এই অপরাধে অনুতপ্ত হয়ে যারা রজমের শাস্তির আবেদন করেছে তাদের রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার এড়িয়ে গেছেন, তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, পাগল-উন্মাদ বলে ভাগানোর চেষ্টা করেছেন। বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, মালিকের কাছে মাফ চাও, বাকি জীবন ভালো হয়ে কাটাও।

---

১৮. https://tinyurl.com/yabfddx3

১৯. রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, 'অবিশ্বাসের দর্শন'; পৃ. ৩৫৮

২০. বুখারি, 'আস-সহীহ'; খণ্ড ১০, হাদীস ৬৩৭০-৬৩৭১

তারপরও যারা পীড়াপীড়ি করেছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে।[২১] এমন সংখ্যাও নিতান্তই নগণ্য। ইবনু কায়্যিম (ﷺ) বলেন :

> "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যিনার অভিযোগে যাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করেছেন, তারা সবাই পরিচিত ও সংখ্যায় কম। তাদের ঘটনা সংরক্ষিত ও সবার জানা। তারা হচ্ছেন—গামেদিয়্যা বংশের এক নারী, মায়েয, ওই মহিলা যিনি তার কাজের লোকের সাথে ব্যভিচার করেছেন এবং দুইজন ইয়াহূদি লোক।"[২২]

সুতরাং ইসলামে অপরাধ দমনে কয়েক স্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আল-কুরআনের অ্যাপ্রোচ বেশ কমপ্রিহেনসিভ। আল্লাহকে ভয় শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হলো খওফ (خوف)। আল-কুরআনে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে কদাচিৎ; মূলত বলা হয়েছে আল্লাহ সচেতন হতে (تقوى)। এর অর্থ আল্লাহর যা কিছুতে সন্তুষ্ট হন তা করা, ও যাতে অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বাঁচার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকা; এই চেষ্টায় মিশে থাকে হৃদয়ের সবগুলো অনুভূতি-ভালোবাসা-আশা-ভরসা-কৃতজ্ঞতাবোধ-ভয়-শ্রদ্ধা-বিনয় প্রভৃতি।

কিন্তু ড. আজাদ মনে করেন মহান আল্লাহ শুধু শাস্তি দিতে ব্যগ্র থাকেন। তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলকে উদ্ধৃত করেছেন :

> "বার্ট্র্যান্ড রাসেল নিজেকে খ্রিষ্টান বলতে অস্বীকার করেছিলেন যে-সমস্ত কারণে, তার একটি হচ্ছে নরক-ঈশ্বরের অগ্নিকুণ্ড, তার অবাধ পীড়ন সুখের এলাকা; তার মতে যে-ঈশ্বর নরকেরও ঈশ্বর, যে তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পরিকল্পনার কোনও শেষ রাখে নি, যে এতো হিংস্র, তাকে মানা যায় না। ঈশ্বরকে প্রচণ্ড শাস্তিদাতারূপে ভাবতে পারেন না রাসেল; যে এমন শাস্তি দিতে পারে, তাকে মহৎ ব'লে ভাবাও কঠিন।" (পৃ. ৩৮)

এই অংশটুকু পড়ে সাধারণ পাঠক প্রথম ধাক্কায় একটু থমকে যেতে পারেন, আসলেই তো অযথা শাস্তির জন্য এত পরিকল্পনা! কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক ইতোমধ্যেই ভ্রু-কুঞ্চিত করে বলে উঠেছেন, এটা তো কুযুক্তি (*Appeal to Disgust*)! বার্ট্রান্ড ভাবতে পারেননি তার একপেশে চিন্তার কারণে। উনি ভাবতে না পারলেই কি কিছু অপ্রমাণিত হয়ে যায়; উনার ভাবতে না পারাই কি দলিল হয়ে যায়? ড. আজাদ সুকৌশলে বলতে চেয়েছেন স্রষ্টা অন্যায়কারী, বিনা কারণে শাস্তির জন্য মঞ্চ বানিয়ে

২১. বুখারি, আস-সহীহ; খণ্ড ১০, হাদীস ৬৩৬৭
২২. ইবনু কায়্যিম, আল-তুরুক আল-হুকমিয়্যা; পৃষ্ঠা-৫৩

রেখেছেন। আসলে কি তা-ই'?

বাস্তবতা হলো এসব আবেগ ভরা উত্তেজক বক্তব্য ডাহা মিথ্যে ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ্ যদি শাস্তি দিতে ব্যগ্রই থাকতেন তা হলে যুগে যুগে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এত নবি-রাসূল পাঠানোর কী দরকার ছিল? সবাইকে পথভ্রষ্ট হতে দিতেন, তার পর মনের সুখে আগুনে পোড়াতেন! কিন্তু তিনি তা করেনি। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, ভালো-মন্দ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষক পাঠিয়েছেন। কেউ ভালো কাজ করার নিয়ত করামাত্র আল্লাহ (ﷻ) তার জন্য একটা সাওয়াব নির্ধারণ করেন; পরে সে ওই কাজ করতে পারলে পুরষ্কারস্বরূপ দশ থেকে সাতশ' গুণ বেশি সাওয়াব দেন! কিন্তু কেউ খারাপ কাজের নিয়ত করলেই তার আমলনামায় গুনাহ লিখা হয় না; যদি সে ওই অন্যায়ে লিপ্ত হয়, কেবল তখনই গুনাহ লিখা হয়, তাও শুধু একটি খারাপ কাজের জন্য একটি গুনাহ-ই লিখা হয়।[২৩] অন্যায় ত্যাগ করে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলে সে গুনাহও আবার মুছে দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রে নেকি দ্বারা বদলে দেওয়া হয়!

কোনও প্রাণই বিনা কারণে শাস্তি পাবে না, মহান আল্লাহ তাকেই শাস্তি দিবেন, যে তা পাওয়ার যোগ্য। তার পূর্বে তিনি তাঁকে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিবেন, যদি সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁর বিরুদ্ধাচারণকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয় তবে এমন অকৃতজ্ঞ ও জালিমের জন্য শাস্তির বদলে আর কীই-বা থাকতে পারে?

> "সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে : হে আমাদের রব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা এবার সৎকর্ম করব, আগে যা করতাম তা আর করব না। আল্লাহ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোনও সাহায্যকারী নেই।"
> [সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭]

তা ছাড়া পরকালে এই ব্যক্তি নিজেও স্বীকার করবে, এই করুণ অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তাকে পুনরায় ফেরত পাঠানো হোক; এবার একেবারে সাধু হয়ে যাবে! উত্তর আসবে, না, সুযোগ শেষ তোমাদের; আর ফিরে গেলে তোমরা কী করবে তা জানা আছে।

---

২৩. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আস-সহীহ; খণ্ড ০১, হাদীস ২৩৪-২৩৫

এতক্ষণের আলোচনাকে একটি পরীক্ষার হলের সাথে তুলনা করা যাক চলুন। পরীক্ষক আপনার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো করেছেন তা হলো :

- আপনার হাতে পুরোটা জীবন রয়েছে এই পরীক্ষায় পাশের জন্য

- আপনার সবলতা-দুর্বলতা বিবেচনা করে পরীক্ষাকে সাজানো হয়েছে

- পরীক্ষা চলাকালে সময়ে আপনি যদি ভুল করেন, তা হলে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে

- সঠিক উত্তরের জন্য ন্যূনতম দশ নাম্বার প্রদান করা হবে, কিন্তু ভুল উত্তরের জন্য কাটা হবে মাত্র এক নাম্বার

- পরীক্ষায় যেসকল প্রশ্ন আসবে, তার উত্তর আগে থেকেই আপনাকে সেই পরীক্ষক পাঠিয়ে দিয়েছেন

- শুধু উত্তর পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠিয়ে আপনাকে সফলতার সাথে পরীক্ষায় পাশের সকল নিয়ম শিখানোর ব্যবস্থা রেখেছেন।[২৪]

ওপরের বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমরা নিষ্ঠার সাথে চিন্তা করি চলুন। এমতাবস্থায় যদি কেউ ফেল করে, তা হলে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করার কোনও সুযোগ থাকবে কি? আল্লাহ চান আমরা তাঁর মহাস্বর্গে প্রবেশ করি, এখন এটা আমাদের বেছে নেওয়ার পালা—আমরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করব, না কি করব না।

২৪. Abu Zakariya, The Eternal Challenge: A Journey Through The Miraculous Quran; p. 24-25

সারমর্ম

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। ড. আজাদ ওপারে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন না আমাদের দুনিয়ার কাজের জবাবদিহি করতে হবে এক মহা-বিচারের মাঠে। তাই নানাবিধ অভিযোগ তোলার চেষ্টা করেছেন। এই অধায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে পরকালে অবিশ্বাস করার মনস্তত্ত্ব উন্মোচনের মাধ্যমে। মাতৃগর্ভে অহং আর মনন—এর কথোপকথন থেকে জানা যায়, ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণতা-সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে না পারার অহংকার মানুষকে পরকালে অবিশ্বাসের দিকে ক্রমান্বয়ে ঠেলে দিতে পারে।

এরপর আলোচনায় এলো *NDE*-এর অবাক করা ঘটনাগুলোর বাস্তবতা। *NDE* নিয়ে সেক্যুলার মহলে গবেষণা হয়েছে প্রচুর; এ সংক্রান্ত *পিয়ার রিভিউড* গবেষণাপত্রের সংখ্যা দুই শ-রও অধিক! মৃত্যুর নিকটবর্তী অবস্থায় অথবা প্রবল দৈহিক বা মানসিক বিপদের সময় ঘটা এসকল আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলোকে কোনও কোনও গবেষক মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করতে চান। তবে পরকালের যেহেতু ইন্দ্রিয়ের বাইরের বিষয় তাই এ সংক্রান্ত সঠিক ধারণা একমাত্র ওহি থেকেই পাওয়া সম্ভব।

পুনরুত্থান নিয়ে তোলা অভিযোগগুলোর আলোচনায় দেখা গেল, যারা এটি অস্বীকার করতে চান তাদের একটি বড় অংশ অপযুক্তির আশ্রয় নেন। অপযুক্তির মারপ্যাঁচে সত্যকে অস্বীকার করতে চান; বলাই বাহুল্য তারা বরাবরের মতোই ব্যর্থ।

এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ হলো—অপরাধ-শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনার দ্বারা। আমরা দেখলাম মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য প্রদানে বদ্ধপরিকর। মানুষ যদি কল্যাণের কাজ করে তা হলে তার প্রতিদান বেড়ে যাবে বহুগুণ; পক্ষান্তরে মন্দকাজের জন্য স্রেফ ততটুকুই শাস্তি দেওয়া হবে যতটুকু তার প্রাপ্য। আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিতে চান না, কিন্তু সে খোদার পথ ছেড়ে শাস্তির পথ বেছে নেয়, তার জন্য অসীম আঁধার ছাড়া আর কিছুই নেই।

অধ্যায় ৫

অবিশ্বাসের ভাইরাস

তপ্ত সীসা!

টেক্সাসের এক প্রাণোচ্ছল সকালের কথা। সান আন্তোনিও শহরের প্রায় ৩০ মাইল পূবে অবস্থিত সুদারল্যান্ড স্প্রিংস কমিউনিটির কিছু মানুষ রবিবারে জমা হয়েছেন ফার্স্ট ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। অন্যান্য রবিবারগুলোর মতো আজকেও তাদের উদ্দেশ্য একত্রে উপাসনা করা। ক্ষণিক পর তারা যিশুর গুণকীর্তন শুরু করলেন। যদিও যিশু অনুসারীদেরকে তাঁর গুণগান গাইতে উৎসাহ দেননি![১] কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি,[২] সে যাই হোক।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে আপাদমস্তক কালো পোশাক ও ব্যালিস্টিক ভেস্টে আবৃত এক আগন্তুক গাড়ি হাঁকিয়ে চার্চের সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে হাতে তুলে নেয় তার প্রিয় রুগার এআর-৫৫৬ রাইফেলটি। এদিকে চার্চের মানুষগুলো মন্ত্র পাঠে নিমগ্ন। ক্ষণকাল পরেই এই প্রার্থনা-সমাবেশ বিভীষিকাময় ক্ষণে পরিণত হলো। জানালার কাঁচ চুরমার করে দিয়ে একের পর এক তপ্ত সীসা উড়ে আসতে শুরু করল, মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে চারপাশ কেঁপে উঠতে লাগল। বন্দুকধারী সেই আগন্তুক প্রায় ৪৫০ রাউন্ড গুলি ছুড়ল চার্চে থাকা জনপঞ্চাশেক মানুষকে লক্ষ্য করে। মাঝে ক্ষণিকের জন্য থেমেছিল সে, রাইফেল রিলোড করার জন্য। তার রাইফেলের মাজলের সামনে যেই এসেছে, সে আর নিস্তার পায়নি। তার গুলির ধরন ছিল একেবারে মাপা, মেথোডিকাল।

প্রাথমিক তাণ্ডবের পর চার্চের দরজা দিয়ে আগন্তুক প্রবেশ করল। গির্জার আসনগুলি সে ঘুরে ঘুরে পরখ করল, আর কাকে গুলি করা যায় এই চিন্তায়। সবাই

---

১. "সমাজের একজন নেতা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর, আপনি একজন ভালো লোক। আমাকে বলুন, কী করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?' ঈসা তাঁকে বললেন, 'আমাকে ভালো বলছেন কেন? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ভালো নয়।' (লূক ১৮:১৯); আরও দেখুন : মার্ক ১০:১৭-১৮, জন ৫:৪১

২. ঈসা তাকে জবাব দিলেন, "পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে।' " (লূক ৪:৮)

তো আর চুপ করে লুকিয়ে থাকতে পারে না। যে বাচ্চাগুলো ভয়ে কেঁদে উঠছিল আগন্তুক তাদেরকেও পরপারে পাঠিয়ে দিলো, একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি! তপ্ত সীসা বুকে নিয়ে নিথর হয়ে পড়ে রইল কোমল মুখগুলো। তাদের দেহ থেকে রুধির-ধারা ক্রমে বয়ে গিয়ে রঞ্জিত করে তুলল চার্চের মেঝেকে।

মাত্র সাত মিনিটের তাণ্ডবে চার্চে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে আগন্তুক গাড়ি চালিয়ে চলে গেল উত্তরে, গুয়াডালুপ কাউন্টির দিকে। পুলিশ যখন তাকে খুঁজে পায় তখন সে মৃত, শরীরে তাজা গুলির দাগ। আত্মহত্যাকে জীবনের সমাপ্তি হিসেবে সে বেছে নিল। [৩] যেমন ভেবেছিলেন ড. আজাদ, অর্থহীন জীবনের নিরব সমাপ্তি!

টেক্সাসের ইতিহাসের নৃশংসতম এই গণহত্যা সংঘটিত হয় ৫ নভেম্বর ২০১৭। সবমিলিয়ে মারা যায় ২৬ জন মানুষ, যাদের মাঝে ৮জনই শিশু; সবচেয়ে ছোটজনের বয়স ছিল মাত্র ১ বছর! [৪]

পাঠক হয়তো এতক্ষণে ভাবছেন, এই আগন্তুক নিশ্চয় গুলি শুরু করার আগে 'আল্লাহু আকবার' বলেছিল, তার এই হত্যাকাণ্ডের কিছু সময় পরই মধ্যপ্রাচ্যের কোনও উগ্র সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করে বসেছে নিশ্চয়, যারা দায় স্বীকার করার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে বসে থাকে! আর কীভাবে জানি এই দায় স্বীকারের খবর সবার আগে পশ্চিমের মিডিয়াই খুঁজে পায়! মিডিয়া আমাদের চিন্তার ক্ষমতাকে এভাবেই কন্ডিশন করে ফেলেছে। ম্যালকম এক্স বলেছিলেন,

> "মিডিয়া হলো পৃথিবীর বুকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর সত্তা। তাদের ক্ষমতা আছে নির্দোষকে অপরাধী ও অপরাধীকে নির্দোষে পরিণত করার, এবং এটা সত্যিই এক শক্তি। কারণ, তারা জনসাধারণের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

কিন্তু বাস্তবতা হলো হত্যাকারী আগন্তুকের নাম ডেভিন প্যাট্রিক কেলি। তার পরিচিতদের থেকে জানা যায়, সে ছিল একজন মিলিট্যান্ট নাস্তিক।[৫] অনলাইনে নাস্তিকতার প্রচার করে বেড়াত সে, যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে তারা কতটা অগাচণ্ডী তা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াত। তার আচার আচরণ কারও কারও কাছে অদ্ভুত মনে হতো,

৩. Autopsy confirms Sutherland Springs church gunman died by suicide. NBC News, Jul.01.2018

৪. সিএনএন, দা টেলিগ্রাফ, দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দা ডেইলি মেইল, স্টেইটসমেন

৫. Max Jaeger, Texas church shooter was a militant atheist. New York Post, November 6, 2017

তবে পাগল ছিল না সে, সর্বদা নাস্তিকতার সমর্থনে নানা পোস্ট দিয়ে বেড়াত।[৬]

কেলি গাড়ি চালিয়ে কোনও শপিং মল, পার্ক বা কোনও সমাবেশে গিয়েও গুলি চালাতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি, বরং উপাসনালয়ে গিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। কেন? অথচ পশ্চিমে বর্বর ধর্ম হিসেবে পরিচিত ইসলামের শিক্ষা হলো, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও যেন উপাসনালয় ও তাতে ধ্যানমগ্ন সাধকদের হত্যা করা না হয়।[৭]

এই ঘটনার কিছুকাল পরই ডেভিন প্যাট্রিক কেইলিকে নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়। সে পাগল, আজব স্বভাবে, ক্রিপি, উইয়ার্ড ইত্যাদি প্রমাণে ওঠে-পড়ে লাগে মিডিয়া। লোকটা শ্বেতাঙ্গ আর নাস্তিক না হলে এতক্ষণে টেররিস্ট-টেররিস্ট বুলিতে মিডিয়া বাকবাকুম করে উঠত। যেভাবে হোক তার এই গণহত্যাকে তার বর্ণ ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে দেখা যায় মিডিয়াতে। কিন্তু মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে যে রক্তের মহাসাগরে উথলে-ওঠা উত্তাল ঢেউয়ে আকাশ ঢাকা পড়ে যায় তা আমরা কজন জানি?

রক্তাক্ত প্রান্তর

> "যে-কোনও নির্বোধের পক্ষে ধার্মিক হওয়া সহজ, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ও মানবিক ব্যক্তিই হতে পারে নাস্তিক। নাস্তিক হত্যা আর ধ্বংস করে না; কিন্তু ধার্মিক সব সময় হত্যা ও ধ্বংসের জন্যে ব্যগ্র থাকে; তারা ইতিহাসের পাতাকে যুগে যুগে রক্তাক্ত করেছে। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে অসংখ্য সন্ত, যারা ঠান্ডা মস্তিষ্কের হত্যাকারী। নাস্তিক চায় মানুষের চেতনাকে বদলে দিতে, মানুষকে বিকশিত করতে; আর ধার্মিক চায় মানুষের চেতনাকে নষ্ট করতে, মানুষকে রুদ্ধ করতে। ধার্মিকদের নৈতিকতাবোধ খুবই শোচনীয়।" (পৃ. ৭৮)

ড. আজাদ নিজেকে, নিজের অবিশ্বাসকে উত্তম বানানোর ধান্দায় যে কটা ফালতু প্যাঁচাল পেড়েছেন, তার মধ্যে এই প্যারা অন্যতম। উনার কল্পিত জগৎ থেকে বাস্তবে এসে ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে দেখলে খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা স্রষ্টার

---

৬. Jenny Stanton, Former classmates say Texas gunman was an 'outcast' who 'preached his atheism' online before killing 26 in the state's worst ever mass shooting. The Daily Mail, 6 November 2017

৭. Qasim Rashid, Prophet Muhammad's Rules of War. The Daily Beast, 20 November 2012

অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি, অবিশ্বাসকে নিজেদের দর্শন হিসেবে বেছে নিয়েছে; তাদের আগ্রাসনে ইতিহাসের বটবৃক্ষের পাতা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বারবার। সে রক্ত চুইয়ে পড়ে কালান্তরে সৃষ্টি হয়েছে রক্তের গঙ্গা, টকটকে লাল রক্তে ভেসে গিয়েছে অজস্র প্রান্তর। এমনই কজনের নমুনা দেখি চলুন।

মাও সেতুং

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা চালানো মানুষের তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে আছে যে নাস্তিক-সাম্যবাদী, তিনি হলেন মাও সেতুং, যাকে চেয়ারম্যান মাও বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি চীনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৮] তার বর্বর শাসনকালে প্রায় দশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয় তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে। তার বিরোধিতার জন্য অসংখ্য লোককে কারাবরণ করতে বাধ্য করা হয়।

মাও গৃহীত *The Great Leap Forward* নামের গোঁড়া নীতির কারণে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।[৯] ঐতিহাসিক ফ্রাংক ডিকোটার এর মতে—এর ফলে নিহতের সংখ্যা ৪৫ মিলিয়ন![১০] আরেক চীনা ঐতিহাসিক ইউ জিগুয়াং-এর বিশ বছরের গবেষণা অনুযায়ী এই নিহতের সংখ্যা আনুমানিক ৫৫ মিলিয়ন![১১] সবমিলিয়ে মাওয়ের কারণে নিহত মানুষের সংখ্যা ৭০ মিলিয়ন (৭ কোটি) পর্যন্ত গড়ায়।[১২] যেই মাও এর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—হয় হত্যা করা হয়েছে, নতুবা কারাবাসে মৃত্যু হয়েছে, কিংবা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে মারা গেছে। [১৩]

আজও সেই গণচীন নাস্তিকতার করাল গ্রাস থেকে বেরুতে পারেনি। ড. আজাদ দাবি করেছেন, বিশ্বাসীরা নাকি কাউকে বিশ্বাসের বাইরে থাকতে দিতে চায় না (পৃ.

---

৮. Britannica Concise Encyclopedia, p. 1189

৯. Ilya Somin, Remembering the biggest mass murder in the history of the world. The Washington Post, August 3, 2016.

১০. Frank Dikötter, Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962; Part 06, Chapter 37: The Final Tally (Epub Edition, Walker & Company, 2011)

১১. Philippe Grangereau, La Chine creuse ses trous de mémoire. Liberation, 17 Jun, 2011. Available at: http://www.liberation.fr/planete/2011/06/17/la-chine-creuse-ses-trous-de-memoire_743211

১২. Jonathan Fenby, Modern China: The Fall and Rise of a Great Power, 1850 to the Present. Ecco Press. p. 351 (1st US Edition, HarperCollins, 2008)

১৩. Lee Edwards, Ph.D. The Legacy of Mao Zedong is Mass Murder. The Heritage Foundation, Feb 2nd, 2010

২২)। কিন্তু চীনের নাস্তিক সরকার কাউকে বিশ্বাসের ভেতর থাকতে দিতে চাচ্ছে না, যেমনটা দিতে চায়নি মাও, আর মাওয়ের অনুপ্রেরণা স্টালিন! চীনের সরকার আইন করে নাস্তিকতাকে চাপিয়ে দিয়েছে। প্রায় ৯০ মিলিয়ন পার্টি মেম্বারকে বলা হয়েছে, হয় ধর্ম ছাড়ো, অথবা শাস্তির সম্মুখীন হও! অবশ্যই তাদের মার্ক্সবাদী নাস্তিক হতে হবে, নাহলে রক্ষা নেই![১৪]

পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের লোকদের ওপর চালানো হচ্ছে অত্যাচার। বিশেষ করে জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে বহুকাল ধরে। ধর্মীয় আনুগত্যকে তারা নাস্তিক্যবাদী সরকারের প্রতি আনুগত্যে বদলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। জিনজিয়াং প্রদেশে ১৮ বছরের নিচের কেউই মাসজিদে যেতে পারে না। তা ছাড়া সেখানে অনেক মাসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বাকি মাসজিদগুলোতে চীনা পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে, বলা হয়েছে ইসলামের ধর্মগ্রন্থের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার করতে।[১৫]

জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিমদের রমাদানে সাওম পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, বলা হয়েছে কাউকে সাওমরত অবস্থায় পাওয়া গেলে দেখে নেওয়া হবে।[১৬] সেখানে কাউকে সাওমরত পাওয়া গেলে নাস্তিক্যবাদী সরকারের দালালেরা তাদের জোর করে খাইয়ে দেয়, সাওম পালনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। আল-কুরআন শিক্ষার ক্লাস থেকে বাচ্চাদের ব্যান করা হয়েছে, জায়নামাজ ও আল-কুরআনের মুসহাফ সরকারের বাহিনীর হাতে হস্তান্তরের হুমকি দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কঠোর শাস্তির হুশিয়ারি জানানো হয়েছে।[১৭]

সেখানে বোরকা, মাথায় কাপড় দেওয়া ও লম্বা দাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাটে লম্বা জামা পরিহিত দেখলে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে।[১৮] এমনকি মুহাম্মাদ নাম পর্যন্ত রাখার অনুমতি নেই, কেউ এই নাম

---

১৪. Neelakantan S. " 'Give up religion or face punishment,' says China's Communist Party to its members." Times of India 8 Sep. 2017

১৫. China asks mosques to raise national flag. The Hindu, May 21, 2018.

১৬. China bans Ramadan observance in Muslim region. The Times of Israel, 1 June 2017

১৭. Jon Sharman, Muslims in China say they are being told to hand over Qurans or face 'harsh punishments'. The Telegraph, 29 September 2017.

১৮. Nicola Smith, Chinese authorities accused of cutting Uighur dresses in latest crackdown on Muslim minority. The Telegraph, 17 July 2018

রাখলে তারা স্কুল ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবে।[১৯]

প্রায় ১০ লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিমদের ধর্ম থেকে সরিয়ে নাস্তিকতার পথে আনতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রি-ইডুকেশান ক্যাম্পে বন্দি করা হয়েছে।[২০] আমরা যখন দুপুর-রাতে নানা মজাদার খাওয়া মুখে তুলতে ব্যস্ত, তখন এই ক্যাম্পগুলোতে তাদের জোর করে মদ ও শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে, অথবা দিনভর অভুক্ত রাখা হচ্ছে।[২১] জঙ্গি-দমনের নাম করে তারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমের ওপর সকল ক্ষেত্রে নির্মম আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

জোসেফ স্টালিন

মাও সেতুং এর অনুপ্রেরণা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম পুরোধা, নাস্তিক ও প্রবল ধর্মবিদ্বেষী আরেক গণহত্যাকারী হলেন রাশিয়ার জোসেফ স্টালিন। বলশেভিক বিপ্লবের পর চরম গোঁড়া নাস্তিকরা রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে। ধর্মের বিরুদ্ধে তারা অত্যন্ত কঠোর নীতি প্রয়োগ করতে থাকে,[২২] এবং ধর্মের স্থানে *বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতা (Scientific Atheism)* প্রচার করতে শুরু করে।

তাদের এই অত্যাচারের পথ সুগম করতে সোভিয়েতের গণমাধ্যমগুলোতে সরাসরি বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়ানো হতো।[২৩] ধর্মবিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়াতে নানা সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচার করা হতো, যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসীদের ওপর চালানো হত্যা, নির্যাতনের পক্ষে জনসমর্থন জোগানো। [২৪] ধর্ম নামক কুসংস্কার থেকে মুক্তি ও বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতার প্রচারে ধর্মীয় অনুসারীদের হত্যায় মার্ক্সিস্ট শাসকরা যা করেছে তার নজির দ্বিতীয়টি মেলা ভার।[২৫]

---

১৯. The extraordinary ways in which China humiliates Muslims. The Economist, May 4th 2017

২০. The Uighur Muslim crisis is worse than you think, The New Arab, 9 July, 2018

২১. Muslims forced to drink alcohol and eat pork in China's 're-education' camps, former inmate claims. The Telegraph, 18 May 2018

২২. James von Geldern, Antireligious Propaganda. Seventeen Moments In Soviet History, Availabe at: http://soviethistory.msu.edu/1924-2/antireligious-propaganda

২৩. Dimitry V. Pospielovsky. A History of Soviet Atheism in Theory, and Practice, and the Believer; vol 2, p. 36-37 (London: The Macmillan Press Ltd.,1988)

২৪. D.V. Pospielovsky. A History of Soviet Atheism in Theory, and Practice, and the Believer; vol 1, p. 37-38 (New York: St Martin's Press, Inc.,1987)

২৫. Christopher Marsh, Religion and The State in Russia and China: Suppression, Survival, and Revival; p. 02 (New York: The Continuum Books, 2011)

এমন পরিবেশে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আরোহণ করেন গোঁড়া নাস্তিক স্টালিন। শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মবিরোধী প্রপাগান্ডা, ধর্মবিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা তিনি নাস্তিকতাকে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যান। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তিনি বর্বরোচিত-রক্তাক্ত হামলা চালিয়ে যান ধর্মে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। খ্রিষ্টানধর্ম, ইয়াহূদিধর্ম, ইসলাম—চরম নির্যাতনের মুখে পড়ে। ধর্মগুরুদের হত্যা করা হয়, নারী সাধকদের ধর্ষণ করা হয়, অসংখ্য মাসজিদ, চার্চ, সিনাগগ, মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়, ধ্বংস করা হয় বা জাদুঘরে পরিণত করা হয়। বেইলর ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিদ্যার সহকারী অধ্যাপক পল ফ্রোয়েস *Journal for the Scientific Study of Religion* এ লিখেন :

> "সোভিয়েত ইউনিয়নের নাস্তিকেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক এই দলটি ধ্বংস করেছে অগণিত চার্চ, মসজিদ ও মন্দির; হত্যা করেছে অসংখ্য ধর্মগুরুকে; স্কুলে ও মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্মবিরোধী প্রোপাগান্ডার বন্যা বইয়ে দিয়েছে; এবং *বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতা* নামের বিশ্বাস-ব্যবস্থার প্রচলন করেছে, যা পূর্ণ ছিল নানা নাস্তিকীয় আচার, ধর্মত্যাগকারীগণ ও দুনিয়াবি মুক্তির প্রতিজ্ঞার দ্বারা।"[২৬]

স্টালিন তার লক্ষ্য অর্জনের পথে যাকে প্রতিবন্ধকতা মনে করেছেন, তাকেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। গণহত্যা, চরম নির্যাতন, নির্বাসন, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরি প্রভৃতির ফলে তার কারণে নিহতের সংখ্যা ৬০ মিলিয়ন (৬ কোটি) পর্যন্ত গড়ায়। স্টালিনের অনুপ্রেরণা লেনিনও কম যাননি, প্রায় ৪ মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর কারণ তিনি।[২৭]

অন্যান্যরা

হাই স্কুলের এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে ফেল মারা নাস্তিক শাসক পল পট ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষমতা দখলের পর ত্রাস ও নৈরাজ্যের ডামাডোল বাজিয়ে তোলে। তার সময়ে ১.৫-২ মিলিয়ন ক্যাম্বোডিয়ার জনগণ ক্ষুধা, রোগ, হত্যা ও অতিরিক্ত কাজের বোঝায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।[২৮]

আলবেনিয়ার শাসক নাস্তিক (মুরতাদ) আনোয়ার হোজ্জা ইউরোপের একমাত্র

---

২৬. Paul Froese, Forced Secularization in Soviet Russia: Why an Atheistic Monopoly Failed. Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 43, issue 1, p. 35 (2004)

২৭. বিস্তারিত দেখুন: R.J. Rummel, Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917 (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1996)

২৮. www.history.com/topics/pol-pot

মুসলিম দেশ আলবেনিয়ার শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে বিশ্বের প্রথম নাস্তিক দেশ হিসেবে আলবেনিয়াকে সরকারিভাবে ঘোষণা দেন। তার সরকার স্কুলে নাস্তিকতার প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নাস্তিকতাকে অফিশিয়াল পলিসি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের বিস্তারে নির্বিচারে কারাবন্দী, হত্যা ও নির্বাসনে পাঠানো হয়। মাসজিদ, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তার আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৯] ৪১ বছর শাসন শেষে কারাবন্দী ও হত্যার সংখ্যা প্রায় লাখ ছাড়িয়েছে।[৩০]

সুযোগের অভাবে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। এটাই হলো বাস্তবতা। মুখে স্বাধীনতার বুলি ছোটানো নাস্তিকেরা যখনই ক্ষমতার আসনে উঠেছে, তখনই নজিরবিহীন নৃশংসতায় রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। নাস্তিকতা ভিত্তিক দর্শনের অনুসারী নেতারা যুদ্ধ ও গণহত্যার খেলায় মেতে অসংখ্য মানুষকে নির্মম মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত আলোচিত গ্রন্থ *The Black Book of Communsim* অনুযায়ী নাস্তিকতা-সমাজতন্ত্র ভিত্তিক সরকার কেবল বিংশ শতকেই ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।[৩১]

সেক্যুলারিজম

নাস্তিকতা এমন এক বিশ্বাস-ব্যবস্থা, যার রয়েছে নিজস্ব দর্শন (দার্শনিক বস্তুবাদ), নৈতিকতা (আপেক্ষিক নৈতিকতা), সামাজব্যবস্থা (সোশিয়াল ডারউইনিজম) ও রাজনৈতিকব্যবস্থা (সেক্যুলারিজম)। অনেকে সেক্যুলারিজম-এর অর্থ করেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। যা সম্পূর্ণ ভুল ও প্রতারণামূলক অনুবাদ। সেক্যুলার শব্দের সঠিক অর্থ—ধর্মমুক্ত, ধর্মহীন, ইহজাগতিক; রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হবে না মতে বিশ্বাসী ইত্যাদি।[৩২]

হুমায়ুন আজাদ তনয়া, সাহিত্যিক মৌলি আজাদের স্মৃতিতে পাওয়া যায়, ড.

২৯. Enver Hoxha, Encyclopaedia Britannica Online. Availabe at: https://www.britannica.com/biography/Enver-Hoxha

৩০. Andy McSmith, Enver Hoxha: Albanian dictator quoted by Jeremy Corbyn killed up to 100,000 of his own citizens. The Independent, 9 December 2015.

৩১. Stephane Courtois, et. al., The Black Book of Communism: Crime, Terror, Represssion; p. 04 (Cambridge: Harvard University Press, 1999)

৩২. বাংলা একাডেমি ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি, পৃ. ৬৮৯ (জানুয়ারি ২০১২), ক্যামব্রিজ ডিকশনারি: https://en.ox forddictionaries.com/definition/secular

আজাদ দিনরাত সেক্যুলার আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন।[৩৩] নাস্তিকরা তো বটেই, অনেক নামধারী মুসলিমকেও সেক্যুলারিজমের পক্ষে সাফাই গাইতে দেখা যায়। ভাবখানা এমন রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করলেই শান্তির সুবাতাস বয়ে যাবে, আর কোনও যুদ্ধ, হানাহানি, হত্যাযজ্ঞ হবে না। আসলেই কি তাই?

আচ্ছা, ১ম বিশ্বযুদ্ধ (মৃত ১৫ মিলিয়ন) কোন ধর্মের কারণে হয়েছিল বলুন তো? আচ্ছা ওটা বাদ দিন নাহয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধ (মৃত ৫৫ মিলিয়ন) কোন ধর্মের কারণে হয়েছিল? হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা কোন ধর্মের কারণে ফেলা হয়েছিল? চীনের গৃহযুদ্ধ (মৃত ২.৫ মিলিয়ন), কঙ্গো ফ্রি স্টেট (মৃত ৮ মিলিয়ন), কোরিয়ান যুদ্ধ (মৃত ২.৮ মিলিয়ন), ২য় ইন্দোচীন যুদ্ধ (মৃত ৩.৫ মিলিয়ন) ইত্যাদি। এভাবে লিখতে থাকলে কয়েক পাতা ভরে যাবে![৩৪] আচ্ছা এই যুদ্ধগুলো তো ধর্মের কারণে হয়েছিল, নাকি? এটা কারও অজানা নয়, এই সকল যুদ্ধ হয়েছিল সেক্যুলার কারণে, জাগতিক কারণে; ধর্মের কারণে নয়।

পশ্চিম নিয়ে মোহগ্রস্থ ড. আজাদ বলেছেন, বিশশতক বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু এতে নাকি এটি মরুভূমি হয়ে ওঠেনি! হয়ে উঠেছে সৎ, এর থেকে সৎ শতাব্দি নাকি আর নেই! কারণ আগের সব শতক নাকি বিশ্বাসের দ্বারা আক্রান্ত। অতীতের দিকে তাকিয়ে তিনি বিশশতকের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনও শতক নাকি দেখতে পান না। উনার মতে, অন্য কোনও শতক এর চেয়ে বেশি বাসযোগ্য হতো না! (পৃ. ৩২) কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! কতটা অন্ধ হলে মানুষ এমনটা বলতে পারে! তিনি বলেছেন,

> "দুটি মহাযুদ্ধ ও বহু রোগে আক্রান্ত বিশশতক, আমাকে যা দিয়েছে, তা আর কোনও শতক দিতে পারতো না।"

স্রেফ দুটি মহাযুদ্ধ! আর কোনও যুদ্ধ হয়নি এই শতকে! কী দিয়েছে এই শতক উনাকে, বিশ্বাসহীনতা? স্রেফ বিশ্বাসহীনতার জন্য এত কোটি কোটি প্রাণ, এত কান্না, এত হত্যা, এত রক্ত তিনি মেনে নিয়েছেন! গবেষকদের মতে বিশ্বাস বাদ দিয়ে এই শতক মানব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত শতকে পরিণত হয়েছে।[৩৫] ড. আজাদ দাবি

৩৩. মৌলি আজাদ, আমার বাবা হুমায়ুন আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই, ২০১৫ [http://archive.is/ieebH]

৩৪. আরও দেখুন: David Berlinski, The Devil's Delution: Athesim & It's Scientific Pretentions; p. 22-24 (New York: Basic Books, 2009)

৩৫. Niall Ferguson, The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West (Penguin Publishing Group, 2012)

করেছেন, ধর্ম নাকি মানবপ্রণিত ও বেশ সন্ত্রাসবাদী ব্যাপার। (পৃ. ৭৭) কিন্তু বাস্তবতা কি তাই বলে? *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার* অনুযায়ী মানব ইতিহাসে সংঘটিত হওয়া ১৭৬৩ টি যুদ্ধের মাত্র ১২৩ টি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ মাত্র ৭ শতাংশ![৩৬]

বিশশতকের সেক্যুলার যুদ্ধে নিহতের সংখ্যাই প্রায় ৮৭.৫ মিলিয়ন! সামগ্রিক মৃত্যুর তালিকা করলে তা প্রায় ১৭৫ মিলিয়নে পৌঁছবে![৩৭] অথচ তারপরও এই শতক উনার কাছে উত্তম! কোনও সুস্থ মানুষ এমনটা বলবে কখনও?

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন ধর্ম মানুষকে নিজের জীবনধারণ করতে দেয় না, বাধ্য করে বিশেষ ব্যক্তি বা গোত্রের পরিকল্পিত জীবন-যাপন করতে (পৃ. ৯৬)। বড় আশ্চর্য রকম বাজে কথা! আচ্ছা, সেক্যুলার সমাজে কোনও আইন নেই নাকি? ওখানে কেউ চাইলেই যা খুশি করতে পারে? আইন ছাড়া কোনও সমাজ আছে আদৌ? আর যে সেক্যুলারিজমের ধোঁয়া তুলে ধর্মকে খাটো করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা মনে হয় খুব স্বাধীনতা দেয়? ইউরোপের অধিকাংশ দেশে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে? কেন? সামান্য কাপড় পড়ারও অধিকার নেই মানুষের? কয়টা অপরাধ হয় বোরকা পড়ে? ওদের নগ্ন থাকার অধিকার আছে, কিন্তু কাপড় পড়ার নেই?

আহা! কী স্বাধীনতা! সেক্যুলার ফ্রান্সের রাজশহর প্যারিসে হালাল সুপারমার্কেট বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে কোর্ট, কারণ সেখানে শূকরের মাংস বা মদ বিক্রি করা হয় না! মালিককে ৪০০০ ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে![৩৮] এদেশে হিজাব শুধু নিষিদ্ধই করা হয়নি, পড়লে জরিমানারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে চীনে হালাল খাদ্যের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু করেছে নাস্তিক সরকার। অন্যান্য অত্যাচারের কথা তো আগেই আলোচনা করা হলো।

সোশিয়াল ডারউইনিজম

"এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করতে হবে। যে পৃথিবীতে নিরন্তর সংগ্রামই জীবনের নীতি ও নিয়ম, সেই পৃথিবীতে কেউ যদি লড়াই করতে না চায়,

---

৩৬. Bruce Sheiman, An Atheist Defends Religion: Why Humanity is Better Off with Religion than Without It; p. 117 (Alpha Books, 2009)

৩৭. Zbigniew Brzezinski, Out of Control: Global Termoil on the Eve of the 21st Century (Simon and Schuster, November 30, 2010)

৩৮. Samuel Osborne, France: Court orders halal supermarket in Paris to close because it does not sell pork or wine. The Indpendent, 5 December 2017

তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই।"

কেউ হয়তো ভাবছেন, কে যেন বাদ পড়ল নাস্তিকদের তালিকা থেকে? ও, হ্যাঁ, অ্যাডলফ হিটলার; জার্মানির শাসক ছিল বিংশ শতকের শুরুর দিকে (১৯৩৩-১৯৪৫)। এক নির্মম-নিষ্ঠুর ঠান্ডা-মাথার খুনী! যার কারণে শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ; যার কারণে ৬ মিলিয়ন ইয়াহূদিদের হত্যা করা হয়, গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারা হয়; প্রায় ৪ মিলিয়ন অন্যান্য ধর্মের মানুষকে হত্যা করা হয়। ওপরের উক্তিটি হিটলার সাহেবের আলোচিত আত্মজীবনী *মাইন ক্যাম্ফ* থেকে নেওয়া।

হিটলারের বিশ্বাস নিয়ে জলঘোলা হয়েছে অনেক। নাস্তিকেরা বলে হিটলার খ্রিষ্টান ছিল, সুতরাং দোষ হলো ধর্মের। অন্যদিকে আস্তিকেরা বিশেষ করে খ্রিষ্টানরা বলতে চায় হিটলার নাস্তিক ছিল। কিন্তু আসলে সে না ছিল নাস্তিক, আর নাই-বা খ্রিষ্টান। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত *Hitler's Religion: The Twisted Beliefs that Drove the Third Reich* গ্রন্থে খ্যাতনামা জার্মান ঐতিহাসিক রিচার্ড ওয়েইকার্ট প্রমাণ দেখিয়েছেন, হিটলার মূলত প্যানথিইস্ট ছিল অর্থাৎ প্রকৃতিকেই খোদা ভাবত সে।[৩৯]

হিটলার ভাবত নৈতিকতার মানদণ্ড হলো প্রাকৃতিক নিয়মাবলী; বিশেষ করে ডারউইনিয় চিন্তাধারার নৈতিকতা হিটলারের মাঝে শেকড় গেঁড়ে ছিল (সোশিয়াল ডারউইনিজম)। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বানর জাতীয় প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হয়েছে মনে করা হয়। *হোমো স্যাপিয়েন্স* (মূলত ককেশিয়ান) আবির্ভাবের আগের বিভিন্ন ধাপগুলো *সাবহিউম্যান* বা আদিমানব (*Savage*) হিসেবে গণ্য করে প্রচার করেন আর্নেস্ট হেকেল। আদিমানবদের নিধন মূলত মানবের বিবর্তন ও বিকাশের জন্য উপকারী মত দেন তিনি। এর পক্ষে সমর্থন দেন খোদ ডারউইন-সহ অনেকেই![৪০] এখান থেকে জন্ম হয় বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের! পশ্চিমা বিদ্যাপীঠের অধিকাংশ পণ্ডিত তৎকালীন মূলধারার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চাইতেন সাদারা আফ্রিকান বা ইন্ডিয়ানদের চেয়ে অগ্রগণ্য।[৪১]

যেহেতু বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী বেঁচে থাকার সংগ্রামে যোগ্যতরের জয় হবে, তাই

৩৯. Richard Weikart, Hitler's Religion: The Twisted Beliefs that Drove the Third Reich (Regnery History, 2016)

৪০. Richard Weikart, Hitler's Ethics: The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress; p. 58-59 (Palgrave Macmillan, 2009)

৪১. Yuval Noah Harari, Sapience: A Bief Hstory of Humankind; p 259 (Vintage Books, 2014)

ক্রমাগত টিকে থাকার সংগ্রামে দুর্বলেরা লুপ্ত হতে থাকবে, তাদের জীবনাচার সীমিত হয়ে যেতে থাকবে; অন্যদিকে সবলেরা টিকে থাকার লড়াইয়ে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে দুর্বলদের ওপর কর্তৃত্ব করবে।[৪২] এর অনিবার্য পরিণতি হলো, আদিমানবদের ক্রমান্বয় লুপ্তি। এটাই প্রকৃতির নিয়ম! ডারউইন স্বীয় গ্রন্থে বলেন :

"ভবিষ্যতে খুব বেশি দিন নয়, হয়তো কয়েক শতক পর; বিশ্বব্যাপী সভ্য মানুষেরা যে আদিমানদের নিশ্চিহ্ন করে তাদের স্থান দখল করবে, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।"[৪৩]

হিটলারের আত্মজীবনী *মাইন ক্যাম্ফ* (আমার সংগ্রাম) এর *Nation and Race* (বর্ণ ও জনতা) অধ্যায়ে শুরুতেই দুর্বল-সবলের সংগ্রাম বিষয়ক আলোচনা বিদ্যমান।[৪৪] হিটলার বিশ্বাস করতেন জার্মান জাতির প্রভাব অনার্যদের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর্য জার্মান জাতির টিকে থাকা নির্ভর করবে এর জিনগত বিশুদ্ধতার ওপর। সে লক্ষ্যে একদিকে তিনি জার্মান ছাড়া অন্যান্যদের অনার্য জাতি, নিচু জাতি মনে করে টার্গেট করা শুরু করেন।[৪৫]

অন্যদিকে বিশুদ্ধ জার্মান জাতের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে *Lebensborn* প্রোজেক্ট শুরু করা হয় যেখানে জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ জার্মান মহিলারা নাৎসি অফিসারদের সাথে সঙ্গম শুরু করে বিশুদ্ধ জার্মান বাচ্চা পাওয়ার জন্য। বলাই বাহুল্য, এসকল নারীদের অধিকাংশই ছিল অবিবাহিত।[৪৬]

Lebensborn প্রোজেক্টের লোগো

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের এই নৃশংসতম গণহত্যার পিছে ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে পাওয়া ধারণা। এই ধারণা হত্যার পিছে ইন্ধন জুগিয়েছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ও স্বনামখ্যাত ইতিহাসবিদ

---

৪২. Social Darwinism, Encyclopaedia Britannica Online. Oct 5, 2018

৪৩. Charles Darwin, The Descent of Man; vol. 01, p. 201 (Princeton University Press, 1981)

৪৪. অ্যাডলফ হিটলার, মাইন ক্যাম্ফ; পৃ. ২১৭-২৪২ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা: দ্য স্কাই পাবলিশার্স, ২০১৩)

৪৫. Social Darwinism, History.com, Available at: https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism

৪৬. The woman who gave birth for Hitler, History Extra: The official website for BBC History Magazine and BBC World Histories Magazine, July 30, 2018

জ্যাকোয়েস বারজুন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ডারউইনিজমের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন :

> "১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মাঝে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধবাজেরা চাচ্ছিল যুদ্ধোপকরণ। যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দল চাচ্ছিল নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, রাজতন্ত্রবাদীরা চাচ্ছিল অনগ্রসর গোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে, সমাজতন্ত্রীরা চাচ্ছিল ক্ষমতা দখল করতে, বর্ণবাদীরা চাচ্ছিল বহিরাগতদের বের করে দিতে। এদের সকলেই ব্যর্থ হওয়ার সময় বা তারও আগে থেকে ডারউইন ও স্পেনসারের মত নিজের পক্ষে টানত... (তাঁদের মতে) যেহেতু কোনও বর্ণ (ও বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব) জীবিজ্ঞানের বিষয়, সেহেতু মানব সমাজের সাথে এটি সম্পর্কিত। তাই এটাই ডারউইনবাদ।"[৪৭]

নাস্তিক বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানী রবার্ট রাইট এই বাস্তবতা স্বীকার করে লিখেছেন,

> "মানুষের ওপর বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগের ইতিহাসটি দীর্ঘ ও মূলত নোংরা। এই (উনবিংশ) শতকের বদলের সময় এটি রাজনৈতিক দর্শনের সাথে মিশে গিয়ে এক অস্পষ্ট আইডিওলজির জন্ম দেয়, যা সোশিয়াল ডারউইনিজম নামে পরিচিত হয়। আর এই আদর্শ নিয়ে উন্মত্ত খেলায় মেতে ওঠে বর্ণবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সবচেয়ে নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর লোকেরা।"[৪৮]

ইউজেনিক্স

ইউজেনিক্স নামটার সাথে আমরা প্রায় কেউই পরিচিত নই; এটি মূলত সোশিয়াল ডারউইনিজমের ফসল। মানব গোষ্ঠীর বংশগত (*Genetic*) গুণের উন্নতির জন্য প্রজননের পরিকল্পিত পদক্ষেপ হলো ইউজেনিক্স। এই নামটি ডারউইনের কাজিন স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের দেওয়া, যিনি ডারউইনের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল জীবন সংগ্রামে অনুকূল গোত্র বা বংশ, অপেক্ষাকৃত কম অনুকুল গোত্র বা বংশের ওপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করবে। সুপরিচিত *সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট*

---

৪৭. Jacques Barzun, Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage; p. 94-95 (The University of Chicago Press, 2nd Edition 1981)

৪৮. Robert Wright, The Moral Animal: Whe We Are The Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology; Introduction (epub edition, Vintage Books, 1995)

আদর্শের প্রভাবে ইউজেনিক্স ১৯০০ সালের শুরু থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়।[৪৯]

নাৎসি জার্মানির *Lebensborn* প্রজেক্টের প্রেরণাই ছিল এই ইউজেনিক্স। জিনগত বিশুদ্ধতার ধোঁয়া তুলে জার্মানি-সহ পশ্চিমের আরও অনেক দেশে অসংখ্য মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়, যাতে করে তারা বিশুদ্ধ জাতকে কলুষিত করতে না পারে। যেমন, জার্মানিতে চার লক্ষ নারী-পুরুষ, সুইডেনে ৬৩০০০ মানুষ (যাদের অধিকাংশই নারী), জাপানে আট লক্ষাধিক নারী-পুরুষ, ফিনল্যান্ডে ১১০০০ নারী ইত্যাদি।[৫০] আর চীনে যে কি পরিমাণ বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে তা কল্পনারও বাইরে, শুধু ১৯৮৩ সালেই ২ কোটিরও বেশি মানুষ এই আগ্রাসনের শিকার হয়েছে![৫১]

এই ইউজেনিক্সের ধারণা থেকে পরবর্তী কালে পরিবার পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়। প্রতিভাবান গণিতবিদ কার্ল পিয়ারসন মনে করতেন গরিবদের উচ্চ জন্মহার সভ্যতার প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং উচ্চা বর্ণকে অবশ্যই নিম্ন বর্ণের জায়গা দখল করতে হবে। [৪৯] কালক্রমে এমন ধারণা বেড়ে উঠতে থাকে পশ্চিমা মগজে। এক পর্যায়ে ইউজেনিক্সের সমর্থক সেলেব্রেটি নাস্তিক মারগারেট স্যাঙ্গার প্রথম পরিবার পরিকল্পনার প্রায়োগিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন থেকে আমাদের বোঝানো হচ্ছে, যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এতে করে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কবলে পড়ে পৃথিবীর সব রসদ কমে যাবে, একসময় মহাসমস্যা দেখা দিবে। তাই দুইটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। আহা! কী সহজ হিসাব। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জোরেসোরে এই ধারণার প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কেউই এই হিসেবের অপরপিঠ উল্টিয়ে দেখিনি।

পরিবার পরিকল্পনার নানাবিধ পদ্ধতি আছে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে এসব শিখতে হয়। বাংলাদেশের এক অর্থমন্ত্রী তো সংসদে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ক্লাস সিক্স থেকে এইচএসসি ২য় বর্ষের সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দেশীয় বেলুন দেওয়া হোক! যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ীব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক

---

৪৯. Philip K. Wilson, Eugenics. Encyclopædia Britannica Online, Dec 20, 2018

৫০. Forced Sterilization, Webster University Archive. Available at: http://faculty.webster.edu/woolflm/forcedsterilization.html

৫১. Mei Fong, Sterilization, abortion, fines: How China brutally enforced its 1-child policy. New York Post, January 3, 2016

তাদের সরকারের পক্ষ থেকে টাকা-শাড়ি-লুঙ্গি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে।[৫২] অন্যদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর কারণে মুক্তকাম-চর্চা অকল্পনীয় হারে বেড়েছে, যার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা সমাগত। গর্ভনিরোধনের আরেকটি পদ্ধতি হলো গর্ভপাত (*Abortion*)। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিগত শতকের সবচেয়ে বড় গণহত্যা হলো এই ভ্রূণহত্যা, বিগত ১০০ বছরে বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটিরও বেশি গর্ভপাত করা হয়েছে![৫৩] এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০-২০১৪ সালে ফি বছর অনিরাপদ গর্ভপাত ঘটেছে প্রায় ২৫ লক্ষ! যা কিনা মোট গর্ভপাতের ৪৫ শতাংশ, সুতরাং প্রতি বছর মোট গর্ভপাত ঘটেছে ৫৫ লক্ষেরও বেশি![৫৪] বাংলাদেশে গর্ভপাতের হারও আঁতকে ওঠার মতো; দৈনিক প্রায় ৪ হাজার, বাৎসরিক প্রায় ১২ লাখ![৫৫]

শুধু পেটের শিশু নয়, জীবন্ত শিশু হত্যার ব্যাপারেও পরামর্শ আসছে কতিপয় নাস্তিক পণ্ডিত থেকে, এর নাম দেওয়া হয়েছে জন্ম-পরবর্তী গর্ভনিরোধ (*after-birth abortion*)। বিভিন্ন দেশে (নেদারল্যান্ড, কানাডা) বংশগত রোগে আক্রান্ত বা গুরুতর অসুস্থ বাচ্চাকে জন্মের পর হত্যার অনুমতি রয়েছে। তাদের যুক্তির একটি হলো ভ্রূণ বা নবজাতক যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা রাখে না, তাই তারা 'ব্যক্তি'-র পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এদের হত্যা করা যেতে পারে। এই ধারণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশান এথিকস কমিটির সম্মানিত সদস্য নাস্তিক জন হ্যারিস।[৫৬]

এদিকে নাস্তিক গবেষক আলবার্টো গিউবিলিনি ও ফ্রান্সেসকা মিনারভা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে *After-birth abortion : why should the baby live?* শিরোনামের জার্নাল পেপারে বলতে চেয়েছেন নবজাতক সুস্থ হোক বা অসুস্থ তাদের হত্যা করা যেতে পারে; কারণ এরা 'ব্যক্তি'-র পর্যায়ে পড়ে না![৫৭]

---

৫২. http://uttarkhanup.dhaka.gov.bd/site/field_office/3354b838-2016-11e7-8f57-286ed488c766

৫৩. Thomas W. Jacobson and Wm. Robert Johnston, Abortion Worldwide Report: 100 Countries, 1 Century, 1 Billion Babies. Family Research Council, January 25, 2017

৫৪. WHO, Worldwide, an estimated 25 million unsafe abortions occur each year. 28 September 2017

৫৫. ডা. তারাকী হাসান মেহেদী, সমাজ কি তা হলে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে? দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মে ২০১৮

৫৬. Elizabeth Day, Infanticide is justifiable in some cases, says ethics professor. The Telegraph, 25 Jan 2004

৫৭. Alberto Giubilini & Francesca Minerva, After-birth abortion: why should the baby live? Journal of Med Ethics, Vol. Vol. 39, p. 261-263 (February 2012)

বোঝা যাচ্ছে নাস্তিকদের কানপড়া ও বিশ্বব্যাপী সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচারণার ফসল এই গণহত্যার মহামারী। কিন্তু যে কারণে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ সেই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সমস্যা কী আসলেই রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র কারণ? ফ্রেড পিয়ার্স *নিউ সাইন্টিস্ট ম্যাগাজিন*-এ দেখিয়েছেন, জনসংখ্যায় আধিক্য নয়, বরং ধনীদের অপচয় হলো রসদ ফুরানোর মূল কারণ।[৫৮] মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক আর্লে অ্যালিস নিজের দীর্ঘ সময়ের গবেষণার আলোকে মনে করেন জনসংখ্যাধিক্য মূলত সমস্যা না, সমস্যা আমাদের অনুধাবনের।[৫৯]

নৈতিকতার বাস্তবতা

এক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন করতে পারি—কেন নাস্তিকেরা ক্ষমতা পেলেই এমন দৈত্যাকার ধারণ করেছে? তবে সে প্রশ্নে যাবার আগে নৈতিকতার ভিত্তি কী, তা আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। নাস্তিকীয় দর্শনে কোনওকিছু পরম ভালো বা মন্দ বলে নির্ধারণ করা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ডের দরকার হয়। মুসলিমরা এই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে মহান আল্লাহর পরম বিধানকে গ্রহণ করে। কিন্তু নাস্তিকদের ক্ষেত্রে এমন কোনও মানদণ্ড নেই—তাদের কারও কাছে মানদণ্ড হলো বিবেক, কারও কাছে অধিকাংশের মত অর্থাৎ সমাজের চল; যা পুরোপুরি আপেক্ষিক।

এক সময়ে যা ভালো, অন্য সময়ে তা খারাপ হয়ে যায়; এক সমাজে যা ভালো অন্য সমাজে তা মন্দ বলে নিন্দিত হতে পারে। তাই বস্তুবাদী দর্শনে মূলত ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। নাস্তিক বিবর্তনবাদি গবেষক মাইকেল রুজের স্বীকার করেছেন, নৈতিকতা হলো স্রেফ ইল্যুশন বা বিভ্রম, অর্থহীন বাজে ব্যাপার! স্রষ্টার অনুপস্থিতিতে কারও ভালো হতে চাওয়ার কোনও ভিত্তি নেই।[৬০] তাই গবেষণায় দেখা যায় মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, নাস্তিকও অন্য নাস্তিককে অসচ্চরিত্রের মনে করে।[৬১] এ ব্যাপারে বেশ সৎ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় নাস্তিক সিরিয়াল কিলার জেফরি ডাহমারের জবানে। তিনি নিজের অবস্থানের পক্ষে বলেছিলেন,

---

৫৮. Fred Pearce quoted in: JV Chamary, Is Thanos Right About Killing People In 'Avengers: Infinity War'? Forbes, Apr 30, 2018

৫৯. Erle C. Ellis, Overpopulation Is Not the Problem. The New York Times, Sept. 13, 2013

৬০. Michael Ruse, God is dead. Long live morality. The Gurdian, 15 Mar 2010

৬১. Atheists thought immoral, even by fellow atheists, finds study. Hindustan Times, Aug 09, 2017

"যদি কোনও ব্যক্তি এটা মনে না করে যে, স্রষ্টার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে, তা হলে গ্রহণযোগ্য সীমায় রাখার জন্য নিজের আচরণকে পরিবর্তন করার দরকারটা কী? আমি এমনটাই ভেবেছিলাম। আমি সব সময় বিবর্তন তত্ত্বকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, বিশ্বাস করেছি আমরা সবাই স্রেফ থকথকে কাদা থেকে এসেছি। যখন আমরা মারা যাবো, ব্যস শেষ, এরপর আর কিছুই নেই ..."[৬২]

বেস্ট সেলার বই *স্যাপিয়েন্স*-এ নাস্তিক ইউভাল নোয়াহ হারারি বলেছেন,

"মহাবিশ্বে কোনও দেবদেবী নেই, জাতি বলতে কিছু নেই, নেই কোনও অর্থকড়ি, টাকাপয়সা, মানবাধিকার বলে কিছু নেই, আর নেই কোনও আইন ও সুবিচার। এগুলো কেবল মানুষের সমষ্টিগত কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৬৩]

নাস্তিকগুরু রিচার্ড ডকিন্স এর ভাষায় :

"... ইলেক্ট্রন, স্বার্থপর জিন, উদ্দেশ্যহীন বস্তুগত বল ও জেনেটিক প্রতিলিপনের জগতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কেউ-বা সৌভাগ্যবান হবে। আর আপনি এর পেছনে কোনও ছন্দ বা কারণ খুঁজে পাবেন না। আর নাই পাবেন কোনও ন্যায়বিচার। যে বৈশিষ্ট্য আমরা আশা করি (ডারউইনিয় জীবনদর্শন) ঠিক তাই রয়েছে আমাদের চারপাশের এই জগতে যদি এর মূলে না থাকে কোনও পরিকল্পনা, কোনও উদ্দেশ্য, কোনও মন্দ, কোনও ভালো, কিছুই নয়; কেবলই নির্দয় নির্লিপ্ততা।"[৬৪]

বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য একটি দৃশ্যপট অবতারণা করা যাক। ধরুন, পাশাপাশি একজন জীবিত মানুষ ও একটি কাকতাড়ুয়া দাঁড়িয়ে আছে। একজন এসে পিস্তল দিয়ে আগে কাকতাড়ুয়া ও পরে মানুষটির মাথা উড়িয়ে দিলো। এতে কি সে অন্যায় করল? বস্তুবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী পরম ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। কাকতাড়ুয়া মূলত ইলেকট্রন-প্রোটন দিয়ে তৈরি, মানুষও সেই একই ইলেকট্রন-প্রোটন দিয়ে তৈরি। বস্তুবাদী চিন্তা অনুযায়ী সবই এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন, জাগতিক, মৃত প্রক্রিয়ার ফল। সুতরাং এই মানদণ্ডে কাকতাড়ুয়া বা মানুষ দুজনই একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

নৈতিকতা এমন এক জায়গা যেখানে নাস্তিকেরা বরাবরই নিজেদের উত্তম প্রমাণ

---

৬২. In an interview with Stone Phillips, Dateline NBC (29 November 1994)

৬৩. Yuval Noah Harari, Sapience: A Bief History of Humankind; p. 31

৬৪. Richard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of Life; p. 133 (Basic Books, 1995)

করার জন্য ওঠেপড়ে লাগে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, যারা ইতিহাস জানে তাদের কাছে এর বৈপরীত্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ড. আজাদও নিজের নৈতিকতাকে ধর্মীয় নৈতিকতার ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেছেন। তিনি নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে *হার্ম প্রিন্সিপল* বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "নৈতিকতার সীমা হওয়া উচিত সংকীর্ণ: আমার কোনও কাজ যেনো অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে— এটুকু..." (পৃ. ১৪৩)

সর্বপ্রথম জন স্টুয়ার্ট মিল সেক্যুলার লিবারেল সমাজের নৈতিকতার ভিত্তি কী হবে, সে বিষয়ে *On Liberty* গ্রন্থে হার্ম প্রিন্সিপল তুলে ধরেন—অন্যের ক্ষতি না হলে একজন ব্যাক্তি যাই করুক না কেন, সে কাজ মন্দ বলে অভিহিত করা যাবে না এবং সেজন্য তাকে সাজাও দেওয়া যাবে না; এসকল কাজের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই সার্বভৌম[৬৫]—এই নীতিই হার্ম প্রিন্সিপল হিসেবে পরিচিত হয় এবং ব্যাপকহারে সেক্যুলার সমাজে গৃহীত হয়। ড. আজাদও তাই গ্রহণ করেছেন, তবে মজার ব্যাপার হলো তিনি নিজেই তা মানেননি! ড. আজাদের ব্যাপারটা খোলাসা করার আগে হার্ম প্রিন্সিপল নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

এই ধারণার প্রথম সমস্যা হলো হার্ম বা ক্ষতির মানদণ্ড নিয়ে—যা কিনা সাবজেক্টিভ ও কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্ট। কোনটি ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে তা স্থান-কাল-পাত্রভেদে বদলায়। পাশাপাশি অধিকাংশ মানুষের জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় তারা এত হিসেব-নিকেশ করে জীবনযাপন করে না। তারা মূলত সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে যা কিছু ভালো বলে গৃহীত তাই মেনে চলে, আর যা সামাজিকভাবে গৃহীত নয় তাকেই ক্ষতিকর বলে ধারণা করে।

পাশাপাশি আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছুই অন্যের ক্ষতি করবে না মনে হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা ক্ষতি করে বসে; যা মানুষ সীমিত বুদ্ধির কারণে বুঝে উঠতে পারে না। যেমন, গবেষক ক্যাথরীন ম্যাককিনন দেখিয়েছেন, কীভাবে পর্নোগ্রাফি নারী ও নারীর শারীরিক চাহিদার ওপর সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অপরাধ দমনের *ব্রোকেন উইন্ডো তত্ত্ব* আমাদের জানায়—কীভাবে আপাত দৃষ্টিতে ছোটখাটো অপরাধকর্ম বড় অপরাধ কর্মের জন্ম দেয়। হার্ম বা ক্ষতির সংজ্ঞা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তর কথাবার্তার শেষে তথাকথিত হার্ম প্রিন্সিপলের যৌক্তিকতা সেক্যুলার পণ্ডিত-

৬৫. John Stuart Mill, On Liberty; p. 23-24 (Ticknor and Fields, 1863)

মহলে আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে, অন্তত জার্নাল পেপার সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।[৬৬]

তো ড. আজাদ কীভাবে নিজেই হার্ম প্রিন্সিপলের বিপরীত কাজ করেছেন? তিনি ধূমপান করতে খুব পছন্দ করতেন। জার্মানি থেকে চিকিৎসা নিয়ে আসার পর উনার আদরের মেয়ে ধূমপান করতে মানা করার পরও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। বাধা দিতে মানা করেছেন আর মনের সুখে ধোঁয়া গিলেছেন। ভেবেছেন, আমি তো কারও ক্ষতি করছি না! হার্ম প্রিন্সিপলের প্রয়োগ আরকি! কিন্তু বাস্তবতা কি তাই বলে?

WHO-এর মতে ধূমপান বছর প্রতি ৭০ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়! ধূমপানজনিত কারণে স্বাস্থ্যখাতে অন্তত ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার প্রতি বছর অপচয় হয়। পাশাপাশি তামাক চাষ থেকে প্যাকেটিং ও ধূমপান সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর চাষাবাদে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, গ্রিনহাউজ গ্যাস পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। ড. আর্মান্ডো পেরুগার মতে, ধূমপান শুধু মানুষের ফুসফুসে ক্যান্সার ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয় না, এটি পৃথিবীর ফুসফুসের প্রতিও ক্যান্সারসম।

তামাক গাছ মাটি থেকে অনেক পুষ্টি উপাদান শুষে নেয়, যার জন্য বেশি পরিমাণ সার ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা লাগে; যা ক্রমান্বয়ে জমির মান খারাপ করে ফেলে, মরুভূমি সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়; ক্ষতিগ্রস্থ হয় জীববৈচিত্র্য ও মানুষ। প্রতিটি সিগারেটে অন্তত প্রায় ২৫০টি ক্ষতিকর পদার্থ থাকে; থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড যা গ্রিনহাউজ গ্যাসের উপাদান। তা ছাড়া পরোক্ষ ধূমপানও যথেষ্ট ক্ষতিকর; এর কারণে বছরে ১০ লাখের কাছাকাছি সংখ্যক মানুষ মারা যায়, যার শতকরা ২৮ ভাগই হলো শিশু![৬৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ড. আজাদ যদি হার্ম প্রিন্সিপল আসলেই মেনে চলতেন, তা হলে উনার ধূমপান বর্জন করার কথা ছিল, উনি তা করেননি। উনার সীমিত ও প্রবৃত্তিপরায়ণ মস্তিষ্ক এতদূর ভাবেনি। আসলে নিজের প্রবৃত্তির পূজা করার জন্য এসব খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে নাস্তিকেরা নৈতিক দায় থেকে মুক্তি পেতে চায়। আদতে দেখা যায়, তারা নিজেদের ও অন্যদের ক্ষতি ছাড়া কিছু চায় না।

---

৬৬. Bernard E. Harcourt, The Collapse of the Harm Principle. Journal of Criminal Laws & Criminology, Vol. 90, Issue 01, p. 109-194 (1999-2000)

৬৭. Jacopo Prisco, Study reveals high environmental cost of tobacco. CNN, May 31, 2017

নিহিলিজম

নশ্বর এই পৃথিবীতে নিত্য নতুন প্রাণের মেলা বসে। এই মেলার অবসান হয় ধূসর মৃত্যুতে। জন্ম অনিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকেই জানে একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। এটি এমন এক ঘাঁটি যেখানে সবাইকে হাজির হতে হবে, কেউই নিস্তার পাবে না।

> "চারদিকে চলছে জীবনের উৎসব, প্রাণের রঙিন কার্নিভাল, আবেগে গাল লাল হয়ে উঠছে, সবুজ হয়ে উঠছে পাতা; এ-কার্নিভালে কুৎসিত মুখোশ প'রে কে নাচছে তুমুল নাচ?—মৃত্যু। মানুষের চিন্তায় মৃত্যু বিমূর্ত ধারণা নয়, মানুষের মনে মৃত্যু এক সজীব অস্তিত্ব, যার কাজ তার রঙিন উৎসবকে অন্ধকার ক'রে তোলা।" (পৃ. ১৪৮)

কিন্তু কী এই মৃত্যু? এর রহস্য কী? মৃত্যুর পর কী হয়? আমরা কী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, পঁচেগলে পোকার খাদ্য হয়ে যাব; না মৃত্যুর পর আরেক জীবন অপেক্ষামান? এমন অনেক প্রশ্ন আদিকাল থেকেই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা পরকালের ধারণা সকল ধর্মেই আলোচিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি জোর প্রদান করা হয়েছে যে ধর্মে তা হলো ইসলাম। বলা হয়ে থাকে, পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে কেবল আখিরাতের আলোচনা। মানুষের জীবনে পরকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কিন্তু পরকাল বিষয়টি মানুষের দৃষ্টির বাইরে; এটি গায়েবের বিষয়ের অন্তর্গত। তাই আল কুরআন ও হাদীসে-নববিতে আখিরাতের নানা দিকের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে একজন নাস্তিক ভাবে, দুনিয়ার এই জীবনই তার একমাত্র জীবন। এ জীবনের ওপারে আর কোনও জীবন নেই। জন্মাব, খাব, কামে লিপ্ত হব, উপভোগ করব আর বেলা শেষে পঁচেগলে যাব—জীবন সম্পর্কে এটাই তাদের ধারণা। অন্য কথায়—*We are born to Die!* ড. আজাদের ভাষায়, জীবনের সারকথা কবর। বেশ হতাশাজনক এই ধারণা! কেন? কারণ, পরকালে অবিশ্বাস মানুষকে নিহিলিজমের দিকে ঠেলে দেয়। ড. আজাদের ভাষায় :

> "... সব কিছুই নিরর্থক, জগত পরিপূর্ণ নিরর্থকতায়; রবীন্দ্রনাথও নিরর্থক, আইনস্টাইনও নিরর্থক; ওই গোলাপও নিরর্থক, ভোরের শিশিরও নিরর্থক; তরুণীর চুম্বনও নিরর্থক, দীর্ঘ সুখকর সঙ্গমও নিরর্থক, রাষ্ট্রপতিও নিরর্থক। কেননা

সব কিছুর পরিণতিই বিনাশ। বিস্ময়কর বিশ্ব, রঙিন ফুল বা মানুষ বা বন্যশুয়োর, সূর্য বা নক্ষত্র, গ্রহউপগ্রহ সব কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে তাদের পরিণতি-বিনাশ, যার থেকে কারো উদ্ধার নেই।" (পৃ. ১৭)

নাস্তিক্যবাদী-দর্শনে মানবের অস্তিত্ব কেবলই দুর্ঘটনার ফল; এলোমেলো মিউটেশান আর ন্যাচারাল সিলেকশানের মারপ্যাঁচে কালের কোনও এক ক্ষণে মানুষ নামক পশুর উৎপত্তি। সে অন্যান্য পশুর মতোই কেবল বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করার সংগ্রামে লিপ্ত। সংগ্রাম শেষে তাকে কীটের খাবার হয়ে যেতে হবে। সে যতই ভালো কাজ করুক অথবা যতই মন্দ কাজ করুক; কিছুই যায় আসে না। কারণ তাকে না কোনও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, আর না-ই তার জন্য রয়েছে কোনও শাস্তি বা পুরস্কার। এই জীবন হলো তাসের ঘর, জনম-মরণ সবই অর্থহীন!

"জীবনের কোনও অর্থ নেই, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য নেই; (নাস্তিক কবি) সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, জীবনের সারকথা হলো পিশাচের উপজীব্য হওয়া।" (পৃ. ১৯)

এই দর্শন অস্তিত্বগত ধ্বংসবাদ (*Existential Nihilism*) নামে পরিচিত। জীবন সম্পর্কে একজন অস্তিত্বগত ধ্বংসবাদী কেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন—তার সারমর্ম পাওয়া যায় শেক্সপিয়ারের নাটক *ম্যাকবেথ*-এর পঞ্চম দৃশ্যের শেষের একটু আগে। ম্যাকবেথ জীবনের প্রতি তার বিরক্তি উগড়ে দিয়ে বলে,

নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্তপদ সঞ্চালিয়ে গর্জন করিয়ে
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ,
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর।[৬৮]

সাহিত্যে নোবেলজয়ী *Existentialist* দার্শনিক জিন জ্যা পল সার্ত্রে রচিত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এন্টোনি রোকুয়েন্টিন-এর ভাষায় বললে:

৬৮. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, ম্যাকবেথ; পৃ. ১১৮ (বঙ্গানুবাদ: গীরিশচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা, গ্রেট ইডিন প্রেস, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

"কথা কিন্তু সত্যি। আমি এমনটিই বুঝতে পেরেছি যে, আমার বেঁচে থাকার কোনওই অধিকার নেই। (বস্তুবাদ অনুযায়ী) আমার অস্তিত্ব ঘটেছে আকস্মিকভাবে। আমি মানুষ না হয়ে পাথর, গাছ কিংবা জীবাণু হিসেবে অস্তিত্বলাভ করতে পারতাম।... আমি চিন্তা করছিলাম... এই যে আমরা এই পৃথিবীতে খানাপিনা করে বেড়াচ্ছি আমাদের মূল্যবান অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু এ বেঁচে থাকার তো কোনও কারণই নেই, একদম না।" [৬৯]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, হাল আমলের ফ্যাশনে পরিণত হওয়া নাস্তিকতার লজিক্যাল সিকোয়েন্স বড্ড ধূসর। অধিকাংশ নাস্তিক এ নিয়ে মাথা ঘামায় না; নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সুবিধার্থে স্টাইল হিসেবে নাস্তিকতাকে বেছে নেয়। কিন্তু নাস্তিকতার যৌক্তিক পরিণাম নিয়ে চিন্তা তাদের ভাবনার জগৎ স্পর্শ করে না।

আমার অভিজ্ঞতা বলে, যারা আসলেই নাস্তিক তারা নাস্তিকতার প্রচার করে বেড়ায় না। তারা এই বিশ্বাসের ভয়াল পরিণাম সম্পর্কে ধারণা রাখেন। অন্যদিকে যারা নিজেদের নাস্তিকতা নিয়ে সংশয়ে ভোগেন, তারাই কেবল দিন-রাত ধর্মকে আক্রমণ করে বেড়ান; নিজের অবস্থান যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেজন্য, যাতে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় সেজন্য।

তবে ড. আজাদ ধর্মকে আক্রমণ করার পাশাপাশি নাস্তিকতার পরিণাম নিয়েও ভেবেছেন, যেমনটি ভেবেছিলেন বহুল-আলোচিত নাস্তিক্যবাদি জার্মান দার্শনিক ফ্রেডেরিক নিৎশে। এক্ষেত্রে নব্য-নাস্তিক তথা অভিজিৎ গংদের চেয়ে ড. আজাদ অধিক সততার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মহাজগতকে এক বিশাল ঝিনুকরূপে কল্পনা করেছেন, যার দুটি ঢাকনার একটি হলো শূন্যতা, অন্যটি মৃত্যু। কোথাও কোনও তাৎপর্য নেই; এই ঝিনুকের মাঝে রোগজীবাণুর মতো ঢুকে গেছে মানব প্রজাতি।

ঝিনুক যেমন তার ব্যাধিকে মুক্তোয় পরিণত করে, তেমনি চূড়ান্ত অর্থহীন অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করার সুন্দর কিন্তু ব্যর্থ ও করুণ প্রয়াস হিসেবে তিনি শিল্পকলার কথা বলেছেন। কী আশ্চর্য তাই না? নিজেই গেয়ে গেলেন স্বীয় জীবনের ব্যর্থতার গান :

---

৬৯. Jean Paul Sartre, Nausea; p. 162

একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্য পাশে মৃত্যুর ঢাকনা,
প'ড়ে আছে কালো জলে নিরর্থ ঝিনুক।
অন্ধ ঝিনুকের মধ্যে অনিচ্ছায় ঢুকে গেছি রক্তমাংসময়
আপাদমস্তক বন্দী ব্যাধিবীজ। তাৎপর্য নেই কোনও দিকে—
না জলে না দেওয়ালে—তাৎপর্যহীন অভ্যন্তরে ক্রমশ উঠছি বেড়ে
শোণিতপ্লাবিত ব্যাধি। কখনো হল্লা করে হাঙ্গরকুমিরসহ
ঠেলে আসে হলদে পুঁজ, ছুটে আসে মরা রক্তের তুফান।
আকস্মিক অগ্নি ঢেলে ধেয়ে আসে কালো বজ্রপাত।
যেহেতু কিছুই নেই করণীয় ব্যাধিরূপে বেড়ে ওঠা ছাড়া,
নিজেকে-ব্যাধিকে-যাদুরসায়নে রূপান্তরিত করছি শিল্পে—একরত্তি নিটোল
মুক্তোয়! (পৃ. ১৮)

তিনি নিজেই বলেছেন, এ প্রয়াস সুন্দর কিন্তু ব্যর্থ; প্রশ্ন করেছেন এতে কি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে জীবন? না, হয়নি। ড. আজাদ বলেছেন, মানুষ এই নিরর্থকতাকে অতিক্রম করার কোনও উপায় দেখে না, কেননা বেঁচে থাকাই হচ্ছে নিরর্থকতা। কবি সুধীন্দ্রনাথ নাকি এহেন পরিস্থিতির কথাই কবিতার ছন্দে বলেছিলেন:

মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা
যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী
অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই:
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী

ড. আজাদ এহেন নিরর্থকতা থেকে মুক্তির একটি উপায় হিসেবে মৃত্যুকে বিবেচনা করেছেন; মৃত্যুই পারে এই নিরর্থকতার সমাপ্তি ঘটাতে। তাই তিনি কয়েকবার আত্মহত্যাকে সমাধান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ নিয়ে একটি কবিতাও লিখেছেন, "ছাদ আরোহীর কাসিদা" নামে। এমন চিন্তা অনেক মানুষকেই না-ফেরার দেশে ঠেলে দিয়েছে। *American Journal of Psychiatry*-তে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ফলাফল অনুযায়ী, আত্মহত্যার হার ধর্মহীন ও নাস্তিকদের মাঝেই বেশি।[৭০]

তা ছাড়া আমার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। নিজের খাপছাড়া জীবন নিয়ে লিখা কিছু লাইনে স্বীয় অভিজ্ঞতার আসর বসিয়েছিলাম এককালে। কীভাবে নিহিলিজম মানুষকে ধ্বংস-হতাশা-অর্থহীনতার ঘূর্ণিপাকে নির্মমভাবে ছুড়ে ফেলে তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে

৭০. Religious Affiliation and Suicide Attempt, American Journal of Psychiatry, Vol. 161: , Issue. 12, : Pages. 2303-2308 (Issue publication date: December 2004)

ফেলে, তছনছ করে বিক্ষিপ্ত ধুলোর মতো উড়িয়ে দেয়, তা বুঝেছিলাম নিজের জীবন দিয়েই। কালিগোলা আঁধারে অনন্তকালের অগ্নিযাত্রায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার আগে এক ডাক আমার হিয়া স্পর্শ করে যায়। সেই ডাকের উৎস হৃদয়ের গহিনে এক অপার আলো বুনে দিয়েছিল। তাই আজও তাঁকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখি, তিনিই আমার রব, আমার আল্লাহ।[৭১]

কিন্তু একজন নাস্তিকের সেই আলো নেই। সে নিরর্থকতার ঘুটঘুটে আঁধারে ক্রমাগত হাতড়ে বেড়ায়। সে জানে পালানোর পথ নেই, তাই নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। দার্শনিক ফ্রেডেরিক নিৎশে মনে করতেন, নিহিলিজমের ভয়াবহ পরিণতি এড়ানোর উপায় হলো নিজেদের খোদার স্থানে বসানো! নিজেদের পরমত্ব প্রদান করা ও খোদার স্থানে নিজের খেয়াল-খুশিকে বসানো। এমন যে করতে পারবে, তার নাম তিনি দিয়েছেন সুপারম্যান (*Übermensch*); আন্ডারওয়্যার প্যান্টের ওপরে যে পরে এই সুপারম্যান সে নয়। বরং স্রষ্টায় বিশ্বাস ত্যাগ করা যে অর্থহীনতা ও অস্তিত্বের সংকটে মানুষকে ঠেলে দেয়, তা থেকে উত্তরণের জন্য নিজেই জীবনের আল্টিমেট মিনিং দাঁড় করিয়ে, সুপারম্যান নাম দিয়ে নিজেকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস, ব্যস। আর কিছু নয়। [৭২]

> "আমরা নিরর্থকতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, কিন্তু তা মেনে না নিয়ে, আপন পথ খুঁজে, পথ তৈরি করে সার্থক করতে পারি নিজেদের। কোনও সার্থকতাই অবশ্য সার্থকতা নয়, সব কিছুই পরিশেষে নিরর্থক; অর্থপূর্ণ শুধু দুই অন্ধকারের মাঝখানের হঠাৎ ঝালকানিটুকু।" (পৃ. ২১)

এভাবে অধ্যাপক সাহেবসহ অসংখ্য নাস্তিক নিজেদের ডিল্যুশনে ডুবিয়ে রাখতে চায়; নিজেরা জীবনের কল্পিত অর্থ দাঁড় করায়, ভালো-মন্দের বাছবিচার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। এই হতাশাব্যঞ্জক মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চায় যে, তাদের দর্শনে সবকিছুই নিরর্থক; জীবন চরম অর্থহীনতায় আকণ্ঠ পূর্ণ, মাঝখানের হঠাৎ আলোক ঝলক মিছে মায়া ছাড়া কিছু নয়। জীবনের আঁধার ঘেরা সুড়ঙ্গের ওপারে কোনও আলোর আশা নেই, কেবলই অন্ধকার, কালিগোলা অন্ধকার আর অজস্র পোকার পায়ের আওয়াজ!

---

৭১. রাফান আহমেদ, সেই সব দিনরাত্রি; আরিফ আজাদ (সম্পাদনা), প্রত্যাবর্তন; পৃ. ৫৫-৬২ (ঢাকা : সমকালীন প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, মে ২০১৮)

৭২. Karen Armstrong, The Case for GOD: What Religion Really Means; p. 247

ওয়ারফেয়ার থিসিস

"কিছু কিছু কপট মানুষ, বিশেষ ক'রে রাজনীতিবিদেরা ও সুবিধাবাদী বিখ্যাত ব্যক্তিরা, ব'লে থাকেন যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই; তবে এটা মিথ্যেকথা— ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী : বিজ্ঞান সত্যের সাধক আর ধর্ম মিথ্যের পূজারী।" (পৃ. ১২১)

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞান-ধর্ম আলোচনার তুঙ্গে পুরনো এক আলোচনা নতুন প্রাণ লাভ করে। বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে এক যুদ্ধপ্রস্তাব করতে থাকেন পণ্ডিতমহলের কেউ কেউ। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন জন উইলিয়াম ড্রেপার এবং অ্যান্ড্রু ডিকসন হোয়াইট। ড্রেপার *The History of Conflict Between Religion and Science (1871)* বইতে এই সংঘর্ষকে জোরালো করে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গোঁড়া সেক্যুলারিস্ট ডিকসন হোয়াইট আরেকটি বই লিখেন *A History of the Warfare of Science and Theology in Christendom (1896)* শিরোনামে। উভয়েই দেখাতে চেষ্টা করেন কীভাবে ধর্ম/ধার্মিক ব্যক্তিগণ যুগে যুগে বিজ্ঞান/প্রগতির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ টানা হয় গ্যালিলিও ও চার্চদ্বন্দ্বের ঘটনা-সহ আরও অনেক ঘটনা। [৭৩] ড. আজাদের ওপরের বক্তব্য মূলত এই ওয়ারফেয়ার থিসিসের প্রকাশ, তিনি মনে করেন বিশ্বাস থেকে কখনও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না, জ্ঞানের বিকাশ ঘটে নাকি অবিশ্বাস থেকে। (ভূমিকা) উনার ভাবশিষ্যরাও স্বীয় বইতে একই আলোচনা টেনেছেন ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মন বিষিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু এই চিত্র কতটুকু সঠিক? আসলেই কি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান যুদ্ধে লিপ্ত?

বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় এই পদ্ধতির রূপরেখা কোনও নাস্তিক-ধর্মবিরোধীর আবিষ্কার নয়; বরং একজন মুসলিমের আবিষ্কার! [৭৪] কী, চমকে উঠলেন? দাদাদের কেউ হয়তো ভাবছেন 'মুমিনরা' আবার ত্যানা প্যাঁচানো শুরু করেছে, ভণ্ড সব! আরে এত দ্রুত সিদ্ধান্তে আসবেন না প্লিজ, পস্তাতে হবে পরে; খুলে বলছি। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এই দুনিয়া ত্যাগের পর দীর্ঘ সময় মুসলিমরা বিশ্বের সুপার পাওয়ার হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁদের সুশাসন

---

৭৩. প্রাগুক্ত; p. 241-243

৭৪. Jim Al-Khalili, The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance; chapter 11: The Psycisist (Penguin Publishing Group, 2011).

আস্বাদন করে জ্ঞানের ফল্গুধারা বয়ে গিয়েছিল ইতিহাসের সরোবরে। আধুনিক পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম স্মিথ বলেন :

> "... এটা প্রতীয়মান হয় যে, সর্বপ্রথম খলিফাদের সাম্রাজ্যেই পৃথিবীর মানুষ এক প্রশান্তির স্বাদ আস্বাদন করেছিল যা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।... সেই প্রশান্তি যা তাদের কোমল, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মীয় শাসকবর্গ বিস্তৃত সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের নীতিমালা সম্পর্কে মানুষের কৌতুহলকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল ..."[৭৫]

৮ম-১৪শ শতকের মাঝে আরব সাম্রাজ্যে ঘটে যায় এক অভূতপূর্ব জ্ঞানবিপ্লব। সেক্যুলার গবেষকগণ এই সময়কালকে 'গোল্ডেন এইজ অব ইসলামিক সাইন্স' বলে অভিহিত করেন। এর পিছনে অবদান ছিল সেই আসমানি বাণীর, যা ইসলামকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান অর্জনকে আবশ্যিক করেছে। আরব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আসমানি বাণীতে সেই অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন, যার সাক্ষ্য দিয়েছেন সেক্যুলার গবেষকরাই।[৭৬] ইসলামের কড়া সমালোচক হার্টউইগ হার্শফেল্ড লিখেন :

> "আল-কুরআনকে যে জ্ঞানের ঝরনার উৎসমুখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আকাশ-পৃথিবী থেকে শুরু করে মানবজীবন, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এই পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে রচিত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক অগণিত প্রবন্ধ-রচনা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা, এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানের নানা শাখার বিস্ময়কর অগ্রগতির জন্য আল-কুরআনই দায়ী।"[৭৭]

পবিত্র কুরআন থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান আহরণে চঞ্চল মধুকরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা। ধর্মীয় প্রয়োজনে, নতুন কিছু পাওয়ার নেশায় তাঁরা একে একে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদচিহ্ন রাখা শুরু করেন। নির্দিষ্ট সময়ে সালাত ও সাওম বাধ্যতামূলক করায়

---

৭৫. Adam Smith, The Essays of Adam Smith; p. 353 (London, 1869)

৭৬. Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization; p. 81-83 (Bloomsbury Publishing, 2010)

৭৭. Hartwig Hartwig, New researches into the composition and exegesis of the Qoran; p. 09 (London: Royal Asiatic Society, 1902)

Salim T.S. Al-Hassani (Edt), 1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization; p. 14-15

প্রয়োজনের খাতিরেই সময় ও ক্যালেন্ডারের হিসেব রাখার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে। তা ছাড়া মক্কায় অবস্থিত কা'বার দিকে সালাত আদায়ের আদেশ বাস্তবায়নের তাগিদে সঠিক দিক নির্ধারণ পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়; ফলে ভৌগলিক নকশা-চুম্বক-কম্পাস-অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব-নক্ষত্রের নকশা-উন্নত অ্যাসট্রোল্যাব আবিষ্কৃত হয়; গড়ে ওঠে মানমন্দির। সে সময় মুসলিমরা এমন উন্নত কিছু ভৌগলিক নকশা তৈরিতে সক্ষম হয়, যা কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। [৭৮]

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে কাগজ ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। আধুনিক বর্ণমালার ভিত্তি যে আরবি কুফি বর্ণমালা, তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ফোরাত নদীর তীরে। রেশম পোকার মথ ব্যবহার করে চীনাদের কাগজ তৈরীর পদ্ধতি মুসলিমরা গ্রহণ করে তাতে আরও উন্নতি ঘটায়। ফলে উন্নত কাগজশিল্প গড়ে ওঠে। যাকাত-ফিৎরা প্রভৃতির হিসেব-নিকেশের তাগিদে গণনা পদ্ধতি উন্নতিলাভ করে। আরবি সংখ্যার ব্যবহার, গণিতে জাগরণ ঘটানো সংখ্যা 'শূন্য'-র ব্যবহারিক প্রচলন, বীজগণিতকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে রূপ দেওয়া, অ্যালগরিদম আবিষ্কার—এসবই ঘটে চলে ইসলামি সাম্রাজ্যের পণ্ডিতদের হাত ধরে। পশ্চিমে আরবি সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে দ্বাদশ শতকে, 'শূন্য'-হীন বড় বড় সংখ্যা লেখার ঝামেলাপূর্ণ রোমান পদ্ধতির জায়গা দখল করে নেয় সোজাসাপ্টা আরবি সংখ্যামালা।

ইসলামে প্রতিমা, প্রতিকৃতি তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে; তাই বহু মুসলিম শিল্পী তাদের শৈল্পিক দক্ষতার স্ফুরণ ঘটিয়েছে পাথর, তাঁত ও কাঠের ওপর জ্যামিতিক নকশায় এরাবেস্ক নামক অভিনব শিল্পের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অঙ্গন মুসলিমদের অবদানে সমৃদ্ধ। সাইন আর কোসাইন টেবিল তৈরি হয়েছে, কিউবিক সমীকরণ সংজ্ঞায়িত হয়েছে, দ্বিঘাত সমীকরণের রুট বা মূলসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণধর্মী ও সাধারণ ত্রিকোণমিতি প্রসার লাভ করেছে এবং জ্যামিতিক জ্ঞান উন্নত হয়েছে।

ধাতুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জৈব ও অজৈব রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের বেশ অগ্রগতি ঘটে। প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়ে অ্যাক্সল, লিভার, পুলি, উইন্ডমিল, পানিচক্র প্রভৃতি যন্ত্রের এবং বেশ কিছু পদ্ধতির যেমন : ক্যালসিনেশান, রিডাকশান, পাতন,

---

৭৮. Salim T.S. Al-Hassani (Edt), 1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization (National Geographic, 3rd edition 2012)

স্ফটিকিকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। অভিকর্ষ তত্ত্ব ও বায়ুর স্থিতিস্থাপক তত্ত্ব-সহ অন্যান্য তত্ত্বের উন্নতি ঘটে। গড়ে ওঠে প্রথম হাসপাতাল, চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। নতুন নতুন পথ্য ও শল্যচিকিৎসার নানা যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি আবিষ্কার হয়। [৭৯] আজকের নাস্তিকেরা যে পিয়ার রিভিউ বলে চিৎকার করে, সেই পিয়ার রিভিউ পদ্ধতিও প্রথম বর্ণনা করেন ইসহাক বিন আলি আল-রাহউই! [৮০]

ইসলামের কঠোর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ.জি. ওয়েলস লিখেন,

> "নবধারা ও সতেজ প্রাণশক্তিপূর্ণ আরব-মেধা কল্যাণকর জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি পালন করেছিল সুষ্ঠুভাবে, যে ধারা এক সময় গ্রীকরা শুরু করে ছেড়ে দিয়েছিল।... আজকের আধুনিক বিশ্ব, জ্ঞানের সেই আলো ও শক্তির উপহার ল্যাটিন সূত্রে লাভ করেনি, করেছে আরবদের মাধ্যমে।... তারা পশ্চিমের চেয়ে প্রায় এক শতাব্দি এগিয়ে থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। ...পূর্ব কিংবা পশ্চিম, চারিদিক থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে জড়ো হত।...আরব দর্শন পরবর্তী কালে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করেছিল পশ্চিম ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে বিশেষত প্যারিস, অক্সফোর্ড ও উত্তর ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে।..." [৮১]

গ্রিক চিন্তাবিদগণ মূলত থিওরিস্ট ছিলেন, স্বীয় অনুধাবন-অনুযায়ী কিছু ধারণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু সেগুলোকে গবেষণা/পরীক্ষালব্ধ কোনও উপায়ে উপস্থাপনের উপায় জানা ছিল না কারও। ১০ম-১৪শ শতকের মুসলিম পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছক গড়ে তুলতে মূল ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মাঝে প্রথম যিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধারণা যাচাই-বাছাইয়ের ছক আঁকেন, তিনি ছিলেন *অপটিক্স*-এর জনক হাসান ইবন-আল হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রি.), একজন মুসলিম পণ্ডিত।

বর্তমানে তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসেবে গণ্য করা হয় সেক্যুলার অ্যাকাডেমিয়াতে। [৮২] পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা তাঁর থেকে

---

৭৯. How Islamic inventors changed the world. The Independent, 11 March 2006

৮০. Jacalyn Kelly et. al, Peer Review in Scientific Publications: Benefits, Critiques, & A Survival Guide. EJIFCC. Vol. 25, Issue 3, p. 227–243 (October 2014)

৮১. H.G. Wells, The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind; p. 335-336 (London, The Waverley Book Company, Limited, 1920)

৮২. Jim Al-Khalili, The 'First True Scientist'. BBC, 4 January 2009

গ্রহণ করেন ইউরোপের পণ্ডিত রজার বেকন।[৮৩] কিন্তু বড় আফসোসের ব্যাপার হলো—বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব হাসান ইবন-আল হাইসামকে না দিয়ে, পিটার পেরেগ্রিনাস নামের এক ফরাসি পণ্ডিতকে দিয়েছেন। কেন? আমেরিকান সাহিত্যিক ব্রাডলি স্টিফেনস তাঁর *Ibn al-Haytham : First Scientist* বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এর কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন :

> "বেকন পেরেগ্রিনাসকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং তার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। সে কারণেই হয়তো তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসেবে ইবন আল-হাইসামের বদলে পেরেগ্রিনাসকে বেছে নিয়েছিলেন। আরেকটি কারণ হতে পারে যে, মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা যখন জেরুজালেম ও সংলগ্ন এলাকার কর্তৃত্ব দখল নিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সেসময় বেকন ও পেরেগ্রিনাস উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের দলে। বেকন ছিলেন পাদরিদের কাতারে, আর পেরেগ্রিনাস তো এক ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশ নিয়েছিলেন। এসকল সংঘাতের প্রেক্ষিতে বেকন হয়তো ভেবেছিলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে মুসলিম পণ্ডিতের নাম জুড়ে দিলে খ্রিষ্টসমাজে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা মন্থর হয়ে পড়বে।"[৮৪]

আফসোস! যে মুসলিমদের হাত ধরে বিজ্ঞানের মশাল জ্বলে উঠল সেই আলো অন্যেরা সুকৌশলে সরিয়ে নিয়ে গেল। মানুষ জানতেই পারল না যে, মুসলিম সভ্যতার অবদানের কারণে একসময় অন্ধকার ইউরোপে আসে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ! শল্যচিকিৎসক ও সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন :

> "পঞ্চাদশ শতক নয় বরং মরুবাসী ও স্পেনের অধিবাসী আরবদের দ্বারা সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রভাবে প্রকৃত রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছিল। ইটালি নয়, বরং (মুসলিম) স্পেনই ছিল ইউরোপের নবজাগরণের জন্মস্থান স্বরূপ…"[৮৫]

এখন প্রশ্ন হলো, কেন হাইসাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তার ছক আঁকতে গেলেন? তিনি কী ধর্ম বনাম বিজ্ঞান যুদ্ধতে জয়ী হওয়ার জন্য এমনটি করেছিলেন?

---

৮৩. Salim T.S. Al-Hassani (Edt), 1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization; p. 310

৮৪. Ertan Salik, Ibn al-Haytham: First Scientist. The Fountain Magazine, Issue 63, May 2018

৮৫. Robert Briffault, The Making of Humanity; p. 188 (London, George Allen & Unwin Ltd., 1st published 1919); আরও দেখুন: George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (MIT Press, 2007)

উত্তর হচ্ছে, না। ব্রাডলি স্টিফেনস হাইসামের জীবনী আলোচনা করে দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক রূপরেখা আঁকার পিছে যে বাসনা চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল তা হলো, স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল করা।[৮৬] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নানা আবিষ্কারের পেছনে ধর্ম বনাম বিজ্ঞান এমন কোনও ন্যারেটিভ ছিল না; ছিল ধর্মীয় উৎসাহ, আসমানি গ্রন্থের অনুপ্রেরণা আর আল্লাহর কাছে যাওয়ার বাসনার মিশেল।

সুতরাং 'ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী : বিজ্ঞান সত্যের সাধক আর ধর্ম মিথ্যের পূজারি'—এমন দাবি অন্য ধর্মের জন্য প্রযোজ্য হলেও হতে পারে, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা খাটে না। [৮৭]আসলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্কটা জটিল প্রকৃতির। বিজ্ঞানের সূচনাকালে ধর্মই বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি ইউরোপে মুসলিমদের লেগেসি যখন রেনেসাঁ আনয়ন করে, তখন থেকে বহু বছর খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে এমনটা নয় যে বিজ্ঞানের কোনও কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াননি; কিন্তু এমন উদাহরণ কম।

তাই বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ এই ওয়ারফেয়ার থিসিসের বয়ানকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। গবেষক মরিস ফিনোকিয়ারো-এর মতে, ওয়ারফেয়ার থিসিস মূলত ইতিহাসের সরলীকৃত, বিভ্রান্তিকর ও প্রপঞ্চময় উপস্থান। তিনি দেখেছেন, এই মিথ বহুল প্রচলিত; শুধু ড্রেপার, হোয়াইট নয়; বরং ভলতেয়ার, আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, কার্ল পপার সকলেই এই মিথে বিশ্বাস করেছিলেন।[৮৮] জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লরেন্স এম. প্রিন্সিপে তার কোর্সবুকে এ বিষয়ে লিখেন :

> "বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-ধর্ম বিষয়ক কোনও চিন্তাশীল ঐতিহাসিক এখন আর ওয়ারফেয়ার থিসিসকে সঠিক মনে করেন না। ... এই ওয়ারফেয়ার থিসিসের জন্ম হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, বিশেষ করে দুজন মানুষের হাত ধরে— জন উইলিয়াম ড্রেপার ও অ্যানড্রু ডিকসন হোয়াইট। এই থিসিস উপস্থাপনের পেছনে এদের বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এবং বলাই বাহুল্য তাঁদের কাজের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনির্ভরযোগ্য।" [৮৯]

---

৮৬. Bradley Steffens, Ibn Al-haytham: First Scientist (Morgan Reynolds Pub., 2006)

৮৭. Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization; p. 81

৮৮. Maurice A. Finocchiaro, The Trial of Galileo : Essential Documents; p. 2 (Hackett Publishing, 2014)

৮৯. Lawrence M. Principe, Science and Religion; p. 7 (The Teaching Company, 2006)

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন না যে—ধর্ম ও বিজ্ঞান সংঘাতে লিপ্ত। পৃথিবীর আটটি অঞ্চলের নয় হাজারের বেশি বিজ্ঞানীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।[১০] নাস্তিক দার্শনিক মাইকেল রুজ অ্যাকাডেমিক আর্টিকেলে লিখে দেখিয়েছেন—এই ওয়ারফেয়ার থিসিস আসলে মিথ্যা।[১১] প্রচলিত ওয়ারফেয়ার থিসিস আসলে ওয়ারফেয়ার মিথ! এমনকি আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্স-এর মতেও ধর্ম ও বিজ্ঞান সংঘাতের এই বয়ান সঠিক না; কারণ দুটির অবস্থান আলাদা। সংস্থাটির ভাষ্যমতে :

> "ধর্ম ও বিজ্ঞান জগত সম্পর্কে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস পায়। মহাবিশ্ব বা মানবের অস্তিত্বের কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, তা বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় না। মানবের ইতিহাসে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক উভয় পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অতীতে রেখেছে, ভবিষ্যতেও রাখবে।"[১২]

আজাদকন্যা মৌলি আজাদ বলেছেন, ড. আজাদ নাকি কোনও মিথে আবদ্ধ হতে চাননি! বাস্তবতা হলো, তিনি মিথে আবদ্ধ হয়েছেন, যেটাতে আবদ্ধ হলে উনার সুবিধে!

আলেকজান্দ্রিয়ার আগুন!

ড. আজাদ ওয়ারফেয়ার থিসিসের নমুনা স্বরূপ বিভিন্ন লেখনীতে ধর্মকে জ্ঞানের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন। ধর্মকে জ্ঞান বিকাশের বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। যেমন *মহাবিশ্ব* গ্রন্থে তিনি বলেন :

> "৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে; তাদেরও জ্ঞানের আগ্রহ ছিল না; রাজ্য, জয় আর ক্ষমতার উল্লাসে তারা পুড়িয়ে দেয় আলেকজান্দ্রিয়ার মহা-গ্রন্থাগার, নষ্ট হয়ে যায় অনেক মূল্যবান গ্রিক বই ও জ্ঞান।..."[১৩]

---

১০. Elaine H. Ecklund et al., Religion among Scientists in International Context: A New Study of Scientists in Eight Regions. Socius, Vol. 2, p. 1-9

১১. Michael Ruse, The Compatibility of Science and Religion: Why the Warfare Thesis Is False. In: Yujin Nagasawa (etd.), Scientific Approaches to the Philosophy of Religion; p. 255-274 (London: Palgrave Macmillan, 2012)

১২. https://www.nap.edu/read/5787/chapter/6#58

১৩. হুমায়ুন আজাদ, মহাবিশ্ব; পৃ. ৩০ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ জুন ২০০৭)

মুসলমানদের জ্ঞানের আগ্রহ ছিল না—এমন বাজে কথা বঙ্গীয় মাথামোটাদের দল ছাড়া আর কাউকে গেলানো যাবে বলে মনে হয় না; আগের প্রবন্ধেই আমরা প্রমাণ দেখেছি যে, এসকল দাবি অত্যন্ত নিম্নমানের মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। সে যাই হোক, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে নাস্তিকদের ব্লগ *ইস্টিশন* এ 'মৃত কালপুরুষ' নামের একজন ব্লগার লিখেছেন :

> "আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল মুসলিম খলিফা হযরত ওমর রা. এর নেতৃত্বে। যার ফলে বহু স্ক্রোল ও বই চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগারের অগ্নিকাণ্ড তাই সাংস্কৃতিক জ্ঞান ধ্বংসের প্রতীক। আজ পর্যন্ত বিশ্বের জ্ঞানী ব্যাক্তি ও গবেষকেরা এর অভাব অনুভব করেন।" [৯৪]

আসলেই কি তাই? চলুন একটু ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাক। বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডারের পরে খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতকের দিকে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন টলেমি-২। যিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে সুবিশাল এক গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, সে আমলেই এতে বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ!

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর শাসনকালে মিশর বিজিত হয়, সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস (ﷺ)-কে। বলা হয়ে থাকে আমর ইবনুল আস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে খলিফা উমার (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নাকি বলেন : গ্রীকদের এই বইগুলো যদি আল্লাহর কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় আর তাই সংরক্ষণের কোনও দরকার নেই; আর যদি সাংঘর্ষিক হয় তবে এগুলো ক্ষতিকর, তাই এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত।

উমার (ﷺ)-এর এই কথা শুনে নাকি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়! বইগুলো গোসলখানার পানি গরম করার কাজে পুড়ানো হতে থাকে। সব বই পুড়তে নাকি দীর্ঘ ছয়মাস লেগেছিল! বাংলার আরেক বিজ্ঞান প্রচারক সরাসরি মুসলিমদের ওপর দায় না চাপিয়ে আকার ইঙ্গিতে দোষ চাপিয়ে বলেন :

> "আলেকজান্দ্রিয়ার সেই লাইব্রেরি একদিন পুড়ে ছাই করে দেয়া হলো—ঠিক কারা সেটি করেছিল সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কথিত আছে লাইব্রেরির

---

৯৪. মৃত কালপুরুষ, প্রাচ্যের জ্ঞান ভান্ডার আলেজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ও ইসলাম ধর্ম। ইস্টিশন, ১০ সেপ্টেম্বার ২০১৭। [http://archive.is/KHF6n]

বইগুলো পুড়িয়ে গোসলখানার পানি গরম করা হয়েছে— দশ লক্ষের ওপর বই পুড়িয়ে শেষ করতে সময় লেগেছে ছয় মাস থেকেও বেশি। পৃথিবীর ইতিহাসে এর থেকে হৃদয়বিদারক কোনও ঘটনা আছে বলে জানা নেই।”[৯৫]

‘মৃত কালপুরুষ’ দাবি করেছেন, উমার (ﷺ)-এর এই বক্তব্য নাকি ‘বিভিন্ন হাদীসে’ বলা হয়েছে, যদিও এই দাবির পক্ষে কোনও রেফারেন্স তিনি দেননি। আর দিবেনই-বা কীভাবে, এ বিষয়ে কোনও হাদীসই যে নেই! এক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রচারক ‘কথিত আছে’ বলে গা বাঁচিয়েছেন; চালাক মানুষ!

মুসলমানরা মিশর বিজয় করে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে। আর ওপরে বর্ণিত ঘটনাটির প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় বাগদাদের চিকিৎসক আবদুল লতিফের (১১৬২-১২৩১ খ্রি.) সূত্রে। অর্থাৎ মুসলিমদের মিসর বিজয়ের প্রায় ৬০০ বছর পরে! অথচ মৃত কালপুরুষ নির্জলা মিথ্যা বলে বসলেন যে, বিভিন্ন হাদীসে নাকি এ ঘটনার উল্লেখ আছে!

আবদুল লতিফের পরে আল কিফতি (১১৭২-১২৪৮ খ্রি.) এই ঘটনাটি তার সূত্রে উল্লেখ করেন। এই দুজনের বরাতে সিরিয়ার ইসলামবিদ্বেষী খ্রিষ্টান যাজক বারহেব্রাইয়াস (যার অপর নাম আবুল ফারাজ) ঘটনাটি তার লেখায় উল্লেখ করেন। ১৬৬৩ সালে অ্যাডওয়ার্ড পোকক এই লেখার কিছু অংশের ল্যাটিনে অনুবাদ করেন, সেখান থেকেই এই কাহিনি পশ্চিমে প্রবেশ করে।[৯৬]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ড. আজাদের অন্যান্য অনেক দাবির মতো এই দাবিও ভিত্তিহীন, মিথ্যা। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* জানায় :

“আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর ও লাইব্রেরি খ্রিষ্টীয় ৩য় শতকের গৃহযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এর সম্পূরক লাইব্রেরিটি ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানরা ধ্বংস করে দেয়।”[৯৭]

গবেষক বার্নাবি রজারসনও এই কর্মের জন্য খ্রিষ্টানদের দায়ী করেছেন।[৯৮] *নিউ ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপিডিয়া*-র মতে, উমার (ﷺ)-এর নামে প্রচলিত এই ঘটনা বানোয়াট হওয়ার যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এই ঘটনা এখন মূলত মুসলমানদের

---

৯৫. ড. জাফর ইকবাল, আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ২৩ (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২)

৯৬. M. N. Musharraf & B. A. Dars, Who Burnt The Grand Library Of Alexandria? AJHISR, Vol.2, Issue 2, p. 16 (July 2016)

৯৭. Britannica Concise Encyclopedia, p. 44 (Encyclopædia Britannica, Inc. 2006)

৯৮. বার্নাবি রজারসন, দ্য প্রফেট মুহাম্মদ; পৃ. ৪৯ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৮)

ওপর খ্রিষ্টানদের আক্রমণের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৯৯] নাস্তিক ব্লগার মৃত কালপুরুষ বলেছেন,

> "প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এই অগ্নিকাণ্ডের সময় নিয়ে বিতর্ক পাওয়া যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরে। তাদের ভাষ্য এটা মুসলমানেরা করেনি। কে এই অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিলেন তা নিয়েও মতান্তর তৈরি করা হয়েছে। ... তবে এটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য যে, ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর দ্বারা এই লাইব্রেরি ভস্মীভুত হয়।"[৯৯]

তার লেখা পড়ে মনে হয়, মুসলিমরা ইচ্ছে করে এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে যাতে সত্য ধামাচাপা দেওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার এই দাবিও নির্জলা মিথ্যা! মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট গবেষণার পরই এই ঘটনার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।[১০০] তা ছাড়া অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বিতর্কের নজীর নাস্তিকদের পরমপূজ্য পশ্চিমা গবেষকদের লেখাতেই ভুরিভুরি পাওয়া যায়। যেমন, ইসলামের কড়া সমালোচক প্রাচ্যবিদ পি.কে. হিট্টি বলেন :

> "খলিফার (উমারের) আদেশে (সাহাবি) আমর (ইবনুল আস) দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ শহরের অগণিত গোসলের পানি গরমের চুল্লি জ্বালানোর কাজে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের কিতাবাদি ব্যবহার করেছিলেন—এই গল্প এমনই এক কিচ্ছা, যা অলীক কাহিনি হিসেবে ভালো হলেও ইতিহাস হিসেবে নিকৃষ্ট। এই বিশাল টলেমীয় গ্রন্থাগারটি প্রায় ৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার পুড়িয়ে দেন। অপর গ্রন্থাগার যা ডটার লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটা প্রায় ৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের হুকুমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাই আরবদের মিশর জয়ের সময় উল্লেখ করার মতো গ্রন্থাগারই আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল না। সে কারণেই সামসময়িকদের কেউই আমর বা উমারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ চাপায়নি। সর্বপ্রথম এই গপ্পো আবদুল লতিফ আল-বাগদাদি বর্ণনা করেন বলে প্রতীয়মান হয়, যার মৃত্যু হয় ৬২৯ হিজরিতে (১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ)। কেন যে তিনি এই আকাজ করলেন, তা তো আমরা জানি না, তবে তার গপ্পোই পরবর্তী কালে কপি করে তাতে রঙ চড়ানো হয়েছে।"[১০১]

৯৯. Alexandria Library, New World Encyclopedia, 10 March 2016. Availabe at: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Alexandria_Library

১০০. ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, উমার ইবনুল খাত্তাব; পৃ. ৪৮৩-৪৮৫ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা : কালান্তর প্রকাশনী, মার্চ ২০১৮)

১০১. Philip K. Hitti, History of The Arabs; p. 166 (Macmillan International Higher Education, Sep 26, 2002)

ড. আজাদ উনার আলোচ্য বই যার নামে উৎসর্গ করেছেন সেই অজ্ঞেয়বাদি বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন :

"আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি খলিফা (উমার) ধ্বংস করেছিলেন—এই গল্প প্রত্যেক খ্রিষ্টানকেই শেখানো হয়। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, এই লাইব্রেরি বারবার ধ্বংস হয়েছে, আবার গড়া হয়েছে। সর্বপ্রথম একে ধ্বংস করেন (সম্রাট) জুলিয়াস সিজার, আর শেষবার যখন একে ধ্বংস করা হয় সে সময়টা ছিল নবি (মুহাম্মাদ) এর জন্মেরও আগে।" [১০২]

ইসলামের কড়া সমালোচক বার্নাড লুইস অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেন :

"চুলচেরা বিশ্লেষণে এই গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। কোনও প্রাচীন ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমনকি (তৎকালীন) খ্রিষ্টানদের লেখাতেও নয়। এই ঘটনার (প্রথম) উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় তেরো শ শতকে। আর যাই হোক না কেন, সেই বিশাল গ্রন্থাগারটি অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে আরবদের আবির্ভাবের আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"[১০৩]

লুইসের মতে এই কল্পকাহিনি ১৮ শ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে মিথ্যা, বানোয়াট ও অসম্ভব হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।[১০৪] ড. আজাদ এত খুঁজতে যাননি, পশ্চিমের কোনও ধর্মবিদ্বেষী বইয়ে পেয়েছেন, আর যাচাই ছাড়াই নিজের বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্গে রবে সুরার পাত্র

নৈতিকতার প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যে বিষয়টির আলোচনা চলে আসে তা হলো মদ্যপান। মদ সম্পর্কে ড. আজাদ লিখেন,

---

১০২. Bertrand Russell, Human Society in Ethics and Politics; p. 218 (Routledge, Oct 15, 2013)

১০৩. Bernard Lewis, The Arabs in History; p. 53 (Oxford: Oxford University Press, Sixth edition, Reissued 2002)

১০৪. Bernard Lewis, The Vanished Library. New York Review of Books, September 27, 1990 Issue. Available at: https://www.nybooks.com/articles/1990/09/27/the-vanished-library-2/

"মদের বিরুদ্ধে মুসলমান জগতে একটা বড়ো অপপ্রচার চলে ব'লে এই চমৎকার বস্তুটির ভাবমূর্তি বেশ নষ্ট হয়ে গেছে... স্বর্গে মদ থাকবে, মর্তেও এটা খারাপ নয়।" (পৃ. ১৪৪)

মদ ড. আজাদের বড্ড শখের জিনিস, বড্ড আনন্দের জিনিস। তাই মদ সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা তিনি খুব একটা বাছবিচার না করেই অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মদ নাকি মুসলমানের কল্পনাকে বেশ ভরে রাখে! এর জন্য দলিল হিসেবে তিনি আরবি-ফারসি কবিতার উদাহরণ টেনেছেন! আরবি কবিতা ও আরব্যরজনি নাকি মদের গন্ধে ভরপুর! দুজন কবির উদাহরণ টেনে এর দায় পুরো মুসলিম সমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন! আহা, চিন্তার কী বেহাল দশা!

তিনি বলেছেন, শুরুতে নাকি ইসলামে মদ প্রশংসনীয় ছিল; পুরোই ভুল অনুধাবন। এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথমদিককার আয়াতে বলা হয়েছে, মদের কিছু ভালো দিক আছে, তবে সেটার চেয়ে খারাপ দিক অনেক বেশি। এটা প্রশংসা কীভাবে হয়? কেউ যদি বলে, অমুক ছেলেটা বেশ ভালো, খালি একটু নাইট ক্লাবে রাত কাটায় আরকি, তা হলে কী এটা প্রশংসা হলো? নাকি, তার একটা কর্ম দ্বারাই বাকি সব কাজের ওপর কালিমা পড়ল? ইতিহাস জানায়, অনেক সাহাবিই মদ্যপান করতেন, একমাত্র ইসলাম এসেই পর্যায়ক্রমে আরবে মদ হারাম করে। আধুনিক কালে যে কাজ আমেরিকা চেষ্টা করেও পারেনি (১৯২০-১৯৩৩)[১০৫], মরুর বুকে সে কাজ করে দেখিয়েছেন উম্মি নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)।

ড. আজাদ আরও বলতে চেয়েছেন, পৃথিবী জুড়েই মুসলমান মদ্য পান করে; আর আরবরা নাকি পান করে না, বরং মাছের মতো গিলে! (পৃ. ১৪৫) কিন্তু *পিয়ার রিভিউড জার্নাল* পেপার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (*WHO*) ভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করছে। সুপরিচিত মেডিকেল জার্নাল *দ্য ল্যানসেট* এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ভাষ্য, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে মদ্যপানজনিত সমস্যাগুলো সীমিত।[১০৬]

২০১৪ সালে প্রকাশিত *WHO*-এর এক ঢাউস সাইজের রিপোর্ট অনুযায়ী—মুসলিম দেশগুলোতে বাৎসরিক পিউর অ্যালকোহল পানের পরিমাণ ১ লিটারেরও কম! যেখানে আমেরিকা ও ইউরোপে এর পরিমাণ গড়ে যথাক্রমে ৮ ও ১১ লিটার

---

১০৫. The rise and fall of prohibition. CBS, Oct 2, 2011. Available at: https://youtu.be/LzPXRkjH4gw

১০৬. K. B. Lankarani & Reza Afshari, Alcohol consumption in Iran. The Lancet, Vol. 384, Issue 9958, p. 1927-1928 (November 29, 2014)

প্রায়। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ৯০% শতাংশেরও বেশি মানুষ সারাজীবনে কখনোই মদ পান করেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রাচ্যে শুধু মুসলিমরাই থাকে না, অমুসলিম অনেকে মানুষ বসবাস করেন যারা মদপান করে থাকেন; বাকি থাকা ১০% এর মাঝে তারাও অন্তর্ভুক্ত। [৩৭]

ড. আজাদ খুশবন্ত সিংয়ের কথা বিশ্বাস করে বলেছেন, পাকিস্তানে নাকি সব ধনীর বাড়ীতে মদ চুইয়ে চুইয়ে পড়ে! (পৃ. ১৪৫) কিন্তু *WHO*-এর এই বিশাল রিপোর্ট জানাচ্ছে, পাকিস্তানে বাৎসরিক পিওর এলকোহল পানের পরিমাণ সামগ্রিক হিসেবে *O* লিটার![১০৭] এখন আপনি খুশবন্ত সিংয়ের কথা মানবেন, নাকি *WHO*-এর গবেষণাপত্র মানবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। মদের অন্ধভক্ত ড. আজাদ আরও বলেছেন,

> "মদ্যপান একেবারেই খারাপ নয়; আমি খাই, শামসুর রাহমান খান এবং খায় লাখ লাখ বাঙালি ও মুসলমান, এবং খেয়েছেন গ্যালিলিও, নিউটন, শেক্সপিয়র, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন; খান অজস্র সচিব, সম্পাদক, অধ্যাপক, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, বিচারপতি, দূত, পুলিশ।" (পৃ. ১৪৬)

একেবারেই খারাপ নয়! আসলে মানুষ যখন তার প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা পুরোপুরি আক্রান্ত হয়ে যায় তখন সত্য-মিথ্যা, ভালোমন্দ চেনার ন্যূনতম ক্ষমতাটুকুও তার আর থাকে না। তখন সে পশুর ন্যায় বিবেকহীন জীবে পরিণত হয়। চলুন পাঠক আজাদ সাহেবের মদ একেবারেই খারাপ নয় এ দাবি কতটুকু সঠিক। ভাবলাম অন্তর্জাল ঘুরে দেখি, আজাদ সাহেবের এই অনুমান সত্যি কি না! অন্তর্জাল ঘুরে যে বাস্তবতা চোখের সামনে ফুটে উঠল তা সত্যিই স্তম্ভিত করে আমাদের!

সুপরিচিত মেডিকেল জার্নাল *দ্য ল্যানসেট*-এ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বড়-মাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানাচ্ছে, একটুআধটু মদ্যপান শরীরের জন্য ভালো বলে যে প্রচারণা চালানো হয়, তা কেবলই মিথ! মদ্যপানের কোনও নিরাপদ সীমা নেই, সামান্য পানও ক্ষতিকর![১০৮] *WHO*-এর প্রতিবেদন জানায়, মদ্যপানের কারণে

---

১০৭. WHO, Global Status Report on Alcohol and Health 2014; p. 292 (Geneva: World Health Organization)

১০৮. University of Washington School of Medicine. "No safe level of alcohol, new study concludes: Three million deaths in 2016 were attributed to alcohol, which carries 'massive health risks,' according to paper." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 August 2018

প্রতি বছর ৩ মিলিয়নেরও (৩০ লক্ষ!) বেশি মানুষের মৃত্যু হয়![১০৯]

শুধু যুক্তরাজ্যেই প্রতি বছর মদ্যপান জনিত অপরাধ, রোগ, কর্মহীনতা প্রভৃতি কারণে ৫২ বিলিয়ন পাউন্ড (৫২০০ কোটি পাউন্ড) অপচয় হয়![১১০] কেবল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস এর পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এই এলাকাগুলোতে যত সহিংস-ঘটনা ঘটে তার ৪০% এরও বেশি ঘটে মদ্যপানের কারণে।[১১১] পশ্চিমে ধর্ষণ, পারিবারিক অশান্তির প্রভৃতিরও অন্যতম বড় কারণ এই মদ্যপান।

মদ্যপান বিশ্বব্যাপী নানাবিধ রোগব্যাধির অন্যতম কারণ। মানবদেহের এমন কোনও সিস্টেম নেই, যা মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত।[১১২] ২০১৭ সালে শুধু ইংল্যান্ডেই মদ্যপানজনিত কারণে হাসপাতালে ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ভর্তি হয়েছে![১১৩] আসলে এত স্বল্প পরিসরে মদ্যপানের ক্ষতি বলে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়। গবেষক পাঠকগণ আরও বিস্তারিত জানতে রেফারেন্সগুলো ঘেঁটে দেখতে পারেন।

ড. আজাদ বলেছেন, কোনও সচিব সচিবালয়ে গিয়ে মাতলামো করেছে এমনটা কখনো ঘটেনি! (পৃ. ১৪৫) অথচ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আগের রাতে পার্টি কলিগদের সাথে কয়েক বোতল মদ খেয়ে টাল হয়ে অফিসের কাউচে ঘুমিয়ে পড়েন। যার ফলে পরের দিন গুরুত্বপূর্ণ ভোটটাই তিনি দিতে পারেননি, তার সাংসদগণ তাকে টেনেও কাউচ থেকে নড়াতে পারেনি! এর জন্য বেশ সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। যদিও এই তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল প্রায় আট বছর![১১৪] এদিকে যুক্তরাজ্যের সাংসদ ড. সারাহ ওলাস্টনের অভিজ্ঞতা জানায়, কতিপয় সাংসদ এত মদ খেয়ে আসেন যে, হাউস অব কমন্স-এ দাঁড়িয়ে থাকাই তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়।[১১৫]

---

১০৯. প্রাগুক্ত; p. 46

১১০. Denis Campbell, Alcohol-related crime, lost output and ill health costs UK £52bn a year. The Gurdian, 2 Dec 2016

১১১. Institute of Alcohol studies, Factsheet: Crime and Social Impacts of Alcohol; p. 05

১১২. Davidson's Principles and Practice of Medicine; p. 1194-1195 (Elsevier, 23 edition, April 2018)

১১৩. May Bulman, NHS: Alcohol-related hospital admissions hit record high after addiction support services slashed. The Independent, 11 February 2018

১১৪. Tony Abbott: Australian ex-PM was 'too drunk' to make vote. BBC, 25 August 2017

১১৫. Tim Ross, MPs often 'too drunk to stand' in Commons. The Telegraph, 05 Oct 2011

আরেক মন্ত্রী পার্লামেন্টে মদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গিয়ে শেষমেশ চাকরিটাই খুইয়েছেন।[১১৬] তাও ভালো, এই লোকগুলো জামাকাপড় খুলে বসেননি! ভারতে তো মদের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন এক বিচারক! পরে গায়ের টি শার্টটিও খুলে ফেলেন তিনি![১১৭]

ড. আজাদ আরও কল্পনা করেছেন, কোনও অধ্যাপক ক্লাশে গিয়ে মাতলামো করেছে, এমন নাকি কখনো ঘটেনি! পুরাই ভুল কল্পনা। ইন্টারনেট তথা অন্তর্জাল ঘাটলে ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যায়, একেবারে কিন্ডারগার্ডেন থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাতাল হয়ে ক্লাসে এসেছেন। যেমন জর্জিয়ার এক অধ্যাপক বিয়ারের পাঁচখানা ক্যান একদমে সাবাড় করে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে টাল হয়ে স্টুডেন্টস রুমে ঘুমিয়ে গেছেন।[১১৮] আরেক অধ্যাপক বেচারা ক্লাসে মাতাল অবস্থায় বিয়ারের ক্যান নিয়ে ঢুকে শেষমেশ চাকরিটাই হারিয়েছেন।[১১৯] শরৎচন্দ্রের *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসেও পাওয়া যায় অধ্যাপক শিবনাথ মদ খাওয়ার অপরাধে চাকরি হারিয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে শরৎবাবু আজাদ সাহেবের মতো এত ইমপ্র্যাকটিকেল নন।

এদিকে এক হাই স্কুল শিক্ষকেরও একই অবস্থা হয়েছে। মাতাল হয়ে ক্লাসে এসে উল্টাপাল্টা আচরণ করার কারণে তিনিও চাকরি হারিয়েছেন।[১২০] তবে সবাই তো আর চাকরি হারান না, কেউ অ্যারেস্ট হন, কাউকে আবার শোকজ করতে বলা হয়। যেমন, এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা মাতাল অবস্থায় ব্যাগে গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে ক্লাসে এসে লালদালানের চাল খেয়েছেন শেষমেশ।[১২১] কেউ আবার ক্লাসে এসে হট ওয়াটার ব্যাগ থেকে মদ খায়! কেউ কেউ লুকোছাপা ছাড়াই সরাসরি মদের বোতল মুখে তুলে নেয় শিক্ষার্থীদের সামনেই। আর এর সাথে মাতলামি আর অশোভনীয় ব্যবহার তো

---

১১৬. Tanzanian President fires minister accused of being drunk in parliament. CNN, May 22, 2016

১১৭. মদ খেয়ে, হাফপ্যান্ট পরে আদালতে বিচারক. বিবিসি বাংলা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ২০১৫

১১৮. Professor is arrested after drinking up to five cans of beer then driving to university and passing out in the student center. The Daily Mail, 12 October 2017

১১৯. Visiting professor vacated for alleged public intoxication. The Purdue Exponent, Apr 30, 2018.

১২০. Sheriff: Alabama high school teacher was drunk in class. Fox News, March 28, 2018

১২১. Primary school teacher 'found drunk in class with loaded gun in her handbag'. The Sun, 31st March 2017

আছেই।[১২২] আরেকজন শিক্ষিকা তো জয়েনিং এর প্রথম দিনই মাতাল অবস্থায় চলে এসেছেন। ও আরেকটা কথা বলিনি, বেচারি প্যান্ট পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন![১২৩]

ভারতে মদ্যপান সংক্রান্ত আরও মজার ঘটনা ঘটেছে। ছত্রিশগড়ে এক মাতাল শিক্ষক ক্লাসে এসে বাচ্চাদের ইংরেজি বর্ণমালা শিক্ষা দিয়েছেন, *D* ফর দারু (অর্থাৎ মদ), *P* ফর পিয়ো (খাও)! [১২৪] আহা, কী উন্নতমানের শিক্ষা! ড. আজাদ এই ঘটনা জানলে বেশ খুশি হয়ে প্রশংসা করতেন মনে হয়! এ ছাড়াও শিক্ষক মদের ঘোরে ক্লাসে হুঁশ হারিয়ে ঢুস করে পড়ে যাওয়ার নজিরও বিরল নয়, অন্তর্জাল ঘাটলেই এমন ঘটনা বেশ পাওয়া যায়।

এতক্ষণের আলোচনায় সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন যে-কেউ ইসলামে মদ হারাম করার প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে পারবে। তবে যদি সে প্রবৃত্তিপ্রবণ হয়, তবে এমন আলোচনা পাতার-পর-পাতা লিখে গেলেও সে সচেতন হবে না; কারণ তার আর পশুর মাঝে কোনও তফাৎ নেই।

এ বিষয়ে আলোচনার ইতি টানার আগে আবূ নুয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ড. আজাদ মদ নিয়ে কবিতা লিখার প্রসঙ্গে আবূ নুয়াসের নাম উল্লেখ করেছেন, তাকে মদের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত করেছেন। বিবিসি-র এক আর্টিকেলে আবূ নুয়াস সম্পর্কে বলা হয়েছে—*The Arab poet who worshipped wine* অর্থাৎ সেই আরব কবি যে মদের উপাসনা করেছিল। মদের প্রতি এই অনুরাগের কারণে যথাযথ সম্মান তিনি পেয়েছেন ইসলামের সমালোচনাকারী প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকে, তার কবিতার নতুন ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে কিছুদিন আগে।

তবে যে ইতিহাসটা প্রাচ্যবিদদের লেখায় পাওয়া যাবে না তা হলো, জীবনের শেষ বিকেলে এসে আবূ নুয়াসের অন্তরে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল। স্বীয় কর্মে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল সে মহান রবের কাছে। অন্তত তার সর্বশেষ কবিতা সেই স্বাক্ষ্যই বহন করে :

"হে আমার রব! যদিও আমার গুনাহ অনেক বেশি,
আমি জানি তবু, ক্ষমা তোমার আরও অনেক বেশি।

---

১২২. Teacher 'got drunk in classroom as she drank booze from hot water bottle and acted "nasty" towards pupils". The Mirror, 23 Feb 2018; Arizona math teacher arrives drunk to class and keeps drinking: police. Reuters, 14 Aug 2014

১২৩. Cops Say Teacher Showed Up Drunk, Pantless to Work. ABC News, 7 Aug 2014

১২৪. D for 'Daaru', P for 'Piyo': A Drunk Teacher's Class in Chhattisgarh. NDTV, July 12, 2015

আমি তোমায় ডাকছি সবিনয়ে, যেভাবে আমায় বলেছ তুমি,
যদি তুমি ফিরিয়ে দাও মোরে, তবে কে করবে রহম আমারে?
যদি ভালো মানুষই কেবল তোমায় ডাকে,
তবে পাপীরা যাবে আর কার কাছে?
আর কোনও ঠাঁয় নেই আমার, শুধু তোমারই ভরসায় ভাসমান,
আশা রাখি তোমার সৌম্য ক্ষমার, আরে আমি যে মুসলমান।" [১২৫]

আবূ নুয়াস ফিরতে পেরেছিলেন, কিন্তু আবূ নুয়াসের কবিতা দিয়ে মদ জায়েজ করা ড. আজাদ ফিরতে পারেননি রবের ক্ষমার দিকে। কী নির্মম পরিহাস!

সব কিছু ভেঙে পড়ে?

নৈতিকতার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে প্রসঙ্গে ড. আজাদ টানা আট পৃষ্ঠা অপচয় করেছেন তা হলো যৌনতা-সংক্রান্ত বিষয়। অধ্যাপক তনয়া মৌলি আজাদের লেখনীতেও এ সংক্রান্ত বিরক্তি ফুটে ওঠে। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেন :

"সত্যি বলতে কী বাবার কিশোরসাহিত্য ও কবিতাগুলো আমাকে টানলেও তাঁর উপন্যাসগুলো আমাকে তেমন টানেনি। মনে হতো, সংসার সমাজ এগুলোকে তিনি বড় বেশি ভঙ্গুর করে দেখাতে চেয়েছিলেন।... আর মাত্রাতিরিক্ত সেক্সের প্রাধ্যান্য থাকত তার উপন্যাসে। তাই মাঝে মধ্যে বিরক্তই হতাম।" [১২৬]

আমার অবিশ্বাস গ্রন্থে ড. আজাদ মূলত বাধাহীন, সীমাহীন যৌনতার পক্ষে প্রাণপনে সাফাই গেয়েছেন। কাম নিয়ে তিনি দিনরাত ভেবেছেন। এতই ভেবেছেন, যে ভাবতে ভাবতে বলে বসেছেন, আধুনিক বিশ্বের সবকিছু—সন্তান, কবিতা, নভোযান, কম্পিউটার—জন্মেছে কাম থেকে! (পৃ. ১৩৫) নভোযান আর কম্পিউটার কীভাবে কাম থেকে জন্ম নিল, তা আমার মাথায় ঢুকেনি!

উনার ধারণা কাম নিয়ে শুরুতে নাকি মানুষের বিশেষ উদ্বেগ ছিল না, কামকে তারা তখন নৈতিকতার মানদণ্ডে পরিণত করেনি, পুরুষ ও নারী উপভোগ করেছে অপরাধবোধে না ভোগে। (পৃ. ১৩৬) কিন্তু উনার এই দাবির পক্ষে কোনও রেফারেন্স

---

১২৫. The Last Poem Of Abu Nuwas, PoemHunter. Available at: https://www.poemhunter.com/poem/the-last-poem-of-abu-nuwas

১২৬. মৌলি আজাদ, হুমায়ুন আজাদ আমার বাবা; পৃ. ২৭

দেননি। ইসলাম আমাদের জানায় উনার এই দাবি ভুল, মানব সভ্যতার শুরু থেকেই এই বিষয়ে নিয়ম-রীতি ছিল। কালের বদলে মহান আল্লাহ (ﷻ) এই বিধান দ্বারা শুরুর বিধানকে প্রতিস্থাপন করে দেন।[১২৭]

ড. আজাদ মুক্ত কামের পক্ষপাতি। উনার এই অবস্থানকে জোরালো করতে তিনি দুটি বিষয় টেনে এনেছেন। এক. তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে থাকা কাম-বিয়য়ক উদ্ধৃতি টেনে এনে বোঝাতে চেয়েছেন—মুক্ত কামের উদাহরণ ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে। দুই. বিভিন্ন সাধু-সন্তদের অকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মগুরুরা নিজেরাই একনিষ্ঠ নয়; তাই তাদের কাম-বিষয়ে একনিষ্ঠতার আহ্বান (বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক কর্ম না করা) পুরোটাই ফাঁকা। উনার ধারণা, সন্তরা নিজেরা নাকি চিরকৌমার্যব্রত পালন করেননি; যৌবনে প্রচুর কামে ক্লান্ত হয়ে নাকি ঘেন্না ধরে যায় তাদের। তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করেন কামের বিরুদ্ধে; এবং এক সময় গির্জা তাদের অভিষিক্ত করে সন্ত হিসেবে। (পৃ. ১৩৭)

প্রথম বিষয়ে আলোচনায় তিনি বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে একটি উদ্বৃতি দিয়েছেন। ঘটনাটি আসলেই অদ্ভুত ও বিরক্তির উদ্রেককারী। বাইবেলে আরও অনেক জায়গায় নবিদের নামে অদ্ভুত-অশালীন সব কাহিনি বর্ণিত আছে।[১২৮] এসব বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে বাইবেল অনেক বিকৃতির স্বীকার হয়েছে; তাই নবিদের নামে বর্ণিত এসকল অশ্লীল ঘটনাগুলো আমরা সেই বিকৃতির অংশই মনে করি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ সাধু-সন্তদের ব্যাপারে, এ বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। যৌনতা, ক্ষুধা-নিদ্রা-বিশ্রামের মতোই প্রাকৃতিক বিষয়। মানুষের সুস্থ জীবনের জন্য সবই প্রয়োজন। তবে কেউ যদি ভেজাল বা অস্বাস্থ্যকর জাংক ফুড খায়, নিয়ম ছাড়া অতিরিক্ত বা অল্প ঘুমায়, বিশ্রাম ঠিকমতো না নেয়; তা হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। ঠিক তেমনিভাবে, শারীরিক চাহিদার প্রয়োগ যদি যথাযথ উপায়ে না হয়, কেউ যদি বিকৃত পন্থা বেছে নেয়, লাগামহীন যৌনতা খুঁজতে চায়; তা হলে সেই ব্যক্তি ও সেই সমাজও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

খ্রিষ্টধর্ম-সহ অন্যান্য ধর্মে বৈরাগ্যবাদ প্রচলিত আছে। যেখানে যাজক বা সন্তরা পুরোজীবন বিবাহ বা নারী-সংসর্গ ব্যতীত কাটাতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু এই আচরণ স্বাভাবিক নয়, ফলে তাদের অনেকেই এই স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে অন্যায় পথের

---

১২৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবিদের কাহিনী; খণ্ড ০১, পৃ. ৪২-৪৮

১২৮. আদিপুস্তক ১৯: ৩১-৩৮, ৩৫: ২২, ৩৮:২-১৮, ২ শামুয়েল ১১: ১-২৭, ১৩:১১-১৪ ইত্যাদি

আশ্রয় নিয়েছেন। ইসলামে এই বৈরাগ্যবাদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবারকে ইবাদাতের উপকরণ বানানো হয়েছে, এমনকি স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কও ইসলামে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্য কোনও ধর্মে যার নজির নেই।

অপরদিকে মানুষের এই স্বাভাবিক চাহিদাকে দমিয়ে সাধু হওয়ার চেষ্টার ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে অন্তর্জালের জগৎ ঘুরে দেখলে। ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যায়; জানা যায় খ্রিষ্টান যাজকদের লালসা থেকে রেহাই পায় না নারী, পুরুষ এমনকি শিশুরাও— হোক সে ছেলে শিশু বা মেয়ে শিশু! পাঠকরা বিস্তারিত জানতে চাইলে পুলিৎজার প্রাইজ নোমিনি, সাংবাদিক ফ্রাংক ব্রুনি ও এলিনর বার্কিট রচিত *A Gospel of Shame : Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church* বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তা ছাড়া হিন্দুধর্মেও দেবদাসী বা সেবাদাসী প্রথা পাওয়া যায়, যেখানে পুরোহিতদের লালসার শিকার হয়েছেন নারীরা, এখনও তা চলছে।[১২৯]

কাম সম্পর্কে ড. আজাদের দৃষ্টিভঙ্গির সার সংক্ষেপ হিসেবে নিচের লেখাটুকু উদ্বৃত করা যেতে পারে :

> "ইউরোপ-আমেরিকায় নারী-পুরুষ উভয়েরই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু বহুকাম নিষিদ্ধ নয়; সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই একই সময়ে ও সারা জীবনে উপভোগ করছে বহু নারী ও পুরুষ।... ইউরোপ আমেরিকা এখন সমকাম ও সমলৈঙ্গিক বিয়ে, চলছে স্বামীস্ত্রী বিনিময়, এবং সেখানে গোপনে চলছে সম্মিলিত বিয়ে বা কাম, ও আরো অজস্র রীতি।... যদি কোনও পুরুষ একাধিক নারীর সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সবাই যদি তাতে সুখী হয়, তাতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়; এবং কোনও নারী যদি একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সবাই যদি তাতে সুখী হয়, তাতেও কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। তাদের ওই জীবনযাপন অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না, সুখী করে তাদের; তাই তা অনৈতিক নয়।" (পৃ. ১৪২)

ড. আজাদের ভালো-মন্দের মানদণ্ড কেবলই ইউরোপ-আমেরিকা! তারা যা করবে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জারজের ন্যায় তিনি ও সমমনারা তাই করতে চান। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, একদিন সমাজ থেকে উঠে যাবে কাম ও অধিকারভিত্তিক বিবাহ, পরিবার, ও নৈতিকতা! অর্থাৎ পশুর মতো মানুষ কামাভ্যাস গড়ে তুলবে এমন স্বপ্নে বিভোর তিনি। তিনি কামপ্রিয় বলে শুধু পশ্চিমাদের এই অভ্যাসটাই ফোকাস

---

১২৯. অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভারতের প্রাচীন দেবদাসী প্রথা এক জাতীয় লজ্জা. ডয়চে ভেলে, ২৩.০২.২০১৪। দেখুন: https://www.dw.com/bn/ভারতের-প্রাচীন-দেবদাসী-প্রথা-এক-জাতীয়-লজ্জা/a-17450658

করেছেন। কিন্তু এর কুফলের দিকে তাকানি, তাকালে থলের বেড়াল বেরিয়ে যাবে। চলুন আমরা একটু তাকাই এবং শিউরে উঠি!

পশ্চিমে সাম্প্রতিক কালে বিবাহের সংখ্যা কমেছে ব্যাপক হারে, আর তারি সাথে বিবাহ-বহির্ভূত কাম ও লিভ টুগেদারের ফলে পশ্চিমে জারজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ! ২০০৭ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০% নবজাতক হলো জারজ সন্তান।[১৩০] *Eurostat*-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২০১৬ সালে জন্মানো বাচ্চাদের প্রায় ৪০% ই জারজ বাচ্চা! এই দেশগুলোর ভেতর প্রথম স্থানে আছে ফ্রান্স, প্রতি দশজনে ছয়জনই জারজ বাচ্চা![১৩১]

এখন তথাকথিত মুক্তমনা নামের সংকীর্ণমনাদের কেউ ঘেউ করে উঠতে পারে, তাতে কী? জারজ হলে সমস্যা কী? কারও তো ক্ষতি হচ্ছে না! কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে, বিয়ের আগেই যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া ছেলে-মেয়েদের ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার প্রবণতা প্রায় ৩ গুণ বেশি![১৩২] তা ছাড়া গবেষকদের, মতে লিভ টুগেদারে থাকা নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিবাহের চেয়ে কম টিকে। গবেষক স্কট স্ট্যানলি এবং গ্যালেনা রোডস দেখিয়েছেন যারা বিবাহের পূর্বে লিভ টুগেদার করে তারা নিজেদের বিয়ে নিয়ে কম সন্তুষ্ট থাকে, ফলে ডিভোর্সের সম্ভাবনা বাড়ে (*cohabitation effect*)।

সমাজবিজ্ঞানী মাইকেল পোলার্ড ও ক্যাথলিন এম. হ্যারিস তাঁদের গবেষণায় খুঁজে পান, লিভ টুগেদারে থাকা পুরুষ, তার নারী সঙ্গীর তুলনায় সম্পর্কের প্রতি কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে (*commitment gap*)। কারণ হিসেবে ড. জন কার্টিসের উল্লেখ করা সাম্প্রতিক গবেষণার কথা বলা যেতে পারে; যা থেকে জানা যায়, লিভ টুগেদারকে নারীরা বিবাহের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হিসেবে দেখলেও, পুরুষরা টেস্ট ড্রাইভ বা মেয়েটাকে একটু চেখে দেখার জন্য লিভ টুগেদার করে।

গবেষক স্ট্যানলি এবং রোডস-এর গবেষণা জানায় বাগদানের আগে যারা স্বামীর সাথে লিভ টুগেদার শুরু করে তাদের ডিভোর্সের হার ৪০% বেশি। ড. শীলা কেনেডি ও ল্যারি বাম্পাস এর সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে, লিভ টুগেদারের ফলে

১৩০. The Future of Children: Fragile Families; vol. 20, No. 02, p. 03 (Princeton University and The Brookings Institution, Fall 2010)

১৩১. Alice Tidey, Number of births outside marriage rise in EU. Euronews, 16 April 2018

১৩২. Study links teen sex to depression, suicide. The Washington Times, 3 June 2003

জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের ৬৫% তাদের বয়স ১২ হওয়ার আগেই পিতা-মাতার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়; বিবাহিতদের ক্ষেত্রে এই হার ২৪%। ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির ন্যাশনাল ম্যারেজ সেন্টারের পরিচালক ডব্লিউ. ব্র্যাড উইলকক্স বলেন :

> "বিবাহের সাথে তুলনা করলে, লিভ টুগেদারে অঙ্গীকার, স্থিতি, যৌননিষ্ঠা যেমন কম, তেমনি রোমান্টিক সঙ্গী ও তাদের সন্তানদের নিরাপত্তাও কম।" [১৩৩]

এসকল ভঙ্গুর পরিবার ও তাতে জন্মানো শিশুরা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সামাজিক নানা সমস্যার কারণ হিসেবে কাজ করে। ভঙ্গুর পরিবারগুলোতে বাচ্চারা যথাযথ যত্ন পায় না, পড়াশোনার সুযোগ কম পায়; এসকল বাচ্চারা কগনিটিভ টেস্টে কম নাম্বার পায়। পাশাপাশি এদের আচরণও মারমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এদের একটা বড় অংশ নানা রকম অপরাধ ও নেশায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে পুরো সমাজের ওপর এই বিবাহ-বহির্ভূত কামের খারাপ প্রভাব পতিত হয়। [১৩৪] ড. আজাদ উনার প্রবৃত্তিপ্রবণ মায়োপিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এতদূর ভাবেননি।

ড. আজাদ যে মুক্ত কামের স্বপ্ন দেখেছেন, সেটার অন্যতম আরেকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো—ধর্ষণ বৃদ্ধি! মুক্ত কাম কীভাবে ধর্ষণ বৃদ্ধি করে তা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। তবে আমি শুধু একটি কারণ নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। ড. আজাদ মনে করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য (!) হলগুলোতে আলাদা ব্যবস্থা রাখা দরকার! [১৩৫] উনার প্রিয় পশ্চিমা দেশগুলোতে আলাদা ব্যবস্থা রাখা দরকার হয় না, এমনিতেই যত্রতত্র শারীরিক চাহিদা পূরণ করা সেখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার। সুখের সন্ধানে তাদের কেউ কেউ তথাকথিত ভালোবাসার নামে, কেউ আবার এমনিতেই এক রাতের জন্য বিছানায় অন্যকে নিয়ে যায়। একে হুক আপ কালচার বলা হয়। এটি এতটাই সাধারণ যে, অনেককে না চাইলেও এসব কাজে জড়াতে হয়, শুধু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য।

ড. আজাদ ও উনার ভাবশিষ্যরা এমন পরিবেশ বাংলাদেশেই চান। কিন্তু তারা জানেন না, পশ্চিমেই এমন পরিবেশ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে সেক্যুলার মানুষেরা।

---

১৩৩. Terry Gaspard, Will Living Together Without Marriage Damage Kids? The Huffpost, 24 March, 2015

১৩৪. The Future of Children: Fragile Families; vol. 20, No. 02, p. 87-104

১৩৫. চঞ্চল আশরাফ, সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ, যখন আমি তার ছাত্র; কিস্তি ৬, বিডিনিউজ২৪, ৬ অক্টোবর, ২০০৮। দেখুন: http://arts.bdnews24.com/?p=1925 [http://archive.is/aU08E].

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এর আর্টিকেলে এ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন ডনা ফ্রেইটাস। [১৩৬] হুক আপ সংস্কৃতির ক্ষতিকর দিক নিয়ে তিনি বই লিখেছেন *'The End of Sex : How Hookup Culture Is Leaving a Generation Unhappy, Sexually Unfulfilled, and Confused About Intimacy* শিরোনামে। এই মুক্ত কাম সংস্কৃতির কবলে পড়ে অসংখ্য মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে; তাদের অনেকেই বুঝতে পারছে, এই অসুস্থ সংস্কৃতিই তাদের ধর্ষণের কারণ। [১৩৭]

আর পশ্চিমে তো ধর্ষণ মহামারীর চেয়েও ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। আমেরিকাতে প্রতি ৯৮ সেকেন্ডে একজন যৌন-আগ্রাসনের শিকার হন; বাৎসরিক ধর্ষণের সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩,২১,৫০০! [১৩৮] প্রতি পাঁচ জনে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন এই আধুনিক সভ্য দেশে! হুক আপ সংস্কৃতি যে এই ধর্ষণের অন্যতম কারণ তার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন এই সংকৃতির ভেতরে থাকা মানুষেরাই।[১৩৯] তবে এই পরিসংখ্যান কিন্তু কেবল টিপ অব দ্য আইসবার্গ, কারণ ৬৮% ধর্ষণই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয় না। আর কলেজ ক্যাম্পাসে ঘটে চলা যৌন-আগ্রাসনের ৯০% রিপোর্ট করা হয় না। [১৪০] ধর্ষণের এই মহামারী এতটাই ব্যাপক যে, অন্য যে-কোনও অপরাধের চেয়ে আমেরিকাতে ধর্ষণের কারণে ঘটা ক্ষতির পিছে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস অনুযায়ী, এই ব্যায়ের পরিমাণ বাৎসরিক ১২৭ বিলিয়ন ডলার!

ইউরোপও পিছিয়ে নেই ধর্ষণে! *ইউরোস্ট্যাট* জানায়, ২০১৫ সালে প্রায় ২,১৫,০০০ সহিংস যৌন-অপরাধ সংঘটিত হয়; যার মাঝে ৮০% অধিক হলো ধর্ষণ। তালিকার প্রথমেই আছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস, দ্বিতীয় স্থানে ড. আজাদের সাধের জার্মানি, তারপর ফ্রান্স, সুইডেন। [১৪১] আরেক পরিসংখ্যানে সুইডেন ২য় স্থানে

---

১৩৬. Donna Freitas, Time to stop hooking up (You know you want to). The Washington Post, March 29, 2013

১৩৭. Alice Owens, My Rape Convinced Me That Campus Hookup Culture Is Really Messed Up. Verily Mag, 06 July, 2015

১৩৮. Victims of Sexual Violence: Statistics. RAINN, Available at: https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence

১৩৯. Madelyn Parsons, After Experiencing the Hookup Culture, I Can Believe the Stat that 1 in 5 Women are Raped. Verily Mag, 18 May 2017

১৪০. Sexual Assault Statistics. National Sexual Violence Resource Center, Available at: https://www.nsvrc.org/statistics

১৪১. Violent sexual crimes recorded in the EU. Eurostat, Avalilable at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-1?inheritRedirect=true

অবস্থান করছে। [১৪২] সুইডেন নাস্তিক-প্রধান দেশ হওয়াতে নাস্তিক-পাড়ায় এর খুব প্রশংসা শোনা যায়। নব্য-নাস্তিক অভিজিৎ রায় বলতে চেয়েছেন, নাস্তিক হওয়ার পরও সুইডেন নাকি স্বর্গসম দেশ, কোনও ক্রাইম নাই! কিন্তু গবেষণার পরিসংখ্যান কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে, পুরো ইউরোপের মাঝে সুইডেন ও ডেনমার্ক যৌন হয়রানির তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে। [১৪৩]

আর ফ্রান্সের কথা কি না বললে চলে? আইফেল টাওয়ারের দেশ, নামিদামি পারফিউমের দেশ, এমন এক দেশ যেখানে ১০০% নারী পাবলিক ট্রান্সপোর্টে অন্তত একবার হলেও যৌন হয়রানির শিকার হয়![১৪৪] সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান জানায়, প্রতি ৮ জনে ১ জন নারী ধর্ষিত হন ফরাসিদের দেশে। [১৪৫]

সাম্প্রতিক কালে আরেকটি আন্দোলন মুক্ত কামচিন্তার ক্ষতিকর দিক ফুটিয়ে তুলেছে, আর তা হলো *#MeToo* মুভমেন্ট। নানা রাঘব-বোয়ালদের দ্বারা আমেরিকার রূপালি পর্দার নারীদের যৌন হয়রানির ঘটনা ২০১৭ থেকে যে মুভমেন্টের দ্বারা ভাইরাল ইভেন্টে পরিণত হয়, তাই *#MeToo* নামে আলোচিত হয়। নামিদামি সেলিব্রেটি, অস্কার পুরস্কার পাওয়া পরিচালক, প্রযোজকদের নানা গোমর ফাঁস হতে শুরু করে। ২০১০ সাল থেকে *আমেরিকান এথিস্ট* সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে আসিন ডেভিড সিলভারম্যানকে পদচ্যুত করা হয় যৌন হয়রানির অভিযোগে।[১৪৬] বিখ্যাত নাস্তিক প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউসের বিরুদ্ধেও কয়েক জন নারী যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেন। শেষমেশ মুখ বাঁচাতে রিটায়ার করার সিদ্ধান্ত বেছে নেন তিনি।[১৪৭]

কালক্রমে *#MeToo* ছড়িয়ে পড়ে হলিউড থেকে বলিউডে। [১৪৮] ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন

---

১৪২. Emma Beswick, Which EU countries have the highest rate of sex crimes? Euronews, 24 November, 2017

১৪৩. Hardeep Matharu, Sweden and Denmark have highest rates of sexual harassment in Europe. The Independent, 7 January 2016

১৪৪. Henry Samuel, 100 per cent of Frenchwomen 'victims of sexual harassment on public transport'. The Telegraph, 17 April 2015

১৪৫. Lucy Pasha-Robinson, One in eight French women say they have been raped, finds study. The Independent, 23 February 2018

১৪৬. Michael Stone, American Atheists President David Silverman Fired For Sexual Assault. Patheos, 15 April 2018

১৪৭. Matthew Haag, Lawrence Krauss to Retire From Arizona State After Sexual Misconduct Accusations. The New York Times, 22 Oct. 2018

১৪৮. Shrishti Negi, 2018: The Year Women in Bollywood Finally Said #MeToo. News18, 24 December 2018

স্তরের নারীরা নিজেদের ঘটনা শেয়ার করতে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় অভিযোগ উঠে আসছে বঙ্গীয় সেক্যুলারদের নামেও। তালিকায় রয়েছেন বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন, *সিসিমপুর*-এর মিউজিক ডিরেক্টর এজাজ ফারাহ, আবৃত্তিকার মাহিদুল ইসলাম, পাঠক সমাবেশ-এর কর্ণধার শহিদুল ইসলাম বিজু, যাত্রী ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জামিল আহমেদ প্রমুখ। [১৪৯]

মুক্ত কাম-সংস্কৃতির ক্ষতিকর দিক নিয়ে লিখতে গেলে গোটা কয়েক বই হয়ে যাবে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হলো। কীভাবে মুক্ত কাম পশ্চিমা সমাজবৃক্ষকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আঁচ পেতে আগ্রহী পাঠকগণ *Porn Generation : How Social Liberalism Is Corrupting Our Future* বইটি নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। [১৫০]

তো এতক্ষণের পরিসংখ্যানমূলক আলোচনার পর সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে-কেউ মুক্ত-কাম, বিবাহ-বহির্ভূত কামের ক্ষতিকর দিক কিছুটা হলেও আঁচ পাবার কথা। ড. আজাদ দৈহিক সুখকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যৌন-নৈতিকতা বিষয়ে ধর্মের বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করেছেন, অবজ্ঞা করেছেন। উনার দৃষ্টিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ অত্যন্ত অনৈতিক কাজ, মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়াই নাকি নৈতিকতার ভিত্তি হওয়া উচিত। নৈতিক মানদণ্ড উনার দৃষ্টিতে খুবই নিকৃষ্ট মানদণ্ড। (পৃ. ১৪৩) উনি সুখের খোঁজে স্বাধীনতা চেয়েছেন।

কিন্তু এই নিঃসংকোচ যৌনতা বা যৌন-স্বাধীনতা কি সুখ এনে দিয়েছে উনার জীবনে? *সব কিছু ভেঙে পড়ে* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রকৌশলী মাহবুব সাহেবের ভেতর দিয়ে কি অতৃপ্ত অধ্যাপকের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে? [১৫১] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাহবুব সাহেবও তো ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি। ধর্মকে, ধর্মীয় নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলে শারীরিক সুখের পিছে, নিরাভরণ যৌনতার পিছে ছুটে বেড়িয়েছেন; কিন্তু সুখ কি পেয়েছেন? পাননি। তার সম্পর্কের সেতুগুলো করুণ আর্তনাদ করে একে একে ভেঙে পড়েছে!

মাহবুব সাহেব কি ড. আজাদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ঔপন্যাসিক রূপ? ড. আজাদ নিঃসংকোচ যৌনতার মাঝে যে সুখ খুঁজে বেড়িয়েছেন, তার রূপায়ণ তো

---

১৪৯. https://womenchapter.com/views/category/metoo/page/4

১৫০. Ben Shapiro, Porn Generation: How Social Liberalism Is Corrupting Our Future (Washington DC, Regency Publishing, Inc., 2005)

১৫১. হুমায়ুন আজাদ, সব কিছু ভেঙে পড়ে (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১)

উপন্যাসে নেই! কোথায় গেল সেই সুখপাখি? তিনি কী বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মকে আক্রমণ করে যৌনসুখের যে ভেলায় তিনি ভাসতে চেয়েছিলেন, তা ছিল মরীচিকা মাত্র? উনি দেখেছেন মানুষ ভালো নেই, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কারও মুখেই তিনি ভালো থাকার ছাপ দেখেননি। না এরিস্টটল, না রবীন্দ্রনাথ, না ফেরিওয়ালা; সবার চেহারাতেই নাকি দুঃখের দাগ দেখেছেন। আয়নাতে তাকিয়ে চমকে উঠেছেন, স্বীয় মুখেও দেখতে পেয়েছেন একই দাগ! (পৃ. ১৩০)

ড. আজাদ *আমার অবিশ্বাস* বইটি যাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন—সেই বার্ট্রান্ড রাসেলের কী অবস্থা? গোটা চারেক স্ত্রী আর অজস্র নারীর স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত বার্ট্রান্ড বলতেন, কোনও যৌনসঙ্গীকে তাঁর কয়েক বছরের বেশি আবেদনময়ী মনে হতো না, তারপর নতুন কাউকে বশ করার পাঁয়তারা চলত। বলা হতো—তিনি *Galloping Satyriasis* অর্থাৎ দ্রুতবর্ধমান কামুকতায় আক্রান্ত ছিলেন। তার যৌনসঙ্গীর লম্বা তালিকায় ছিল সেক্রেটারি তরুণী, মন্ত্রীর স্ত্রী, সার্জনকন্যা, নারী গবেষক, অভিনেত্রী, নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের কর্মী, বেশকিছু শিক্ষিকা, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষকের স্ত্রী, এমনকি তার সন্তানের গৃহশিক্ষিকা প্রমুখ![১৫২]

বার্ট্রান্ড পুরোটা জীবন স্রষ্টাকে ভুলে থেকে বস্তুসুখের স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুখ কি পেয়েছিলেন? তার কবিতা কী বলে?

> "বহুবর্ষ ধরে
> আমি শান্তি খুঁজেছি,
> পেয়েছি উচ্ছ্বাস, পেয়েছি মনোবেদনা,
> পেয়েছি পাগলামি,
> পেয়েছি নিঃসঙ্গতা,
> পেয়েছি একাকিত্বের বেদনা,
> যার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় হৃদয়,
> কিন্তু শান্তি আমি খুঁজে পাইনি।" [১৫৩]

সুখের জন্য ধর্ম ত্যাগ করে, নিজের প্রবৃত্তির উপাসনা করে শেষ পর্যন্ত তো সুখই মিলল না! হায় সুখ!

---

১৫২. Brilliant Men Always Betray Their Wives. The Telegraph, 13 July 2006

১৫৩. Ray Monk, Bertrand Russell : The Spirit of Solitude, 1872-1921; p. xix (Simon & Schuster, 1996)

বিবর্তনের ফ্যাশন

"আমরা, সব প্রাণী, উদ্ভূত হয়েছি বিবর্তনের ফলে। মানুষ কোনও স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত প্রাণী নয়, মানুষ বিকশিত প্রাণী; তবে মানুষেরই একদল রটিয়েছে যে মানুষ স্বর্গচ্যুত পাপী। বিবর্তন প্রমাণিত সত্য।" [পৃ. ৬৮]

যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, নব্য নাস্তিকতার মন্দিরের কেন্দ্রীয় খুঁটি কোনটি? তা হলে আমি বলব—বিবর্তন! সেলেব্রেটি নাস্তিক ড. রিচার্ড ডকিন্স-এর বেস্ট সেলার বই *দ্য গড ডিল্যুশন*-এর কেন্দ্রীয় আর্গুমেন্টও মূলত স্রষ্টা বনাম বিবর্তন নিয়ে। ড. আজাদও অন্যান্য নাস্তিকদের মতোই বিবর্তন নিয়ে অত্যুৎসাহী। তাই বিবর্তন নিয়ে আবেগী কথার ফুলঝুরি ফুটিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কাজ আবেগী হওয়া নয়, বরং চিন্তাশীল হওয়া।

বিবর্তন এমন এক ধারণা, যা নিয়ে শুধু আস্তিক নয়, বরং নাস্তিকদের মাঝেও অনেক ভুল ধারণা বিদ্যমান। শব্দ হিসেবে *ইভোলিউশন* (*Evolution*) বা বিবর্তন-এর অর্থ 'পরিবর্তন'। এই অর্থে ভূতত্ত্ববিদ্যায় ইভোলিউশন শব্দের দেখা মেলে। চার্লস ডারউইন যার বই পড়ে বিবর্তনের ধারণার প্রাথমিক খোরাক পান, সেটি ছিল চার্লস লায়েলের বই; সেখানে ভূভাগের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন বোঝাতে বিবর্তন শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কসমোলজি বা মহাবিশ্ববিজ্ঞানেও ইভোলিউশন শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তীত হয়ে, বিভিন্ন অবস্থা পেরিয়ে মহাবিশ্ব আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। নাস্তিক মতাদর্শ প্রচারকারী অভিজিৎ রায়-এর *অবিশ্বাসের দর্শন* গ্রন্থে বিবর্তন শব্দটির এই ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাণের ক্ষেত্রেও বিবর্তন শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। তবে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ যে ভুলে জড়িয়ে পড়ে তা হলো—শাব্দিক অর্থের সাথে বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক অর্থ গুলিয়ে ফেলা। প্রাণের মাঝেও নানা পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে তাদের অভিযোজিত হতে হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাডাপ্টেশন (*Adaptation*)। এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণযোগ্য, যেমন : ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি, পানি বাঁচানোর লক্ষ্যে মরু উদ্ভিদের পাতা গুটিয়ে কাঁটায় পরিণত হওয়া, সমুদ্রে অক্টোপাসের শরীরের রঙ বদলে আশেপাশের পরিবেশের রঙের সাথে মিশে যাওয়া ইত্যাদি। প্রাণের মাঝে নানা পরিবর্তন ঘটে—বিবর্তনের এই অর্থের সাথে কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না।

কিন্তু এসকল সীমিত পর্যবেক্ষণকে যখন বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের চশমা দিয়ে দেখা হয়, তখন এক তত্ত্বের জন্ম হয়, যাকে বিবর্তন তত্ত্ব বা সংক্ষেপে বিবর্তন বলা হয়। ডারউইনিয় বিবর্তন তত্ত্ব বলতে চায়—বসুধার বুকে মানুষ-সহ যত প্রাণের দেখা মেলে, এরা সকলেই মূলত বেঁচে থাকা আর বংশবৃদ্ধির নিয়ত সংগ্রামের পথে এলোপাথাড়ি পরিবর্তনের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে! কেন এমনটা বলার প্রচেষ্টা? ওই যে বললাম, বিজ্ঞানের অন্ধবিশ্বাস—পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্য! (অধ্যায় ০১ দ্রষ্টব্য) বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেছিলেন,

> "জীববিজ্ঞানীদের অবশ্যই সব সময় এটা মনে রাখতে হবে যে, তারা (জীবজগতে) যা দেখছে, তা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নয় বরং বিবর্তনের ফল। তাই এটা ভাবা যেতে পারে যে, বিবর্তনবাদী যুক্তি জীববিজ্ঞানের গবেষণায় একটি বড় ভূমিকা রাখবে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা থেকে এটা থেকে বহু দূরে। বর্তমানে কী ঘটছে, এর পর্যাপ্ত গবেষণা করা (যেমন) কঠিন। বিবর্তনে আসলে ঠিক কী ঘটেছিল, তার সমাধান পাওয়া আরও কঠিন।" [১৫৪]

অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আগে থেকেই স্রষ্টাকে সমীকরণের বাইরে রেখে যাত্রা শুরু করে। তা ছাড়া স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে, বিজ্ঞানের যে-কোনও তত্ত্বই মূলত অনুমান-নির্ভর হয়ে থাকে।

>> উপাত্তের সীমাবদ্ধতা (*Black Swan Problem*)

>> একই উপাত্ত থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ (*Underdetermination Problem*)

এই দুই কারণে বিজ্ঞানের যে-কোনও তত্ত্বই মূলত সম্ভাবনামূলক, নিশ্চিত সত্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কারবার নেই। [১৫৫] তাই 'বৈজ্ঞানিক সত্য' (*Scientific Fact*) মাত্রই পরিবর্তন ও সংশোধন যোগ্য।

বিবর্তনের প্রাণপন সমর্থক বহুল পরিচিত *National Center for Science Education*-এর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় :

> "... বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই চূড়ান্ত নয় এবং যা আজ সত্য হিসেবে বিবেচিত

১৫৪. Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery; Chapter 13: p. 138-139 (New York, Basic Books, Inc., 1988)

১৫৫. রাফান আহমেদ, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা; পৃ. ৬৩

হয়তো-বা কাল তা পরিবর্তিত এমনকি বাতিল ঘোষিত হতে পারে।" [১৫৬]

বিখ্যাত *Nature* জার্নালের বায়োলজির সিনিয়র এডিটর ড. হেনরি গী বলেন :

> "... সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাদের প্রকৃতি অনুসারেই প্রোভিশনাল (অর্থাৎ যে-কোনও মুহূর্তেই বদলাতে পারে)—এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।... বিজ্ঞানের গণ্ডিতে জ্ঞানের চেয়ে সন্দেহের পরিমাণ বেশি... (আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) প্রাপ্ত ফল সর্বদাই সম্ভাবনামূলক... পরিসংখ্যান আর (এর ওপর নির্ভরশীল) বিজ্ঞান তাই কেবল সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলে, সত্য নির্ধারণ করতে পারে না।... " [১৫৭]

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির ফিলোসফি অব সাইন্সের প্রফেসর সামির ওকাশা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *'ফিলোসফি অব সাইন্স : এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন'* গ্রন্থে বলেন :

> "ইতিহাস ঘাঁটলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মাঝে অনেক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলো তৎকালীন সময়ে প্রায়োগিক দিক দিয়ে সফল ছিল, কিন্তু পরে ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৮০-র দশকে প্রকাশিত এক সুপরিচিত আর্টিকেলে আমেরিকার বিজ্ঞান-দার্শনিক লেরি লোডেন এমন তিরিশেরও বেশি তত্ত্বের তালিকা পেশ করেন... যেখানে বৈজ্ঞানিক মত দ্রুত বদলায়। আপনার পছন্দমতো বিজ্ঞানের যে-কোনও শাখাই বিবেচনা করুন না কেন, এবং আপনি নিশ্চিত হবেন যে (বর্তমানে) ওই শাখার প্রভাবশালী তত্ত্বগুলো (*Theory*) ৫০ বছর আগের তত্ত্বগুলোর চেয়ে অনেক ভিন্ন হবে আর ১০০ বছরের আগের তত্ত্বগুলোর চেয়ে ব্যাপক ভিন্ন হবে।" [১৫৮]

অর্থাৎ, ড. আজাদ বিবর্তন তত্ত্বকে একেবারে আপেল পড়ার মতো সত্য ভেবে যে বয়ান দিয়েছেন, তা মূলত বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। তিনি-সহ অধিকাংশ নাস্তিক বিবর্তনের শাব্দিক অর্থের সাথে পারিভাষিক অর্থ গুলিয়ে ফেলে। প্রাণীর

---

১৫৬. "Truth in science, however, is never final and what is accepted as a fact today may be modified or even discarded tomorrow." - Available at: https://ncse.com/node/16774

১৫৭. Henry Gee,.Science: The Religion That Must Not Be Questioned. The Gurdian, 19 Sep 2013

১৫৮. Samir Okasha, Philosophy of Science, A Very Short Introduction; p. 60, 71 (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition 2016)

মাঝে ঘটে চলা দৃশ্যমান পরিবর্তনের সাথে সম্ভাবনামূলক প্রকৃতিবাদী-তত্ত্বকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়। তিনি যে বিবর্তন তত্ত্বকে প্রমাণিত সত্য ভেবে বসেছেন, সেই বিবর্তন সম্পর্কে ডকিন্স কী বলেন : শুনুন :

> "ডারউইন হয়তো বিংশ শতকের শেষে সফল হয়েছিলেন। তবে আমাদের অবশ্যই এই সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে যে, (ভবিষ্যতে) নতুন কোনও তথ্য প্রকাশিত হতে পারে, যা একবিংশ শতকে আমাদের উত্তরসূরিদের বাধ্য করবে ডারউইনীয় তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে অথবা এমনভাবে বদলে দিতে যা আর (ডারউইনের মতবাদ বলে) চেনাই যাবে না।"[১৫৯]

এই যাহ, সেরেছে! এ কেমন সত্য যা বদলে যাবে? এ কেমন সত্য যা ভুল প্রমাণিত হবে? বর্তমানে সেক্যুলার অ্যাকাডেমিয়াতে ডারউইনের বিখ্যাত *Tree of Life*-এর ধারণা বাতিল হওয়ার দিকে অগ্রসরমান।[১৬০] সাম্প্রতিক সময়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিবর্তনবাদী নাস্তিক বিজ্ঞানী প্রফেসর ডেনিস নোবেল স্বীয় গবেষণার আলোকে দেখেছেন—বর্তমানে প্রচলিত বিবর্তন তত্ত্ব তথা মডার্ন সিন্থেসিস (আধুনিক সংশ্লেষ তত্ত্ব) ভুল প্রতীয়মান হচ্ছে! পিয়ার রিভিউড পেপারে আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন :

> "বিবর্তন তত্ত্ব নিজেই ইতোমধ্যে অনিশ্চয়তার দোলাচলে আছে। আমি এই গবেষণাপত্রে দেখাব যে, আধুনিক সংশ্লেষ তত্ত্ব (যাকে অনেক সময় নব্য-ডারউইনবাদও বলা হয়)—এর কেন্দ্রীয় অনুমানগুলোর সব কটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"[১৬১]

এই তথ্য হাতে গোনা কজন ছাড়া কেউই জানে না। বঙ্গীয় নাস্তিকরাও এত সৎ নয় যে, নিজেদের পরম বিশ্বাসের জায়গাকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ হতে দিবে। তাই তাদের মুক্তচিন্তার দৌড় এই পর্যন্ত আসে না।

তা ছাড়া ড. আজাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে

১৫৯. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love; p. 81 (Houghton Mifflin Harcourt, 2004); যদিও জনসম্মুখে তিনি ঠিক উলটো কথাই বলেন! ডাবল স্ট্যান্ডার্ড!

১৬০. Graham Lawton, Why Darwin was wrong about the tree of life? The NewScientists, 21 January 2009

১৬১. Denis Nobel, Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology; Journal of Experimental Physiology, Vol. 98, Issue 8, p. 1235 (2013)

মাত্র একটিই ঠিক হতে পারে বা ভুল হতে পারে সব কটিই; কোনও সত্যের থাকতে পারে না একাধিক ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব; কোনও প্রপঞ্চের একাধিক তত্ত্ব পেলে বুঝতে হবে এগুলোর একটি ঠিক হতে পারে বা সবগুলোই ভুল। (পৃ. ৭৯) বর্তমানে বিবর্তন ব্যাখায় প্রায় ৫ টি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, সবগুলোই পিয়ার রিভিউড, তত্ত্বদাতারা সকলেই নাস্তিক![১৬২] তা হলে ড. আজাদের মানদণ্ডে তো বিবর্তনকেও উনার বিশ্বাস করার কথা না! তা তো তিনি করেননি, বরং *প্রবচনগুচ্ছ*-তে বুক ফুলিয়ে বলেছেন,

> "মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে : অবৈজ্ঞানিক অধঃপতনতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ত্ব। অধঃপতনতত্ত্বের সারকথা মানুষ স্বর্গ থেকে অধঃপতিত। বিবর্তন তত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতত্ত্বে বিশ্বাস করে; আমি যেহেতু মানুষের উৎকর্ষে বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাস করি বিবর্তন তত্ত্বে। অধঃপতনের থেকে উৎকর্ষ সব সময়েই উৎকৃষ্ট।"[১৬৩]

এখানেও অনুধাবনে গলদ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি উৎকর্ষে বিশ্বাস করেন বলে বিবর্তনকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। উনার মতে, বিবর্তন তত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। উৎকর্ষ অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি (*Progress*); কিন্তু বিবর্তন মানবের উৎকর্ষে বিশ্বাস করে না।

নাস্তিক বিজ্ঞানী ড. হেনরী গী-র পর্যবেক্ষণ জানায়, প্রোগ্রেসের ধারণা খুবই প্রচলিত। পশ্চিমা পলিটিক্স, ইকোনওমিকস, বিজ্ঞান, বিবর্তন সবকিছুই যেন এতে নিমজ্জিত। কিন্তু বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এটি বিকৃত ধারণা, যার সাথে ডারউইনের কোনও সম্পর্ক নেই; এর জন্য দায়ী আর্নেস্ট হেকেল, যিনি জার্মানিতে বিবর্তন প্রচারক ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতকের জার্মান চিন্তাবিদদের মাঝে প্রচলিত উৎকর্ষের ধারণার সাথে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি বানান।[১৬৪] আর সেই খিচুড়ি খেয়েই ড. আজাদ মানব উৎকর্ষের গল্প ফেঁদেছেন।

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কেবল টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য যোগ্যতর প্রাণের সৃষ্টিকে বিবেচনা করা হয়; টিকে থাকার জন্য উন্নত-বিকশিত হওয়া শর্ত নয়। তেলাপোকাও

---

১৬২. 1. Evolution by Natural Genetic Engineering (James Shapiro, Carl Woese), 2. Neo Lamarckian Evolution (Eva Jablonka), 3. Mutation Driven Evolution (Masatoshi Nei), 4. Symbiotic Evolution (Lynn Margulis), 5. Evolution by Self Organisation (Stuart Kauffman)

১৬৩. হুমায়ুন আজাদ, প্রবচনগুচ্ছ; পৃ. ৫৭ (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, জুলাই ২০০৭)

১৬৪. Henry Gee, The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution; chapter 1: An Unexpected Party (Epub Edition, University of Chicago Press, 2013)

তো টিকে আছে তাই না? তাই বিবর্তন তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সাথে অন্য পশুর কোনও পার্থক্য নেই। উভয়েই এলোপাথাড়ি পরিবর্তনের ফল; পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষ নিছক এক দুর্ঘটনার নাম। [১৬৫]

তাই বিবর্তন তত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল—এমন ধারণার সাথে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। ডারউইন নিজেও মানুষকে উৎকর্ষের ফল মনে করতেন না।[১৬৬] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আজাদ সাহেব নিজেও যে বিবর্তন নিয়ে বড়বড় কথা সাজিয়েছেন, সেই তত্ত্বকে তিনি ভালোমতো বুঝতেনই না। অধিকাংশ নাস্তিকই বোঝেন না।

বাস্তবতা হলো, বিবর্তনের সাথে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ানো অধিকাংশ মানুষই বিবর্তন, বিজ্ঞান ও এদের দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ। বেশিরভাগ মানুষ বিবর্তনে বিশ্বাস করে সামাজিক চাপে। বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চধারণা তাদের ভুল পথে পা বাড়ানোর পিছে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞান/বিজ্ঞানীরা কি ভুল বলবে—এমন অপধারণার প্যাঁচে পড়ে ছবির পুরোটা না জেনেই চোখ বুজে প্রচলিত ন্যারেটিভ মেনে নেয়। তাই বিবর্তন আসলে ফ্যাশন, আরও সঠিকভাবে বললে—ধর্ম! কি আঁতকে উঠলেন? এই দাবি আমার না, বিবর্তনবাদী নাস্তিক গবেষকদেরই। [১৬৭] মাইকেল রুজ কী বলেন শুনে দেখুন :

> "বিবর্তনবাদকে এর চর্চাকারীরা শুধু বিজ্ঞান (নয় বরং) এর চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে প্রচার করেছে। বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে একটি ভাবাদর্শ, একটি সেক্যুলার ধর্ম হিসেবে ... আমি একজন অত্যন্ত গোঁড়া বিবর্তনবাদী ... কিন্তু (তা সত্ত্বেও) আমাকে স্বীকার করতেই হবে ... বিবর্তনবাদ একটি ধর্ম। এ কথা যেমন বিবর্তনবাদের সূচনাতে প্রযোজ্য ছিল, তেমনি এখনও প্রযোজ্য..."[১৬৮]

---

১৬৫. Jonathan Howard, Darwin: A Very Short Introduction; p. 100-101 (Oxford: Oxford University Press, 2001)

১৬৬. 'There is no clear cut answer to the question about the relationship between Darwinian evolutionary theory and hopes of progress, especially progress up to human beings.' - Michael Ruse, The Philosophy of Human Evolution; p. 126 (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)

১৬৭. Michael Ruse, Is Evolution a Secular Religion? Science, Vol. 299, Issue 5612, p. 1523-1524 (Mar 2003)

১৬৮. Michael Ruse, Is Darwinism a Religion? Huffpost, Sep 20, 2011

বিবিধ

ড. আজাদ ধর্মের খারাপ দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"ধর্মের প্রধান ক্ষতিকর দিক হচ্ছে ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে; মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ ক'রে দেয়, সৃষ্টি করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা। কোনও সুষম ধর্মও নেই, প্রতিটি ধর্ম বিভক্ত নানা শাখা ও উপশাখায়; ওই শাখা-উপশাখাগুলো ঘৃণা করে পরস্পরকে।"

অর্থাৎ, উনার মতে ধর্মই হলো দলাদলি ও বিভেদের অন্যতম কারণ। এই দাবি বেশ দুর্বল ও একপেশে। ড. আজাদ ধর্মের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রকেও সমালোচনা করেছেন, যেহেতু উনি ধর্মমুক্ত তথা সেক্যুলার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন; তাই এক্ষেত্রে বিকল্প রাজনৈতিকব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু গণতন্ত্র তো শুরুই হয় দলাদলি দিয়ে, ভোটাভুটির জন্য অন্তত দুইটি দল তো লাগবেই। বাংলাদেশের সংবিধান-অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সংগঠন বা সমিতি করার অধিকার রয়েছে (ধারা ৩৮-৩৯)। যার কারণে বাংলাদেশে বহুদলীয়ব্যবস্থা বিদ্যমান; নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪০টি।[১৬৯] যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমনসে দলের সংখ্যা ১২, আমেরিকাতে ব্যালট কোয়ালিফাইড রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩২। এরপরও দলাদলির দোষ চাপানো হয় ধর্মের ঘাড়ে।

যারা এদেশের রাজনীতি দেখে বড় হয়েছেন, তারা অন্তত জানেন আমাদের রাজনীতি কতটা স্বার্থপ্রবণ ও বিদ্বেষের। বিরোধীদলের কথা না হয় বাদই দিলাম, যারা নিজেদের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবি করে—তাদের মাঝে নানা কোন্দল, হানাহানি মেডিকেলে পড়ার সময় খুব ভালোভাবেই দেখেছি! প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কারও মাথা ফাটিয়েছে, ফলে মেডিকেল কলেজ সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে![১৭০]

এই সংকীর্ণতা থেকে সেক্যুলার পশ্চিমও তা থেকে মুক্ত নয়। নানাদেশের পার্লামেন্টে মারামারি-হাতাহাতি, ডিম ছুড়ে মারা কমন ব্যাপার। এ নিয়ে বিখ্যাত *টাইম*

---

১৬৯. বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪০টি - আইনমন্ত্রী। দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ জুন ২০১৭

১৭০. যেমন: ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর পাবনা মেডিকেল বন্ধ, বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর, ১২ জানুয়ারি ২০১৮। অন্তর্জাল ঘাটলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজসহ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস প্রভৃতি অনুসঙ্গে এমন মারামারির ঘটনা অহরহ পাওয়া যায়।

ম্যাগাজিন, *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*—এ মজার ভিডিও দেখতে পাওয়া যায়।[১৭১] অর্থাৎ আমার বক্তব্য হলো, বিভেদ ও বিদ্বেষের জন্য ধর্মই মূল নিয়ামক নয়। এটি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যার মধ্যে স্বার্থ অন্যতম প্রধান নিয়ামক বলা যেতে পারে। তাই গণহারে দোষ ধর্মের ওপর চাপিয়ে চিন্তাশীল সমাজের চোখ ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

আন্তঃধর্ম বিদ্বেষ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, ধার্মিক হিন্দু মুসলমানের পবিত্র গৃহ পোড়াতে দ্বিধা করে না, ধার্মিক মুসলমান অবলীলায় পদদলিত করে হিন্দুর পবিত্র দেব-দেবীমূর্তি; খ্রিষ্টান-ইয়াহূদিও একই আচরণ করে। (পৃ. ২৪) কিন্তু তিনি তালিকা থেকে নাস্তিকদের বাদ দিলেন কেন বুঝলাম না! ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করা, ধর্মসাধকদের নির্মমভাবে হত্যা, নারী সাধকদের ধর্ষণ, বিশ্বাসীদের ওপর মানসিক অত্যাচার—এমন অনেক অন্যায়ে নাস্তিকদের হাত রক্তিম হয়ে আছে; যার নমুনা আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই দেখেছি। অথচ ড. আজাদের চোখ শুধু ধার্মিকদের ওপরই পড়েছে! আর মূর্তি ভাঙার-প্রসঙ্গ গবেষণা করলে পাওয়া যায় আমাদের দেশে মূর্তি ভাঙার পিছে মূলত স্বার্থ ও রাজনীতি দায়ী, ধর্ম নয়। সংবাদপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, অনেক ঘটনায় হিন্দুরা গিয়ে মূর্তি ভেঙে এসেছেন, কিন্তু দোষ পড়েছে অপর হিন্দু/মুসলমানের ঘাড়ে![১৭২]

আন্তঃধর্ম বিদ্বেষের ব্যাপারে ড. আজাদ আরও বলেছেন,

> "ধার্মিকেরা খুবই অমানবিক, তারা নিজেদের ধর্ম ও ধর্মের বই ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম ও ধর্মের বইকে মর্যাদা দেয় না। এক ধর্মের ধার্মিক অন্য ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ ও গৃহকে অবলীলায় অপমানিত করতে পারে, যা নাস্তিকেরা কখনো করে না।" [পৃ. ৭৮]

এই অংশটুকু পড়ে আমি বেশ বিরক্ত বোধ করেছি। ড. আজাদ নিজেই উনার পুরো বই জুড়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বদনাম গেয়েছেন, ধার্মিকদের বিকলনগ্রস্ত বলেছেন, ধর্মপ্রচারকারী মহাপুরুষদের মনোবিকলনগ্রস্ত বলেছেন! উনি নিজেই তো মর্যাদা

---

১৭১. Politician Brawls Caught On Tape Around The World. TIME, 03 November 2016. Available at: https://m.youtube.com/watch?v=F2b-2YnfZso; The World's Biggest Political Brawls, Wall Street Journal. Youtube, available at: https://youtu.be/1NlqhEeK1iw

১৭২. প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মূর্তি ভাঙচুর, দৈনিক প্রথম আলো, ০৭ আগস্ট ২০১৩; বিস্তারিত দেখুন : আনোয়ার মোহাম্মদ, মন্দির ও মূর্তি ভাংচুর : প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান। মূলধারা বাংলাদেশ, ০৮ ডিসেম্বর ২০১৬

দিলেন না, আবার ধার্মিকদের নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন! উনার দৃঢ়বিশ্বাস নাস্তিক নাকি অন্য ধর্মের পবিত্র-গ্রন্থকে কখনও অবমাননা করে না! এই দাবিও শতভাগ ভুল।

ব্রিসবেন ইউনিভার্সিটির আইনবিদ নাস্তিক এলেক্স স্টুয়ার্ট কুরআন ও বাইবেলের পাতায় মারিজুয়ানা পুরে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া টেনেছেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কোন পাতা ভালো পুড়ে! এই দুই গ্রন্থকে তিনি অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালমন্দ করেছেন![১৭৩] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে *#Burn_Quran_Challenge* হ্যাশটাগ দিয়ে বেশ কিছু নাস্তিক কুরআন অবমাননার বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করেছে। কেউ কুরআন পোড়াচ্ছে, কেউ দুমড়ে-মুচড়ে ছিড়ে ফেলছে! নাস্তিক আরমিন নবাবিকে দেখা গেছে এমনই এক ভিডিও শেয়ার করে সমর্থন দিতে। এই পোস্টের কমেন্ট অংশে দেখা যায় আরও অনেক নাস্তিক সোৎসাহে এই কর্মের পক্ষে সাফাই গাইছে![১৭৪] সুতরাং ড. আজাদের মানদণ্ডে নাস্তিকেরাও যে খুবই অমানবিক, তাতে সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে একজন প্রকৃত মুসলিম উঁচুতে অবস্থান করেন। তিনি কখনও অন্য ধর্মের গ্রন্থকে অবমাননা করেন না। কারণ, হতে পারে এই গ্রন্থটি এককালে স্রষ্টার প্রেরিত বাণী ছিল, যা কালক্রমে বিকৃত হয়ে গেছে। তাই এতে আল্লাহর বাণীর কিছু অংশ থাকার সম্ভাবনা আছে। তিনি সত্যের অনুসরণ করেন, ও অন্যের কাছে আন্তরিকভাবে সত্যের প্রচার ও প্রসার করতে সচেষ্ট থাকেন। অন্য ধর্মের পবিত্রগৃহ অর্থাৎ উপাসনালয়কেও তিনি অবমাননা করেন না। তিনি অন্য ধর্মের উপাস্যদের কোন গালি দেন না, কারণ আল-কুরআনে তা নিষেধ করা হয়েছে।[১৭৫] তাই বোঝা যাচ্ছে—এক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক আচরণ প্রশংসার দাবি রাখে।

ইসলাম সম্পর্কে ড. আজাদের আরও কিছু অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। ঘাঁটাঘাঁটি করলে জানা যায়, এসকল অভিযোগের পিছে রয়েছে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা বা বিকৃত উপস্থাপন। যেমন তিনি বলতে চেয়েছেন, ইসলামপূর্ব আরব নাকি মাতৃপ্রধান ছিল। পিতৃপরিচয় নাকি গৌণ ছিল সে সমাজে, সন্তানেরা মায়ের পরিচয়েই পরিচিত হতো। (পৃ. ৯৭, ১৪০) *নারী* গ্রন্থে তিনি দাবি করেছেন, ইসলামের আগে আরবে নারীদের অবস্থা যতটা খারাপ ছিল বলে প্রচার করা হয়, ততটা খারাপ নাকি ছিল

---

১৭৩. Courtney Trenwith, Brisbane atheist burns Koran and Bible. Brisbane Times, 13 September 2010

১৭৪. https://twitter.com/ArminNavabi/status/997337006819627008

১৭৫. সূরা আন'আম ৬ : ১০৮

না। ঐতিহাসিকদের মতে নারী অনেক বেশি স্বাধীন ছিল অন্ধকার যুগের আরবে।[১৭৬]

ড. আজাদ কোন ঐতিহাসিক থেকে এই তথ্য পেয়েছেন, তা জানাননি। উনার এই দাবি আমাকে বেশ অবাক করেছে, কারণ ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমি যে দলিল পেয়েছি তার সাথে এই দাবি বেমানান। ইসলামপূর্ব আরব নাকি মাতৃপ্রধান ছিল এর পক্ষে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি, বরং উল্টোটাই পেয়েছি। তা ছাড়া নারীদের অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায়, মক্কার উচ্চ শ্রেণীর নারীরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধিকার ভোগ করলেও, সামগ্রিক বিবেচনায় জাহিলি যুগে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।[১৭৭]

এমনকি ইসলামের ঘোর শত্রুরাও স্বীকার করেছেন—ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। প্রবল ইসলাম-বিরোধী লেখক রবার্ট স্পেনসার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, ইসলামপূর্ব সমাজে নারীরা মূলত অস্থাবর সম্পদের মতো বিবেচিত হতো, সমাজের বোঝা হিসেবে গণ্য হতো। ফুলের মতো ফুটফুটে কন্যাশিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া ছিল যে সমাজের রীতি, সে সমাজে নারীদের স্বাধীন মনে করা কতটা বাতুল প্রস্তাবনা, তা বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠক সমাজের হাতেই ছেড়ে দিলাম।[১৭৮]

ড. আজাদের ইসলাম সংক্রান্ত আরেকটি অভিযোগ শুনে আমার বেমক্কা হাসি পেয়েছিল। তিনি বলেছেন,

> "মুসলমানরা নামের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর, তারা নামের ডানে বাঁয়ে নানা বস্তু লাগিয়ে থাকে, যা মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন আরবের একটি বিশ্বাস যে নামের সাথে রয়েছে যাদুর সম্পর্ক। আরবরা আসল নাম গোপন ক'রে রাখতো, ব্যবহার করতো আবু লাহাব বা আবু হুরায়রার মতো অভিধা, যাতে কেউ যাদু করতে না পারে:— যাদু করার জন্যে দরকার আসল নাম!" [পৃ. ১৩১]

আবূ (أبو) শব্দটির অর্থ হলো পিতা, জনক ইত্যাদি। তা ছাড়া আরবি ভাষায় কোনও কিছুর সাথে সম্পর্কিত অর্থেও আবূ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। মূলত ছোট বিড়ালের প্রতি স্নেহাধিক্যের কারণে তাকে আবূ হুরায়রা বলা হতো, এর সাথে জাদুর কোনও সম্পর্ক নেই। [১৭৯] আসলে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে ড. আজাদ আবেগের

---

১৭৬. হুমায়ুন আজাদ, নারী; পৃ. ৩৬৯

১৭৭. Niaz A. Shah, Women, The Koran & International Human Rights Law; p. 27-42 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006)

১৭৮. বিস্তারিত দেখুন : জাকারিয়া মাসুদ, ভ্রান্তিবিলাস; (ঢাকা : সমর্পণ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯)

১৭৯. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ; খণ্ড ০১, পৃ. ৫৭

আতিশয্যে হিন্দু ধর্মের প্রথার সাথে ইসলামকেও গুলিয়ে ফেলেছেন। নামের শুভাশুভ নির্ণয়ের আদিখ্যেতা পৌত্তলিক ধর্মে পাওয়া যায়, ইসলামে এর কোনও স্থান নেই।

ড. আজাদ হাজরে আসওয়াদ বা কালোপাথর নিয়েও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতার অন্যতম অনুসঙ্গ হলো নবি (ﷺ)-এর অনুকরণে কালোপাথর চুম্বন/স্পর্শ বা ইশারায় স্পর্শ করে তাওয়াফ শুরু করা। মুসলিমরা এই কাজ করেন শুধু তাদের ভালোবাসার মানুষ, মানবতার আদর্শপুরুষ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণের জন্য। তা ছাড়া পাথর চুম্বনের আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে—একই পাথরে অগণিত হজযাত্রীর চুম্বনে ভেঙে যায় রাজা-প্রজার, মালিক-শ্রমিকের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, আরব-অনারবের, কালো-সাদার, ধনী-গরিবের, ছুত-অছুতের বিভেদের জঘন্য প্রাচীর। এটি স্রেফ একটি পাথর, কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা এ নেই। উমার (رضي الله عنه)-এর স্বীকারোক্তিতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮০]

মক্কার পবিত্র কা'বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদ বা কালোপাথর সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "মুসলমানরা তীর্থে গিয়ে চুমো খায় একটি কালোপাথরকে। এটি এক সময় নির্দেশ করতো উর্বরতা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে এটি পড়েছে স্বর্গ থেকে।... ওই কালোপাথরটি একটি উল্কাপিণ্ড; তবে এখন যেটিকে চুমো খাওয়া হয়, সেটি হয়তো আসল পাথরটি নয়। চতুর্থ হিজরি শতকে কারম্যাশিয়ানরা (*Qarmatian*) আসলটা নিয়ে গিয়েছিল, ফেরত দিয়েছিল অনেক বছর পরে অনেকের ধারণা তারা আসলটি ফেরত দেয় নি। কালোপাথরটির পাশেই আছে আরেকটি লালবর্ণের পাথর, যার নাম হুবাল।" [পৃ. ৯৮-৯৯]

বলাই বাহুল্য, উনার এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ তিনি দেননি, স্রেফ অনেকের ধারণা উল্লেখ করেছেন। যুক্তি-প্রমাণ বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলা নাস্তিকেরা নিজ প্রোপাগান্ডা ছড়াতে প্রমাণ ছাড়া স্রেফ ধারণাকেও মেনে নিতে দ্বিধা করেন না দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই পবিত্র পাথর জান্নাত থেকে প্রেরণকৃত; শুরুতে এটি ছিল ধবধবে সাদা, কিন্তু বানী-আদমের পাপের কারণে এটি শুভ্রতা হারিয়ে কালোপাথরে পরিণত হয়।[১৮১] এটি উর্বরতা নির্দেশ করত

---

১৮০. ড. আজাদও স্বীয় গ্রন্থে উমার রা.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন : "খলিফা উমর কাবার কালোপাথরকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন, 'যদি না আমি দেখতাম মহানবি তোমাকে চুমো খাচ্ছেন, আমি নিজে তোমাকে চুমো খেতাম না।' " [পৃ. ৯৭]

১৮১. Britannica Encyclopedia of World Religion, p. 626

এমন কোনও প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি। ড. আজাদ কোথায় থেকে পেলেন, আল্লাহ্ই জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের-এর শাসনামলে মক্কায় ৬৯২ সালে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এটা কয়েক টুকরা হয়ে যায়। যার কারণে রূপার আধারে সাজিয়ে টুকরোগুলোকে সংযুক্ত করা হয়। ৯৩০ সালের প্রথমদিকে শিয়াদের একটি গ্রুপ কারমাতিরা এই পাথর চুরি করে বাহরাইনে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের নেতা আবূ তাহের আল কারমাতি তার গড়া মাসজিদ আল দিরার-এ স্থাপন করে হাজ্জের স্থান পরিবর্তন করার দুরাশায়। তিনি ভেবেছিলেন পাথর সরিয়ে আনলে হজযাত্রীদের হয়তো কা'বা থেকে বিমুখ করা যাবে। সেই আশায় পাথরটিকে প্রায় ২০ বছর ধরে কুক্ষিগত করে রাখা হয়। পরবর্তী কালে আব্বাসীয় নেতারা বিপুল টাকার বিনিময়ে পাথরটি ৯৫২ সালে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন।[১৮২]

সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত যে, কারামাতি গোষ্ঠী পাথরটি ফেরত দিয়েছিল। এখানে অমূলক সন্দেহ তৈরি করা কোনও চিন্তানিষ্ঠ মানুষের কাজ হতে পারে না।

১৮২. The Institute of Islamic Studies, Article 'Carmatians'. Available at: https://iis.ac.uk/encyclopaedia-articles/carmatians

সারমর্ম

এ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি অবিশ্বাস যখন মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনকে দূষিত করে তুলে—তার ফল কতটা ভয়ংকর হতে পারে! জানা গেল মানব ইতিহাসের পাতাকে বারবার রক্তে রঞ্জিত করেছে এই অবিশ্বাসের ভাইরাস! নাস্তিকেরা ধর্মের ওপর যে যুদ্ধ-সংঘাতের তকমা লাগাতে চায়, সেই দোষে যে নিজেরাই মহাদোষী, তা তাদের চোখেই পড়ে না। নাস্তিক্যবাদ প্রচারকারী তথাকথিত মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারীরা সুকৌশলে এই বাস্তবতা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করে। কিন্তু সত্য কখনও দমিয়ে রাখা যায় না।

নাস্তিপাড়ার প্রচারকবৃন্দ মানুষের কাছে যে আদর্শ ফেরি করে চলেন, তা আপাত দৃষ্টিতে চকমকে মনে হলেও এর ভেতরটা বড্ড ধূসর, বড্ড নিঃসঙ্গ! নাস্তিকতাকে ফ্যাশন হিসেবে না নিয়ে এর লজিক্যাল কনসিকোয়েন্সগুলো যদি খতিয়ে দেখা হয়, তা হলে যে নৈরাজ্যের চিত্র ফুটে ওঠে, তা প্রবল হতাশাব্যঞ্জক। নিহিলিজমের কীট মানব আশা-স্বপন-ভালোবাসাকে তীব্র কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে কেবল রেখে যায় মৃত্যু। তাই নাস্তিকদের জন্য আত্মহননই হয়ে দাঁড়ায় এই তীব্র হতাশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়। কেউ *ছাদ আরোহীর কাসিদা* রচনা করে পার পেয়ে যায়, কেউ পায় না। অচেনা আঁধারে সঙ্গিহীন পাড়ি জমায়।

আলোচনায় আমরা আরও দেখেছি নাস্তিকদের নৈতিকতা প্রসঙ্গে বৃথা আস্ফালনের স্বরূপ। মূলত নিজের প্রবৃত্তিপূজা করার জন্য তারা সবই অনুমোদিত করতে চায়; আর ধর্ম তাতে বাধা দেয় বলেই তাদের এত রাগ! এরই ধারাবাহিকতায় মদ ও যৌনতা প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা করে ইসলামের এ সংক্রান্ত বিধানের উপকারিতা বুঝতে পেরেছি। পাশাপাশি শরীরসুখের ভেলায়

চড়ার জন্য যারা উদ্দাম ও উন্মুক্ত যৌনতার প্রচার করেছেন, নিজের জীবনে যৌনসুখের লিপ্সায় কাতর হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন, তাদের জীবন ঘেঁটে জানতে পেরেছি তারা সেই কাঙ্খিত সুখ পাননি ! বস্তুসুখের সাগরে নৌকা ভাসিয়ে সাগরমাঝে এসে হাল ছেড়ে দিয়ে আফসোস করেছেন, ডুকরে কেঁদেছেন। বার্ট্রান্ডের নিঃসঙ্গ কবিতা, আর আজাদের মুখের দাগ—এই দুঃখের কথাই জানান দিতে চায়; অন্তরে জমে থাকা ব্যর্থতার কালো মেঘে ঘটে চলা নিরন্তর গর্জন তীব্র আর্তনাদ হয়ে নশ্বর কালিতে মুর্ত হয় কবিতা বা গল্পের আকারে।

এরপর আলোচনায় এসেছে নাস্তিকদের খুব কমন একটা রেটেরিক—ধর্ম বনাম বিজ্ঞান সংঘাত; অ্যাকাডেমিক ভাষায় বললে ওয়ারফেয়ার থিসিস। আগ্রহোদ্দীপক আলোচনায় আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এই ওয়ারফেয়ার থিসিস আসলে ইতিহাসের প্রপঞ্চময় উপস্থাপন । প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে পৃথিবীর প্রথম সার্থক বিজ্ঞানীর নাম—তিনি আর কেউ নন, হাসান ইবন আল হাইসাম, একজন মুসলিম। যিনি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের নেশায় ছক এঁকেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের । আজ সেই বিজ্ঞানের গাড়ি চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে স্রষ্টা পাওয়ার রাস্তার বিপরীতে । ওয়ারফেয়ার থিসিসের নমুনাস্বরূপ মুসলিমদের নামে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পোড়ানোর যে অভিযোগ করা হয়, তার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। জানা গেছে ড. আজাদ যার মহাভক্ত, সেই বার্ট্রান্ড রাসেলই এই ঘটনাকে ভুয়া বলে জানিয়েছেন।

শেষদিকে এসে আলোচিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু অভিযোগ। তার পূর্বে বিবর্তন নিয়েও অল্পকিছু আলোচনা এসেছে। প্রাণে ঘটে চলা পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তন (বিবর্তন) এর সাথে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুমান নির্ভর ও সম্ভাবনামূলক বিবর্তন তত্ত্বকে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ে ড. আজাদ দৃঢ় বিশ্বাসে দাবি করেছেন বিবর্তন প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আরেকটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই জানা গেল বিবর্তন তত্ত্বের বিভিন্ন প্রতিযোগী রূপ মূলত এর সম্ভাবনামূলক প্রকৃতির বাস্তবতাকে উচ্চকণ্ঠে জানান দিচ্ছে । একই সাথে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা ফ্যাক্ট যে মূলত পরিবর্তনশীল, নিশ্চিত কোনও সত্য জানায় না তাও জানা গেছে সেক্যুলার বিবর্তনবাদী গবেষকদের মুখ থেকেই । সর্বোপরি কেন বিজ্ঞানী-মহল বিবর্তন ব্যতিব্যস্ত তাও জানা গেছে, পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের কারণে মানব উৎপত্তি ব্যাখ্যায় জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া উপায় তাদের নেই ।

অধ্যায় ৬

আমার বিশ্বাস

কথোপকথন

ঈশ্বর নাই

- ঈশ্বর নাই! তা কী করিয়া এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলে বাবা?

- জীবনে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ঈশ্বর নাই।

- ভালো করিয়াছ বাবা। আমিও জীবনে বহুবার ধুনি জ্বালিয়া তাহার সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া, নিরন্তর নাম জপ করিয়া, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পারি নাই; তদবধি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এনট্রোপি বলিয়া কিছু থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে।

- ধুনি জ্বালিয়া তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করা যায় ইহা আপনাকে কে বলিয়াছেন?

- ল্যাবরোটারিতে বুনসেন বার্নারের উপরে ঈশ্বর আসিয়া লেজ নাড়িতে থাকিবেন, এবং অ্যামমিটারে তাহার হাঁচি ধরা পড়িবে, এ-কথা তোমাকে যিনি বলিয়াছেন বাবা, সম্ভবত তিনি-ই বলিয়াছেন।

- ঈশ্বর কে অদ্যাবধি কেহ দেখিয়াছেন?

-উহা সম্ভবত বিগ বেন কিংবা স্ট্যাচু অব লিবার্টির মত দ্রষ্টব্য বস্তু নহে। শুনিয়াছি চৈতন্যগভীরে তাঁহার অবর্ণনীয় সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আচ্ছা বাবা, তুমি পরমাণু দেখিয়াছ?

- আমি দেখি নাই তবে যাঁহারা প্লাটিনামের পরমাণু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, পরমাণু খালি চোখে দর্শন করা সম্ভব নহে। উহা দর্শন করিতে হইলে

STEHM নামক মহার্ঘ মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিমাণ বিজ্ঞান-যোগ্যতা অর্জন করিলে আমার পক্ষেও তাহা দর্শন করা অসম্ভব নহে।

- বুঝিয়াছি, যাঁহারা ঈশ্বর জানিয়াছেন, তাঁহারও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর সাধারণ ৬/৬ দৃষ্টিশক্তির অধিগম্য নহে। তাঁহাকেও দর্শন করিতে হইলে প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রয়োজন। *STEHM* হাতে পাইতে হইলে যেমন তোমার ভাষায় কিছু 'বিজ্ঞান-যোগ্যতার' প্রয়োজন হয়, তেমনি ঈশ্বর পাইতে হইলেও সাধন-যোগ্যতা আবশ্যক। দেশপ্রিয় পার্কে বসিয়া বাদাম চিবাইতে চিবাইতে তাঁহার দেখা নাও মিলিতে পারে। অধ্যাত্ম-জগতেও অধিকারী ভেদ বলিয়া একটি বস্তু আছে। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র স্পেশাল থিয়োরি অব্ রিলেটিভিটি বুঝিতে চাহিলে বিড়ম্বনা ঘটাই সম্ভব।

- ঈশ্বর একটি ঘোর অবৈজ্ঞানিক বিষয়, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন?

- অস্বীকার করিব কেন? ঈশ্বর বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয় নহে, একথা দশ সহস্রবার বিশ্বাস করি। কিন্তু, অবৈজ্ঞানিক বিষয় অর্থেই যে তাহা অস্তিত্বহীন, এ ভ্রান্তকথা বিশ্বাস করি না।

- বুঝাইয়া বলুন।

- এই মনে করো, কবিতা; ইহা কীভাবে লিখিত হয়, বিজ্ঞানে তাহার কোনও উত্তর নাই। ভ্যান গগ আঁকিলে স্টারি নাইট হইয়া থাকে, আর আমি আঁকিলে কেন তাহা টিউবলাইট হইয়া যায়, তাহারও কোনও ব্যাখ্যা কোনওরূপ বিজ্ঞান-তত্ত্বেই নাই। থাকিবার কোনও প্রয়োজনও নাই, কেননা ইহা শিল্প-তত্ত্বের বিষয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয় নয় বলিয়াই শেক্সপীয়রের সনেট হইতে বতিচেল্লির ভেনাস—কোনওটারই পশ্চাতে প্রতিভা নামক একটি অনির্ণেয় রহস্য নাই, এইরূপ বলা কি ঘোরতর অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হইবে না?

- কিন্তু এমন বহু ব্যক্তিকে আমি জানি, যাঁহারা অনেকদিন সাধন-ভজন করিয়াও ঈশ্বর পান নাই।

- আমি আরও বহুতর ব্যক্তিকে জানি বাবা, যাঁহারা আরও অনেকদিন চেষ্টা করিয়াও আই আইটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিতে পারেন নাই।

- তাহার দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?

- এইটুকুই প্রমাণিত হয় বাবা যে, মালা জপিলেই ঈশ্বর মিলিবে এবং পাথফাইন্ডারে

পড়িলেই আই আইটি পাইবে, এইরূপ কোনও চুক্তি ঈশ্বর এবং আই আইটি কর্তৃপক্ষ কাহারো সহিত অন্তত এখনো পর্যন্ত করেন নাই।

- তা কেন? যোগ্য কোনও শিক্ষক, যিনি নিজে আই আইটি পাইয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোনও বুদ্ধিমান ছাত্র নিরন্তর পড়াশুনো করিলে আই আইটি প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

- যোগ্যতর কোনও শিক্ষক, যাঁহার ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটিয়াছে, তাঁহার নির্দেশিত পথে, কোনও নিষ্ঠাবান ভক্ত যদি নিরন্তর সাধনা করিয়া চলে, তাঁহারও ঈশ্বরোপলব্ধি না-ঘটিবার কোনও কারণ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

- কিন্তু এই উপলব্ধি যে তাঁহার সত্যই ঘটিল, তাহা কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব?

- না বাবা, উপলব্ধি বিষয়টি ভাবজগতে অবস্থিত, বস্তুজগতে নহে। সুতরাং, কোনও পরীক্ষাগারেই ইহার কোনওরূপ প্রমাণ মিলিবে না।

- এইরূপ উদ্ভট অধ্যাত্মজগৎ লইয়া বিজ্ঞানী তাহা হইলে কী করিবেন?

- কিছুই করিবেন না, অনধিকারচর্চা করিয়া তাঁহার লাভই বা কী? তাঁহার করিবার এবং ভাবিবার মতো বিষয় জগৎ-সংসারে অনেক আছে। ঈশ্বর তাঁহার সাবজেক্ট নহে।

- অনধিকারচর্চা !

- অবশ্যই! বিজ্ঞানী ল্যাপলাসকে একবার সম্রাট নেপোলিয়ান প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে এত পৃষ্ঠার বই যে তিনি লিখিলেন সেলেসটাল মেকানিকস্ লইয়া, তাহাতে একবারও ঈশ্বরের কথা উচ্চারিত হয় নাই কেন? ল্যাপলাস উত্তর দিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টির জন্য ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন হয় নাই। আমিও তাহাই বলিতেছি বাবা, ঈশ্বর নামক অবস্তুটি লইয়া কাজকর্ম করিবার জন্য জগতে শাস্ত্র ও দর্শনগ্রন্থের কোনও অভাব নাই, বিজ্ঞানের এই বিষয়টি লইয়া মাথা না ঘামাইলেও চলিবে, বুঝিয়াছ বাবা? [১]

...

নাস্তিকদের নানাবিধ স্রষ্টাবিরোধী যুক্তির অন্যতম একটি হলো বিজ্ঞান বনাম স্রষ্টার এক রণক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। তাই আমাদের বিজ্ঞান কী, সে কী বলতে পারে আমাদের, কী পারে না; এসব প্রত্যেকেরই জানার দরকার।

১. অধ্যাপক হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত) [https://tinyurl.com/y796z64f]

দুই ব্যক্তির কথোপকথনের এই দৃশ্যপটে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে—বিজ্ঞানের কর্মের সীমা ও তার সীমাবদ্ধতা।

এই ব্যাপারটা পুনরায় আলোচনার দাবি রাখে। দার্শনিক ডেভিড বর্গেট এবং ডেভিড শালমার্স একটি গবেষণা প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল—*দার্শনিকরা কি বিশ্বাস করেন?* উক্ত গবেষণায় বিভিন্ন শাখার দার্শনিকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল স্রষ্টায় বিশ্বাস নিয়ে। এই *পিয়ার রিভিউড* গবেষণায় বেরিয়ে আসে—যারা 'ধর্মের দর্শন' (*Philosophy of Religion*) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে মাত্র ২০.৮৭% অবিশ্বাসী এবং ৭৯.১৩% শতাংশ বিশ্বাসী। অন্যদিকে যারা দর্শনের অন্যান্য শাখায় অভিজ্ঞ তাদের মধ্যে ৮৬.৭৮% অবিশ্বাসী এবং ১৩.২২% বিশ্বাসী। অর্থাৎ, বলা যায় একজন দার্শনিকের স্রষ্টায় বিশ্বাসের যুক্তিগুলো নিয়ে গভীরভাবে পড়ালেখা করলে বিশ্বাসী হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় চারগুণ বেশি। [২] এক্ষেত্রে, দার্শনিকের পূর্ব বিশ্বাসকে আমলে নিলেও দেখা যায়—একজন দার্শনিকের স্রষ্টায় বিশ্বাসের যুক্তিগুলো নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন তার বিশ্বাসী হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১.১৯ গুণ বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ এই কথা কেন বলছি? বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞানের ব্যপ্তি এখন এত বেশি—কোনও একটি বিষয় নিয়ে একজন গবেষকের জীবনের অধিকাংশ সময় পার করে দিতে হয়। ফলে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে তার অবস্থান বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের যুক্তি নিয়ে পড়ালেখার ওপর নির্ভর করে না; তারা এসব নিয়ে গভীরভাবে পড়ার সময়/আগ্রহ পান না। বরং তার বিশ্বাস নির্ভর করে তার পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় শিক্ষা ও অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অ্যাকাডেমিক-স্থানে সুবিধাজনক পজিশনের থাকার প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর। গবেষক একল্যান্ড এবং স্কেইটেল যুক্তরাষ্ট্রের ২১টি এলিট রিসার্চ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন—বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়টি তাদের স্ব স্ব ফিল্ডের অ্যাক্সপারটিজের ওপর নির্ভর করে না। বরং তাদের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, সন্তান থাকা বা না থাকা, সে নিজে ছোট থাকাকালীন তার পরিবারের ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি ওপর নির্ভর করে। [৩]

---

২. David Bourget and David J. Chalmers, What Do Philosophers Believe? Philosophical Studies, vol. 170, Issue 3, p. 465–500 (September 2014)

৩. Elaine Howard Ecklund and Christopher P. Scheitle, Religion among Academic Scientists: Distinctions, Disciplines, and Demographics. Social Problems, Vol. 54, No. 2, p. 289-307 (May 2007)

সুতরাং বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচর্চা করে নাস্তিক হয়েছেন বলে যে বয়ান আমাদের শোনানো হয়, তা মূলত প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়। আমরা প্রথম অধ্যায়েই এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপচারিতা সেরে এসেছি। শেষ প্রান্তে এসে আবারও সেটাই মগজের ভেতর গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষদের বিজ্ঞানের কর্মপরিধি শেখানোর জন্য, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্যালিওন্টোলজি মিউজিয়াম কর্তৃক পরিচালিত *Understanding Science* ওয়েবসাইটে বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একগাদা ভুল ধারণা তালিকাবদ্ধ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে।[৪] যা পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নাস্তিকেরা মূলত বিজ্ঞান প্রচার করেন না, বিজ্ঞানের মোড়কে নিজেদের দার্শনিক প্রকৃতিবাদের (অন্ধ)বিশ্বাস প্রচারের অপচেষ্টা চালান। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশই এই দুইয়ের মাঝে ফারাক বুঝে উঠতে পারেন না।

মূলত সাধারণ মানুষদের মাঝে যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না তাদের একাংশ বিজ্ঞানের ওপর ভর করে নাস্তিকতার পথ বেছে নেন। নাস্তিক লেখিকা তসলিমা নাসরিন এক ফেইসবুক স্ট্যাটাসে এই সত্য নিজের অজান্তেই স্বীকার করে ফেলেছেন :

> "সায়েন্স পড় সায়েন্স পড় বলে বলে মানুষকে র‍্যাশনাল হওয়ার উৎসাহ দিয়েছি জীবনভর। লাভ হয়নি। সায়েন্সে পড়া মানুষগুলো, মানে ওই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারগুলো, ফিজিক্স কেমেস্ট্রির পন্ডিতগুলো, বেশিরভাগই দেখি ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ধর্মের আজগুবি গপ্প নিয়ে সন্দেহ করে, প্রশ্ন করে, বা ধর্ম থেকে সরে আসে যারা, তারা অধিকাংশই আর্টসের সাজেক্ট নিয়ে লেখাপড়া করেছে, সাহিত্য বা দর্শন পড়েছে, আর্ট কলেজে পড়েছে, ফিল্ম নিয়ে পড়েছে। তাহলে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য বিজ্ঞান মুখস্ত করার দরকার হয় না, বিজ্ঞান পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ারও দরকার হয় না!!" [৫]

বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক অনুধাবন আত্মস্থ করতে আমারও বেশ সময় লেগেছে, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তারপরই কেবল বুঝে উঠতে পেরেছি। তার পর সন্ধানে ব্যপৃত হয়ে এক পর্যায়ে ইসলামকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসেবে বেছে নিতে মনস্থির করেছি। এতক্ষণ তো অন্যের বিশ্বাসকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলাম। এবার নাহয় নিজের বিশ্বাসের ডালা খুলি। দেখা যাক, কী কী ফুল মেলে!

---

৪. Misconceptions about science, Understanding Science. Available at: https://undsci.berkeley.edu/teaching/misconceptions.php

৫. http://archive.is/0QAAM

মহাজগতের সূচনা

বর্তমান ধারণা অনুযায়ী প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে এক সিঙ্গুলারিটি থেকে মহাগর্জন (*Big Bang*) এর মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা ঘটে। এর আগে বৈজ্ঞানিক মহলে মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে যে ধারণা ছিল তাকে *Steady State Model* বলা হতো; যার বক্তব্য ছিল মহাবিশ্বের শুরু-শেষ কোনওটাই নেই। আইনস্টান থেকে শুরু করে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা তখন এই তত্ত্বেই একমত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে হাবলের টেলিস্কোপে পাওয়া মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশানের আবিষ্কার প্রভৃতি কসমোলজির ধারণায় প্যারাডাইম শিফট নিয়ে আসে; আর তা হলো এই মহাবিশ্বের সূচনা রয়েছে।

ড. আজাদ *মহাবিশ্ব* গ্রন্থে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে কথামালা সাজিয়েছেন, তিনি যে ব্যাখ্যা চয়ন করেছেন তা হলো বহুল প্রচলিত কসমিক ইনফ্লেশান ধারণা।[৬] এই ধারণা অনুযায়ী—মহাজগতে যত বস্তু ও শক্তি আছে একদা সেসব ছিল চরম ঘনীভূতরূপে। এক সময় ঘটে ওই ঘনীভূত শক্তি ও বস্তুর বিস্ফোরণ, যাকে বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল তাচ্ছিল্য করে নাম দেন বিগ ব্যাং; এরই সাথে সূচনা হয় মহাজগতের। ওই বিস্ফোরণের ফলে প্রসারিত হতে থাকে মহাজগৎ, যা আজও চলছে। মহাজগৎ চিরসম্প্রসারণশীল। মহাজগতের, অর্থাৎ স্থানের বিস্তারের সাথে সাথে সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বস্তু ও শক্তি। বিস্ফোরণের কালে মহাজগতের সব এলাকা আলোকিত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু সময় বইতে থাকে, মহাজগৎ সম্প্রসারিত হতে থাকে, বিকিরণ শীতল হতে থাকে, আর মহাজগৎ অন্ধকার হতে থাকে।

আদি-মহাজগৎ পরিপূর্ণ ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে, এবং বিকিরণে। তখনই সৃষ্টি হয় নক্ষত্রমণ্ডলী। মহা-বিস্ফোরণের এক বিলিয়ন বছরের মতো সময়ের পর দেখা যায় কোথাও বস্তু জড়ো হয়েছে, আবার কোথাও জড়ো হয়নি। তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চারপাশের গ্যাসকে আকর্ষণ করে, যার থেকে সৃষ্টি হয় নক্ষত্রমণ্ডলীপুঞ্জ। ওই মহাবিস্ফোরণ থেকেই দেখা দেয় নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্র, গ্রহ, তার পর জীবন। (পৃ. ৭৪-৭৫)

মহাজগৎ নিয়ে এ সকল কথামালার মাঝে হঠাৎ করে তিনি ভুল করে বসেছেন। তিনি বলেছেন :

---

৬. আরও দেখুন: হুমায়ুন আজাদ, মহাবিশ্ব; পৃ. ১৫

"মহাজগতের অধিকাংশ এলাকা জুড়েই রয়েছে শূন্যতা। মহাজগৎ এক বিশাল শীতল অনন্ত মহাশূন্যতা, যার এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরেক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করছে চিরঅমারাত্রি, ওই শূন্যস্থলে অন্ধকার শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। মহাজগৎ এমন অনন্ত শূন্যতা যে তাতে গ্রহ, নক্ষত্র, আর নক্ষত্রপুঞ্জকে দুর্লভ বস্তু ব'লেই মনে হয়।" [পৃ. ৬৫]

মূলত মহাকাশ (*outer space*) মহাশূন্য জায়গা নয়। এখানে শীতলতা ও অন্ধকার ছাড়াও অনেক কিছু থাকে—এতে প্লাজমা অবস্থায় থাকে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, থাকে তাড়িতচুম্বক বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র, নিউট্রিনো, মহাজাগতিক ধুলো ও রশ্মি ইত্যাদি।[৭] অনেকেই ভাবেন মহাশূন্য মানে এ জায়গা পুরোই খালি, এমন ধারণা পুরোই ভুল। তবে যেহেতু অধ্যাপক সাহেব মহাবিশ্ব নিয়ে স্বতন্ত্র বই রচনা করেছেন, তাই উনার এমন ভুল বেশ চোখে লাগে।

যাই হোক, মহাবিশ্বের সূচনা-সংক্রান্ত উপরি-উক্ত ধারণা আমাদের কালে এতটাই প্রচলিত যে, সাধারণ মানুষেরা একে একেবারে ফ্যাক্ট মনে করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন অনেক বিজ্ঞানী মানতে চাননি যে, মহাবিশ্বের সূচনা রয়েছে। নাস্তিক ফ্রেড হয়েল নাক সিঁটকিয়েছেন, কঠোর সমালোচনা করেছেন; থমাস গোল্ড ও হারম্যান বন্ডির সাথে মিলে আবার *Steady State Theory* দাঁড় করানোর পাঁয়তারা করেছেন।[৮] এদিকে রাশিয়ান নাস্তিক বিজ্ঞানীরাও প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন! কেন? কারণ, মহাবিশ্বে সূচনা আছে এটা মেনে নিলে স্রষ্টাকে মেনে নিতেই হবে; এটা কমন সেন্সের ব্যাপার। সিঙ্গুলারিটির আগে যেহেতু স্থান-কাল-পদার্থ-শক্তি কিছুই ছিল না, তাই যে 'কারণ' মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছে তা হবে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে; যিনি এই মহাবিশ্বকে শূন্য থেকে সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন, পরম শক্তিমান অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা।

ড. আজাদও মনে মনে স্বীকার করতে চান না যে মহাবিশ্বের সূচনা আছে। তাই নাস্তিক স্টিফেন হকিংয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি, এবং কুযুক্তিতে জড়িয়েছেন (*non sequitor*)। (পৃ. ১২২) হকিং বলতে চেয়েছেন যদি স্থান-কাল সসীম, তবে তার সীমারেখা নেই এমনটা ভাবা যায়; তা হলে মহাজগতের শুরু বা কোনও সৃষ্টির মুহূর্তও থাকবে না; তাই কোনও বিধাতারও দরকার নেই। মহাজগৎ সম্পর্কে নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* গ্রন্থে করে হকিং প্রস্তাব করেছেন :

---

৭. Elizabeth Howell, What is Space? Space.com, 07 July 2017

৮. হুমায়ুন আজাদ, মহাবিশ্ব; পৃ. ১৯-২০

"যতোদিন আমরা মনে করেছি মহাজগতের একটা শুরু আছে, ততোদিন আমরা মনে করতে পেরেছি যে এর একজন স্রষ্টাও আছেন। কিন্তু মহাজগৎ যদি হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার কোনও সীমানা নেই, তখন তার কোনও শুরু থাকে না, শেষও থাকে না; তখন শুধু থাকে মহাজগৎ। তখন স্রষ্টার/বিধাতার কী দরকার?"

আজাদ সাহেব খণ্ডিতভাবে শুধু হকিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি এড়িয়ে গেছেন ওই একই অধ্যায়ে হকিং নিজেও জোরের সাথে স্বীকার করেছেন-স্থান-কাল সসীম, তবে তার সীমারেখা নেই—এমনটা কেবল একটি প্রস্তাবনামাত্র, বাস্তবতা নয়। মহাজগতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবাও অনুমান ছাড়া কিছু নয়, তাই হকিং 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া বিখ্যাত তিনি পদার্থবিদ বোর্ড-ভিলেঙ্কিন-গুথ এর থিওরেম অনুযায়ী, যে মহাবিশ্বের হাবল এক্সপানশন রেট শূন্যের বেশি ($H_{av}>0$) তার অতীত অসীম নয়, অর্থাৎ এর সূচনা থাকতে হবে।[৯]

মহাবিশ্বের সূচনা ও এর অভাবনীয় ফাইন টিউনিং (অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য) ফ্রেড হয়েলের নাস্তিকতার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন:

"বাস্তব জগৎকে কমন সেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে বোঝা যায় যে, এক চরম-বুদ্ধিমত্তা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান নিয়ে খেলা খেলেছে, এবং প্রকৃতিতে কোনও অন্ধশক্তির কথা বলা বলার সুযোগই নেই আর। (ফাইন টিউনিং) এর বাস্তবতা হিসেবনিকেশ করলে যে ফলাফল দাঁড়ায়, তাতে আমি এতটাই বিমোহিত যে, এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে প্রায় প্রশ্নের উর্ধ্বে।"[১০]

ড. আজাদ আবগের প্রাবল্যে বলে বসেছেন :

"মহাজগত কতো বড়ো, কতো তার বয়স, কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে তার, এসব অবশ্য কল্পনায় ধারণ করাও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মহাজগতের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন, ভবিষ্যতে তাদের ব্যাখ্যা আরো সুষ্ঠ হবে। বিভিন্ন দেশের ধর্মের বইগুলোতে মহাজগতের উৎপত্তির যে-গল্প পাওয়া যায়, তা বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আদিম মানুষের রূপকথা; তাতে বিশেষ বিস্ময় নেই, কেননা তাদের কল্পনারও সীমা ছিলো; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মহাজগতের

---

৯. Robert J. Spitzer, New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy; p. 31 (Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2010)

১০. Fred Hoyle, The Universe: Past and Present Reflections. Engineering and Science, p.12 (November 1981)

উৎপত্তির যে-ব্যাখ্যা দেয়, তা এতো বিস্ময় ও চাঞ্চল্যকর যে তা অনেকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন । কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যায়ই পাই মহাজগতের অনন্ততা ও বিস্ময়করতার ঠিক পরিচয় । যদি বিধাতা সত্যিই থাকেন,— থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই,— এবং কোনও দিন যদি তিনি মহাজগত সম্পর্কে ধর্মের বইগুলোর ও বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা পড়ে ওঠেন, তাহলে বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করবেন । ধর্মের বইগুলো পড়ে তিনি হাসবেন ।" (পৃ. ৬৪)

ড. আজাদ মনে করেন বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাই নাকি মহাজগতের অনন্ততা ও বিস্ময়করতার ঠিক পরিচয়। তিনি মনে করেন বিজ্ঞান সত্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তিনি বলেছেন বিধাতা নাকি ধর্মের বইগুলো পড়ে হাসবেন, বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাই নাকি তিনি গ্রহণ করবেন! আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞানীদের কোন ব্যাখ্যা তিনি নিবেন? স্টেডি স্টেট মডেল নাকি বিগ ব্যাং মডেল? বিধাতার মেনে নেওয়া ব্যাখ্যাও কি সময়ের সাথে বদলে যাবে, যেমনটা বদলে যায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, থিওরি?

ড. আজাদ-সহ অনেকেই বর্তমান ধারণাকে একেবারে গস্পেল ট্রুথ ভেবে বসেছে। যদিও অধিকাংশ মানুষই জানে না, এই মডেল দুটি অনুমানের ওপর দাঁড়ানো। একটি হলো জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি, অপরটি কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল।[১১] আপেক্ষিতার সাধারণ তত্ত্ব যে-কটি অনুমানের ওপর দণ্ডায়মান, তার মাঝে একটি হলো—আলোর চেয়ে দ্রুত অন্য কিছুর গতি হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এমন কণার দেখা মিলেছে, যা আলোর চেয়ে দ্রুত গতির প্রতীয়মান হচ্ছে, এর নাম নিউট্রিনো।[১২] এর ফলে আপেক্ষিকার সাধারণ তত্ত্ব, হুমকির মুখে পড়ছে যা কিনা আধুনিক পদার্থবিদ্যার প্রধান খুঁটি! আর যেহেতু বিগ ব্যাং তত্ত্ব, আপেক্ষিতার সাধারণ তত্ত্ব যে মহাকর্ষ বলের সঠিক ধারণা দেয় এই অনুমানের ওপর দাঁড়ানো তাও টলোমলো হয়ে পড়ছে। ঝামেলা আরও বিস্তৃত, অবাক করার মতো ব্যাপার হলো কসমিক ইনফ্লেশান মডেল প্রণেতাদের একজন-সহ বেশ কিছু পদার্থবিদ ইনফ্লেশান ধারণা থেকে সরে আসতে চাইছেন।[১৩]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞান যা বলে বা বলতে চায়, তা সবই মূলত সম্ভাবনামূলক

---

১১. Big-bang model, Encyclopaedia Britannica Online. Available at: https://www.britannica.com/science/big-bang-model

১২. Finding faster-than-light particles by weighing them. Phys.org, December 26, 2014

১৩. Paul J. Steinhardt, The Inflation Debate: Is the theory at the heart of modern cosmology deeply flawed?. Scientife American, April 2011

কিছু ধারণা। আসলে বিজ্ঞানের প্রকৃতিটাই এমন। যদিও পপুলার লেভেলে এই ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানকে এভাবেই বোঝা হয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে জন বাওকার বলেন :

> "বৈজ্ঞানিক সমীকরণসমূহ অর্থাৎ বিশ্ব পরিচালিত হয় যে-সমস্ত মৌলিক গাণিতিক সূত্রে, সেগুলো নিয়েই পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের নকশা তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে, তা চূড়ান্ত নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্বরূপ কী তা কোনও বিজ্ঞানীই চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদেরকে বলতে পারবেন না...
>
> বিজ্ঞানের দাবিগুলো বিরাট আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয় নেওয়া হয়েছে। সাধারণত বিজ্ঞানের দাবিগুলো 'চূড়ান্ত সত্য এবং পুরোপুরি নিশ্চিত' হিসাবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা হলো দাবিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুমানিক-সঠিক, সাময়িক, ও সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত। এমনকি পরবর্তী জ্ঞানের আলোকে সেগুলো ভুলও প্রমাণিত হতে পারে। এ কারণেই পদার্থবিদ্যায় নোবেল-জয়ী (১৯৬৫) রিচার্ড ফেইনম্যান পদার্থবিদ্যার লেকচারের ভূমিকায় আইজাক নিউটনের মতোই এই কথায় জোর দেন যে 'বিজ্ঞানে অজ্ঞতার সীমানা সম্প্রসারণশীল', (তিনি আরও বলেন) :
>
>> 'সমগ্র প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষুদ্রাংশ সর্বদাই পূর্ণাঙ্গ সত্যের আংশিক অনুমানমাত্র, এই আংশিক অনুমানকেই আমরা পূর্ণাঙ্গ সত্য বলে মনে করে থাকি। সত্যি বলতে কী, আমরা যা কিছু জানি তার সবই এক প্রকার অনুমানমাত্র। কারণ আমরা জানি যে, এখনও সব সূত্র আমরা জেনে উঠতে পারিনি। তাই এমন মানসিকতা নিয়ে শিখতে হবে যে, কখনও তা ভুলে যাওয়া লাগতে পারে। একটু ঘুরিয়ে বললে, কীভাবে সংশোধিত হওয়া যায় তাই শিখতে হবে।'
>
> সুতরাং, বিজ্ঞানের দাবিসমূহ সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত এবং অপূর্ণাঙ্গ, এবং এমনকি পরবর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে ভুলও হতে পারে।" [১৪]

তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত ভেবে তা নিয়ে ধর্মকে আক্রমণ করা নিতান্তই অজ্ঞতা/অহংকারের ফল। এসকল মানুষের কাছে বিজ্ঞান মূলত একটি ধর্মের ন্যায়; যার আছে নিজস্ব সৃষ্টিকথা, আপেক্ষিক নৈতিকতা; বিজ্ঞানীরা পাদরি-পুরোহিতের

---

১৪. John Bowker, God: A Very Short Introduction; p. 32-33

স্থানে বসে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন এমন বিষয়ে, যা তাদের সীমারই বাইরে।

চলুন আমরা আমাদের চিন্তার সীমা প্রসারিত করি। আল-কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানুষকে ক্রমাগত চিন্তার আহ্বান জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা তূরে আল্লাহ মানুষকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নের আলোকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ চারটি অপশন হতে পারে :

১. এটি শূন্য থেকে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে

২. এটি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে

৩. এটি এমন কেউ/কিছু সৃষ্টি করেছে, যে/যা নিজে সৃষ্ট

৪. এটি এমন কেউ/কিছু সৃষ্টি করেছে, যে/যা নিজে সৃষ্ট নয়

অপশন ০১ : মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে

এক্ষেত্রে প্রথমেই যা বোঝা দরকার তা হলো, শূন্য বা শূন্যতা মূলত বলতে কী বোঝায়? শূন্যতা হলো সকল কিছুর অনুপস্থিতি; সকল পদার্থ-স্থান-শক্তি ও বিভব, কার্যকারণ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে, তবে সে অবস্থাকেই শূন্যতা বলা হবে। অ্যারিস্টটল শূন্যতার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—পাথর যা স্বপ্ন দেখে, তাই শূন্যতা! পাথর যেহেতু নির্জীব বস্তু, তাই তার স্বপ্ন দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না।

তো মহাবিশ্ব কি এমন শূন্যতা থেকে তৈরি হতে পারে? সোজা উত্তর, না। কারণ নাথিং থেকে নাথিং ছাড়া আর কিছুই আসে না। ক্লাসিক্যাল মেটাফিজিক্সের সূত্র হলো : *ex nihilo nihil fit* অর্থাৎ *Nothing comes from nothing*। সহজ অঙ্ক করুন ০+০+০ =? ৩ নাকি? বাচ্চাও জানে এর উত্তর হলো একটা গোল্লা! মানে শূন্য। আপনার পকেটে যদি নাথিং থাকে, তা হলে আমাকে সেই পকেট থেকে ৫০০ টাকা বের করে দিতে পারবেন? পারবেন না। এখন হয়তো বিজ্ঞভাব নিয়ে কোনও নাস্তিক বলে উঠতে পারে, এহেম! মিস্টার, আপনার জ্ঞান এট্টু কম কম লাগছে। বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়েছে দাদা। বিজ্ঞান বলছে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে। কেন, নাস্তুদাদাদের বই পড়েননি বুঝি? ঘোত ঘোত!

ওরে মশাই থামুন একটু। ওনাদের ধার করা বই না, আমি মূল বইটাই খুলে দেখেছি। (যৌন হয়রানির মামলা খাওয়া) নাস্তিকগুরু প্রফেসর লরেন্স ক্রাউস-এর লেখা *A Universe from Nothing : Why There is Something Rather*

Than Nothing বইতে তিনি এমন সম্ভাবনার কথা বলেছেন যে, মহাবিশ্ব শূন্যতা থেকে নিজেকে তৈরি করতে পারে। এটা শুনেই দাদারা যা খুশি না! পারলে এখনই আনন্দে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয় আরকি! কিন্তু ঝামেলা হলো ক্রউস যে শূন্যতার কথা বলেছেন, তা হলো কোয়ান্টাম শূন্যতা, ক্লাসিক্যাল অর্থে শূন্যতা না, বরং কোয়ান্টাম শূন্যতা হলো তরঙ্গায়িত শক্তির এক সমুদ্রের ন্যায়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কোয়ান্টাম শূন্যতা নাথিং নয়, বরং সামথিং, সামথিং ফিজিক্যাল। এককালের খ্যাতনামা নাস্তিক, প্রফেসর এনটনি ফ্লিউ বলেন :

> "বেশ কিছু মহাকাশতত্ত্ববিদ অনুমান করেছেন যে, মহাবিশ্ব 'শূন্য' থেকে উদ্ভব হয়েছে।... (তাদের দাবিকৃত) এই 'শূন্যতা' হল ক্ষেত্র বিশেষে শক্তির চমকপ্রদ উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট স্থান-সময়ের ফেনার ন্যায়।"[১৫]

ফিজিক্যাল সামথিংকে নাথিং নাম দিয়ে ধান্দা করার চেষ্টা বঙ্গীয় মাথামোটাদের দল না বুঝলেও, সাহেবরা ঠিকই বুঝেছেন। নিউ সাইন্টিস্ট ম্যাগাজিন প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউসের '*Nothing*' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

> "যদিও পরিশেষে তাকে একটু সূক্ষ্ম কারচুপির আশ্রয় নিতে হয়েছে। বস্তুত স্থান ও কাল শূন্যতা থেকে আসতে পারে: যে শূন্যতাকে ক্রউস চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (এই বলে): শূন্যতা হলো (প্রকৃত অর্থে শূন্যতা নয় বরং) অত্যন্ত অস্থিতিশীল অবস্থা যা থেকে 'সামথিং বা কোনও কিছু'-র উদ্ভব হওয়া প্রায় অনিবার্য।" [১৬]

প্রফেসর ক্রউস কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রগুলোকে সঠিক ধরে নিয়েই (নৈতিকতার দায়বদ্ধতা থেকে বাঁচার জন্য) শূন্য থেকে মহাবিশ্ব তৈরি হওয়ার গপ্পো ফেঁদেছেন। খোদার স্থানে প্রকৃতির সূত্র আর কোয়ান্টাম শূন্যতাকে বসিয়ে হাফ ছেড়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের হাত সাফাই ধরতে পারেননি। এই চোরামির জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন নাস্তিকমহল থেকেই! পদার্থবিদ জর্জ এলিস-এর মতে, ক্রউসের এই বই হলো স্রেফ অপ্রমাণিত দার্শনিক কপচানি মাত্র![১৭] আরেক

১৫. Prof. Antony Flew, There is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind; p. 142

১৬. Michael Brooks, Trying to make the cosmos out of nothing; The NewScientists, Issue 2847, 14 January 2012

১৭. John Hogran, Is Lawrence Krauss a Physicist, or Just a Bad Philosopher. Scientific American, 20 November 2015

নাস্তিক দার্শনিক ডেভিড অ্যালবার্ট ক্রউসের বইয়ের রিভিউতে লিখেছেন,

" ... আমার চোখে ক্রউসের অবস্থান একেবারেই ভুল। ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সমালোচনা করছেন, তারা একদম সঠিক।..." [১৮]

সুতরাং, শূন্যতা থেকে আপনা-আপনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, এই অপশন বাতিল। চলুন পরের অপশনে যাওয়া যাক।

অপশন ০২ : মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে

'সৃষ্টি হয়েছে' দ্বারা মূলত বোঝায় কোনও কিছুর আগে অস্তিত্ব ছিল না, পরে তা অস্তিত্বে এসেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে এটা অযৌক্তিক চিন্তা। কারণ কোনও কিছুর যদি অস্তিত্বই না থাকে, তা হলে সেটি সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি/ক্ষমতা পাবে কোথায়? এমন বলার মানে হলো মহাবিশ্ব একই সাথে অস্তিত্বে ছিল আবার ছিল না! পাগলের প্রলাপ! অন্যভাবে বলি—আপনার মা কি নিজেকে জন্ম দিতে পারবে? বড় অদ্ভুত প্যাঁচ!

সরাসরি এমন প্যাঁচ মারলে তো পাব্লিক খাবে না। তাই ঘুরিয়ে এমন দাবি করেছেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি আর কেউ নন, সদ্যপ্রয়াত স্টিফেন হকিং। তিনি আলোচিত গ্রন্থ '*The Grand Design*'-এ বলেন :

"যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের মতো (পদার্থবিদ্যার) সূত্র রয়েছে, (তাই) মহাবিশ্ব নিজেকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করতে পারে।"[১৯]

বাহ বাহ! কী মজার কথা। কিন্তু বস্তুবাদীদের জন্য মুশকিল প্রশ্ন হলো, এই সূত্রগুলো কোথা থেকে এল? চলুন একটা অনুগল্পের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা আরেকটু খোলাসা করা যাক। দুজন লোক ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বাতচিত করছে :

– এই যে মাঠ দেখছিস, গড়পড়তা এটি ১২০ মিটার বাই ৯০ মিটার হয়। সবুজ হতে হবে মাঠ, বুঝলি? ওই যে দুই পাশে সাদা বাক্সের মতো দেখছিস, ওগুলোকে গোলপোস্ট বলে, ওটা থেকে ৬ ইয়ার্ড ও ১৮ ইয়ার্ড দূরে দুটো সাদা বাক্স আঁকা। মাঠের মাঝখানে দেখ, একটা গোল্লা আঁকা। খেলা মোট ৯০ মিনিটের হয়, ৪৫ মিনিট পরে

---

১৮. David Albert, On the Origin of Everything, The New York Times, 23 March 2012

১৯. Adam Gabbatt, Stephen Hawking says universe not created by God. The Guardian, 2 Sep 2010

একটা ব্রেক। প্রতি দলে খেলোয়াড় লাগে ১১ জন, এর মধ্যে ১ জন গোলকিপার। খেলোয়াড়দের কাজ হলো অপর গোলপোস্টের জালে বলটাকে জড়িয়ে দেওয়া। তারপর নাদনকোদন করে গোল উদ্‌যাপন। এটাই হলো ফুটবল। তবে সাবধান, ফাউল বা অফসাইড করা যাবে না। তা হলে মাশুল দিতে হবে, বুঝলি।

– হুম, বুঝলাম। তো এই খেলাটা বানালো কে?

– কেউ বানায়নি!

– মানে! ফাজলামো করছিস?!

– নাহ! ফাজলামো করব কেন? শোন, যেহেতু ফুটবল খেলার জন্য নিয়ম বা সূত্র আছে, সুতরাং ফুটবল খেলা নিজেকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করতে পারে।

– গাঁজা খেয়েছিস নাকি? প্রথমবার খেলি?

গল্পের ১ম জনের ব্যাখ্যা শুনে আমার-আপনার অভিব্যক্তি ২য় জনের সাথে পুরোপুরি না মিললেও খুব একটা ভিন্ন হবে না। আপনি হয়তো বলবেন, কিরে রঙিন পানি খেয়েছিস নাকি? প্রথমবার খেলি? অথবা কিরে বাবা খেয়েছিস নাকি? প্রথমবার খেলি?

তো কেন এমন অভিব্যক্তি? কারণটা সহজ, আমরা সবাই জানি সূত্র কোনও স্বতন্ত্র-স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়। এগুলো হলো কিছু প্যাটার্ন, কমন সেন্স বলে এগুলো কোনও বুদ্ধিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করে। সূত্র আছে, তাই হাওয়া থেকে হয়ে গেছে এমন গাঁজাখুরি ব্যাখ্যা কোনও সুস্থ মানুষ মানবে না। *The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature and the Existence of God*-গ্রন্থে অক্সফোর্ডের দার্শনিক জন ফস্টার যুক্তি দেখিয়েছেন প্রকৃতির এই নানাবিধ সূত্রগুলোর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা।[২০]

হকিং সাহেব তো সূত্রকে স্বয়ম্ভু বানিয়ে ফেলেছেন। উনার এমন কথার মানে হলো, মহাবিশ্বে এমন মাপা সূচনা পদার্থবিজ্ঞানীদের সূত্রই নির্ধারণ করে দিয়েছে। বাহ বাহ! এই, ওয়েট আ মিনিট? তার মানে বিগ ব্যাং-এর আগেও সূত্র ছিল! কিন্তু বিগ ব্যাং-এর আগে তো টাইম-স্পেস-এনার্জি-ল কিচ্ছু ছিল না। তো সূত্র এল কোথা থেকে? পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোর জন্মই তো হয়েছে বিগ ব্যাং-এর পর! এই সেরেছে! সূত্রের উৎস সম্পর্কে নাস্তিক প্রফেসর অ্যালেক্সে ফিলিপ্পেনকোকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বেশ সততার সাথে বলেছেন,

২০. John Foster, The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature and the Existence of God; p. 160 (Oxford: Clarendon, 2004)

"... পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর উৎস কী? তা আমি জানি না। বিজ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।"[২১]

কেন অক্ষম? কারণ তা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। হকিং সাহেব খোদার জায়গায় সূত্রকে বসিয়ে দিয়েছেন! সেক্যুলার গবেষক, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পল ডেভিস এই সত্য স্বীকার করে বলেন :

"হকিং এর এই দাবিকৃত সূত্র হলো মূলত ব্যাখ্যাহীন ও উর্ধ্বে অবস্থানকারী স্রষ্টার সমতূল্য!"[২২]

তাই বলা যায়, মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে এই চিন্তাও ভুল। এবার আলোচনা হবে পরের অপশন নিয়ে।

অপশন ০৩ : মহাবিশ্বকে এমন কেউ/কিছু সৃষ্টি করেছে যে/যা নিজেও সৃষ্ট

এই অপশন নিয়ে এবার চিন্তায় মগ্ন হওয়া যাক। আমাদের এই মহাবিশ্বকে *U1* নাম দেওয়া যাক। ধরা যাক একে সৃষ্টি করেছে *U2*, তাকে সৃষ্টি করেছে *U3*, একে সৃষ্টি করেছে *U4* ইত্যাদি। এভাবে প্রতিটি অবস্থা তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে এসেছে। একে নিম্নরূপে লিখা যাক:

$$U1 \leftarrow U2 \leftarrow U3 \leftarrow U4 \leftarrow U5 \leftarrow U6 \leftarrow U7 \; .... \; U\infty$$

নাস্তিক দার্শনিক কুইন্টন স্মিথকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—কেন মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল, উত্তরে তিনি ওপরের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। উনার কাছে এটাই নাকি সবচেয়ে লজিক্যাল ব্যাখ্যা![২৩] আদৌ এই ব্যাখ্যা লজিক্যাল কি না, সেই আলোচনার আগে, ব্যাপারটাকে আরও সহজভাবে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৯৭১ সাল, পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র-সংগ্রামে লিপ্ত বাংলার দামাল ছেলেরা। কোনও এক গেরিলা মিশনের কথা, চোখের সামনে হানাদার সৈন্য

---

২১. 'Scientists only understand 4% of universe'. RT News, 29 Jul, 2012

২২. Paul Davies, Stephen Hawking's big bang gaps. The Guardian, 4 Sep 2010

২৩. Quentin Smith - Why is there Something rather than Nothing? Closer To Truth, Available at: https://youtu.be/M5n4mJkVivs

এদিক-ওদিক হেঁটে টহল দিচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার বন্দুকের মাযল হানাদারের দিকে তাক করা। ট্রিগারের ওপর সামান্য চাপেই খুলি ফুটো হয়ে যাবে হায়নাটির। খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিশন, তাই গুলি করার আগে মুক্তিযোদ্ধা তার ওপরের যোদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, গুলি করব? ২য় জন বলল, দাঁড়াও আমার ওপরের জনকে জিজ্ঞেস করে নিই; সে ৩য় জনের কাছে অনুমতি চাইল। ৩য় জন বলল, দাঁড়াও আমার ওপরের জনকে জিজ্ঞেস করে বলছি। ৪র্থ জন শুনে বলল, আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো; আমার ওপরের জনকে জিজ্ঞেস করে জানাচ্ছি। এভাবে অনুমতি নেওয়া যদি চিরকাল, অসীম পর্যন্ত চলতে থাকে তা হলে ১ম জন কী আদৌ গুলি ছুড়তে পারবে? অবশ্যই পারবে না। এক্ষেত্রে এমন একজন প্রয়োজন যে স্বয়ং সিদ্ধান্ত দিতে পারে, অন্য কারও অনুমতির মুখাপেক্ষী নয় সে।
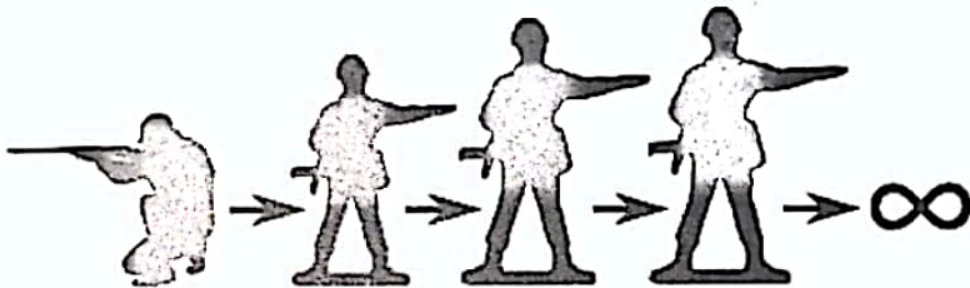
অনুমতি নেওয়া অসীম পর্যন্ত চলতে থাকলে যুদ্ধ জয় আর হবে না

তেমনিভাবে, মহাবিশ্ব যদি এমন কিছু/কেউ সৃষ্টি করে যে নিজেও সৃষ্ট তা হলে যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন কিছু/কেউ মিলবে যে নিজে সৃষ্টি হওয়া থেকে মুক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ; ততক্ষণ পর্যন্ত মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্ভব না। কার্যকারণের এই ধারা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকলে শুধু অস্তিত্বহীনতাই থাকবে; ক্ষণস্থায়ী কারণের (*temporal causes*) শেষপ্রান্তে যদি চূড়ান্ত কারণ (*ultimate cause*) না থাকে, তা হলে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব অসম্ভব।[২৪]

যেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে, তাই সামগ্রিক-বিবেচনায় এই অস্তিত্বের পিছে একমাত্র যৌক্তিক কারণ হলো এমন কেউ/কিছু যা যে নিজে মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে আনার ক্ষমতা রাখে; যে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত, পরম স্রষ্টা। কিন্তু বস্তুবাদী কেউ এই ব্যাখ্যা মানতে চাইবে না; তাদের কেউ স্রষ্টার জায়গায় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বসাবে, কেউ কোয়ান্টাম শূন্যতা বসাবে, কেউ কৃষ্ণগহ্বর বসাবে, কেউ মহাবিশ্বকে বসাবে!

---

২৪. Jafar Idris, Contemporary Physicists and God's Existence (part 2 of 3): A Series of Causes. Available at: http://www.islamreligion.com/articles/491

অপশন ০৪ : মহাবিশ্বকে এমন কেউ/কিছু সৃষ্টি করেছে যে/যা নিজে সৃষ্ট নয়

সুতরাং মহাবিশ্বের উৎপত্তির একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো এটি এমন কেউ সৃষ্টি করেছে যে নিজে সৃষ্ট নয়। সেই ফার্স্ট কজ, হলেন পরম স্রষ্টা, যিনি বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী। বিখ্যাত ইসলামি মনীষী শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি বলেন :

> "আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্ট জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে তিনি অনস্তিত্ব থেকে বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানে, কোনো উপাদান ছাড়াই শূন্যতা থেকে বস্তুতে পূর্ণতা দান করেছেন। সৃষ্টির আদি সম্পর্কে মহানবির (সঃ) কাছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন, আদিতে স্রষ্টাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না।"[২৫]

অপশন ৩ ভালোমতো না বোঝার কারণে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ প্রশ্ন করে, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? বড্ড হাস্যকর এই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন করেছেন রিচার্ড ডকিন্স, লরেন্স ক্রউস-সহ আরও অনেকে। তাদের এই প্রশ্ন সাধারণ পাঠকদের কাছে অবাক করার মতো হতে পারে, তবে দার্শনিকদের কাছে এটি শিশুসুলভ প্রশ্নের নামান্তর। ডকিন্সের লেখায় এমন প্রশ্ন পেয়ে খেদ উগড়ে দিয়েছেন নাস্তিক দার্শনিক মাইকেল রুজ। তা ছাড়া ডকিন্সের বেস্ট সেলিং বই *দ্য গড ডিল্যুশান*-এর নিম্নমান দেখে মাইকেল রুজ বেশ হতাশ ও লজ্জিত।[২৬] যদিও বঙ্গীয়-সহ আন্তর্জাতিক অনেক নাস্তিকের কাছে এই বই বাইবেলতুল্য!

যাই হোক, প্রশ্নটির অসারতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আবার চলুন দৃক গ্যালারিতে। এবার ছবি দেখতে এসেছে একজন ছোট্ট বাবু। আম্মুর হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে আর বড় বড় চোখে ছবি দেখে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ছবি তার ভালোলাগাতে সে আম্মুর হাত টান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আম্মুকে জিজ্ঞেস করল, আম্মু আম্মু, এই ছবিটা কে এঁকেছে? আম্মু হেসে বললেন, এই যে নিচে নাম আছে, অমুক এঁকেছেন বাবা; দাঁড়াও দেখি উনাকে পাই কি না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চিত্রশিল্পী আজ গ্যালারিতে উপস্থিত। তাকে খুঁজে পেয়ে বাচ্চাটির আম্মু তাকে বললেন, এই যে বাবা; ছবিটা ইনিই এঁকেছেন। বাচ্চাটি বড়বড় চোখে চিত্রকরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে উঠল, আম্মু আম্মু, উনাকে কে এঁকেছে?!

---

২৫. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; পৃ. ৫১ (ঢাকা: রশিদ বুক হাউজ, ৩য় প্রকাশ, মে ২০০৮)

২৬. Michael Ruse, Dawkins et al bring us into disrepute. The Gurdian, 2 Nov 2009

পাঠকবন্ধুগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন শিশুর প্রশ্নটা ঠিক হয়নি। কারণ অঙ্কিত হওয়া চিত্রকরের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং প্রশ্নটিই অ্যাবসার্ড। তেমনিভাবে সৃষ্ট হওয়া পরম স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়; কারণ আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য এমন কারণ দরকার, যে নিজে সৃষ্ট নয়। নয়তো, এ মহাবিশ্বের অস্তিত্বই থাকত না।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা মহাবিশ্বকে সূচনাকারী কারণের কিছু বৈশিষ্ট্য পেলাম—অসৃষ্ট, বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে, চিরন্তন (যেহেতু সময় সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং-এর পর)। আরেকটু চিন্তা করলে আমরা আরও যে বৈশিষ্ট্যগুলো পেতে পারি সেগুলো হলো একক-অদ্বিতীয়তা, জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি।[২৭] এসবই মূলত কোনও ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, সুতরাং আমরা যৌক্তিক চিন্তার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, মহাজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন।

কিন্তু কে সেই মহাস্রষ্টা? আল্লাহ, যিশু, ব্রহ্মা, জিউস, ইয়াহওয়েহ? মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও সহজাত অনুভূতি ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন সীমিত মানব মস্তিষ্কের দ্বারা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দরকার তাঁর পক্ষে থেকে এমন এক চিঠির যা তাঁর সম্পর্কে সঠিকতর ধারণা অর্জনে আমাদের পথ দেখাবে।

শেষ চিঠিটি

পৃথিবীর ইতিহাসে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলোর তালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রন্থটি হলো আল-কুরআন। [২৮] প্রায় ১৪৫০ বছর আগে ধূসর-কর্কশ মরুর বুকে বসবাসকারী যুদ্ধবাজ, বর্বর, স্বার্থপর, প্রাণপিপাসু, অশিক্ষিত মানুষদেরকে 'পড়া'-র আহ্বান দিয়ে এর যাত্রার শুভসূচনা ঘটে। তারপর এই গ্রন্থ ও একে বুকে ধারণকারী মানুষেরা সৃষ্টি করে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব, যার নজির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এক জ্বাজল্যময়ী সভ্যতা, মরুর বর্বরেরা হয়ে ওঠে নতুন দিনের বার্তাবাহক। মাত্র ২৩ বছরে এই গ্রন্থ বদলে দেয় মানব ইতিহাসের ধারা। পৃথিবীর

---

২৭. বিস্তারিত দেখুন : Hamza Andreas Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; p. 76-94

২৮. Oliver McAteer, The most popular book of all time isn't Harry Potter, it's the Koran. Metro, 15 Jul 2015

বুকে আর কোনও গ্রন্থ নেই যা এত বেশি সংখ্যক মানুষ মস্তিষ্কের নিউরনে ছেপে রেখেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, ছোট থেকে বড়, নারী বা পুরুষ, সাদা বা কালো; নিজের স্মৃতির খাতায় এই গ্রন্থকে যতনে লিখে রেখেছে। প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও এই গ্রন্থ পঠিত হচ্ছে। আমেরিকান সাহিত্যিক জেমস এ. মিশেনার বলেন :

> "পৃথিবীতে কুরআনই সম্ভবত একমাত্র গ্রন্থ যা সবচেয়ে বেশি পাঠ করা হয় এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক তা মুখস্থ রেখেছে... আকারে বাইবেলের নতুন নিয়মের মত তত দীর্ঘ নয়, অপূর্ব ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ কবিতা নয়, নয় কোনও সাধারণ গদ্য; অথচ শ্রোতার হৃদয়কে বিশ্বাসের ভাবাবেগে উদ্বেলিত করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এর।"[২৯]

মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র আল-কুরআন হলো পরম স্রষ্টা প্রেরিত আখেরি পয়গাম। এই বাণীকে তিনি একজন মনোনীত দূতের মাধ্যমে পুরো মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তবে ড. আজাদ এই ধারণায় সন্তুষ্ট নন। তিনি মনে করেন :

> "প্রতিটি ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অলৌকিক অবিশ্বাস্য প্রত্যাদেশের ওপর। প্রত্যাদেশ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী; প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতে হ'লে অস্বীকার করতে হয় প্রাকৃতিক নিয়মকে। যে-সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে ব'লে মনে করা হয়, হিউমের মতে সেগুলো ওই ব্যক্তিদের বোঝার ভুল মাত্র। তাঁর মতে ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী; ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অযৌক্তিক ভিত্তির ওপর।" [পৃ. ১১২]

অর্থাৎ, ড. আজাদ প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি মনে করেন তা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। এখানে ঝামেলা হলো দার্শনিক প্রকৃতিবাদ নামক অন্ধবিশ্বাসে দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকেই স্বয়ম্ভু ভেবে বসেছেন। তাই স্রষ্টাকেও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন মনে করতে চেয়েছেন; কিন্তু বাস্তবতা হলো স্রষ্টা হলেন প্রাকৃতিক নিয়মের নির্ধারক; তিনি নিয়মের অধীন নন, বরং নিয়মই তাঁর অধীন। তিনি চাইলেই সেই নিয়মকে বজায় রেখে বা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে প্রত্যাদেশ পাঠাতে পারেন, এটা তাঁর মর্জি। মূলত এদের সমস্যা হলো স্রষ্টার ধারণা নিয়ে, ইনারা যেহেতু স্রষ্টাতেই বিশ্বাস করতে নারাজ প্রত্যাদেশ তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

আল-কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন আরবি ভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষের

---

২৯. James A. Michener, Islam: The Misunderstood Religion; p. 70. The Reader's Digest, May 1955

শীর্ষে অবস্থান করছিল। আজকের ইন্টারনেটের যুগে বিনোদনের জন্য ফেইসবুক, ইউটিউব, টেলিভিশন প্রভৃতি হরেক রকম ব্যবস্থা আছে। (যদিও এগুলোতে অশ্লীল বিনোদনের প্রাচুর্যই বেশি)। কিন্তু ১৪৫০ বছর আগে শুকনো মরুর বুকে আমোদ যাপন, ফুর্তি ও বিনোদনের উপকরণ হিসেবে ছিল কবিতা ও সাহিত্য। আধুনিক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক ইবনে খালদুনের পর্যবেক্ষণ জানায়, আরবদের মাঝে প্রথমেই ছিল কবিতার স্থান। তাদের কাব্যসম্ভার তাদের ইতিহাস ও বিচক্ষণতার ভান্ডার এবং তাদের দুঃখ-বেদনার গাঁথা হয়ে উঠেছিল। এতে যেমন ছিল অর্থের যথার্থতা, তেমনি ছিল অভিনব আঙ্গিক।[৩০] প্রাচ্যবিদ বসওয়ার্থ স্মিথের কলমে বিষয়টি আরেকটু খোলাসা হয়ে ওঠে :

> "আরবরা যেমন যুদ্ধ ও লুঠতরাজ পছন্দ করত, তেমনিভাবে মনেপ্রাণে কবিতার অনুরাগী ছিল তারা । গোত্র-স্বাতন্ত্র্যের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয়তাবোধ চাঙা রাখা, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়া ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গ্রীকদের কাছে অলিম্পিকের যে ভূমিকা ছিল; আরবদের নিকট ওকাজ ও মুজান্নায় অনুষ্ঠিত মেলার প্রভাব ছিল একই রকম । এখানে এসে বিভিন্ন গোত্র নিজেদের মধ্যকার ঝগড়াবিবাদ মিমাংসা করত, যুদ্ধবন্দী বিনিময় করত; এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-কাজটা করত তা হলো বিনা প্রস্তুতিতে কবিতা প্রতিযোগিতায় নামা। এমনকি জাহিলিয়াতের সময়েও প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব রাজকবি ছিল; এবং সবচেয়ে কুশলী ও সেরা কবির কাব্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হতো বা কা'বায় প্রবেশের দরজায় প্রদর্শনীর জন্য ঝুলিয়ে রাখা হতো, যেন পবিত্র ভূমিতে আগত তীর্থযাত্রীরা সবাই সেই কবিতা পড়ার সুযোগ পায় ।"[৩১]

জার্মান প্রাচ্যবিদ নাভিদ কারমানি আরবের কবিতা সম্পর্কে বলেন :

> "প্রাচীন আরবি কবিতার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল একটি ব্যাপার । শব্দভান্ডার, ব্যাকরণগত ঝাঁজ এবং কঠোর কাব্যিক রীতি—এসব জ্ঞান বংশ পরম্পরায় চলত। এদের মাঝে কেবল সবচেয়ে গুণী শিক্ষার্থীই ভাষার অলঙ্কার পুরোপুরি রপ্ত করতে পারত। 'কবি' উপাধি ধারণ করতে হলে কাউকে বছরের-পর-বছর অধ্যয়ন করতে হতো । এমনকি কখনও কখনও কোনও কবিগুরুর শিক্ষানবিশ হিসাবে কয়েক দশকও কাটাতে হতো । মুহাম্মদ এমন এক দুনিয়ায় বড় হয়েছিলেন যখন

৩০. ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা; খণ্ড ২, পৃ. ৯২ (বঙ্গানুবাদ; ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

৩১. Bosworth Smith, Mohammad and Mohammedanism; p. 66-67 (London: Smith, Elder, & Co..1874)

কাব্যিক অভিব্যক্তিকে অনেকটা ধর্মীয় বিষয়ের মতো সম্মান করা হতো।"[৩২]

কবিরাই ছিল কোনও গোত্রের মুখ্য মুখপাত্র।[৩৩] তাই দেখা যেত, বহু বছরের সাধনার পর যখন এমন একজন কবির উত্থান হতো তখন শুরু হতো উদ্‌যাপনের পালা। অন্য গোত্র থেকেও লোকজন এসে সম্ভাষণ জানাত, খানাপিনা চলত ধুমসে, মেয়েরা বাঁশি নিয়ে হাজির হতো আনন্দে মেতে উঠতে। আরবেরা একে অন্যকে সম্ভাষণ জানাত কেবল দুই ক্ষেত্রে—সন্তান জন্মালে আর কবির উত্থান হলে! [৩৪] ভাষার অলংকার, কাব্যের ঝংকারে তারা এতটাই গর্ববোধ করত যে অনারবদের তারা তুচ্ছ করে *আজমি* বলে ডাকত।

এমন কাব্য-সাহিত্য অনুরাগী সমাজে আল-কুরআনের আগমনে এক আলোড়ন বয়ে যায়। কাব্যে অভিজ্ঞতাহীন একজন আরবের মুখ থেকে এমন শব্দের ঝংকার আসতে থাকে যা কাঁপিয়ে দেয় বংশানুক্রমে পাওয়া সাহিত্যের গৌরবের ভিত। পাশাপাশি সে সকল শব্দে তাদের চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, এর সমতুল্য কিছু রচনা করে আনার।[৩৫] এই চ্যালেঞ্জের স্বরূপ বোঝা জরুরি। কারণ, অনেক অজ্ঞ-অপরিপক্ক নাস্তিককে দেখা যায় আরবি, ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় কোনওরকমে কিছু রচনা করে ভেবে বসে, আল-কুরআনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি! কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

এই চ্যালেঞ্জের স্বরূপটা বোঝার জন্য যে শর্তগুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো—কাব্য বা সাহিত্যে কোনওরূপ পূর্ব-অভিজ্ঞতাহীন ও লিখতে-পড়তে না-পারা একজন মানুষের মুখ থেকে আসা এমন কথামালা যা সে সময়ে প্রচলিত সকল সাহিত্যের ধাঁচ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, যা একবার মুখ থেকে বের হওয়া পর কোনও সংশোধনের সুযোগ নেই; যার বিষয়বস্তু প্রচলিত সাহিত্যের থেকে ভিন্ন ধারার, যাতে ঐ ব্যক্তিটির নিজস্ব চিন্তা বা ব্যক্তিত্বের কোনও প্রভাব থাকবে না, যাতে থাকবে অতীতে এমন কোনও ঘটনা যা মানবের পক্ষে তখন জানা অসম্ভব ছিল, থাকবে ভবিষ্যদ্‌বাণী যা মিলে যাবে হুবহু, যেটি এমন এক বিপ্লবের জন্ম দিবে যা থেকে প্রস্ফুটিত হবে নতুন এক সভ্যতা, ন্যায়ভিত্তিক শাসন, জ্ঞানবিজ্ঞানের ফল্গুধারা, যা

---

৩২. Navid Kermani, Poetry and Language. In: Andrew Rippin (ed.), The Blackwell Companion to the Qur'an; p. 108 (Oxford: Blackwell Publishing, 2006)

৩৩. সফিউর রহমান মোবারকপুরি, আর-রাহীকুল মাখতুম; পৃ. ৫৪ (ঢাকা, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৩)

৩৪. Ibn Rasheeq quoted in Abu Zakariya, The Eternal Challenge: A Journey Through The Miraculous Quran; p. 95

৩৫. সূরা হুদ ১১:১৩, বাকারা ২:২৩, ইউনুস ১০:৩৮

বদলে দিবে মানব ইতিহাসের মোড়, বদলে দিবে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত, গড়ে তুলবে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব; যা মনে রাখা খুবই সহজ, যা প্রতি ক্ষণে পঠিত হতে থাকবে!

পাঠক হয়তো ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছেন এ কাজ অসম্ভব। তবুও বিস্তারিত আলোচনার খাতিরে আল-কুরআনের রচয়িতা কে সে সম্পর্কে চারটি সম্ভাবনা দাঁড় করানো যায় :

১. এটি কোনও আরব রচনা করেছে

২. এটি কোনও অনারব রচনা করেছে

৩. এটি মুহাম্মাদ (ﷺ) রচনা করেছেন

৪. এটি মানুষের রচনা নয় বরং আল্লাহর বাণী

অপশন ০১ : এটি কোনও আরব রচনা করেছে

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি আল-কুরআনের রচনা ধারা স্বতন্ত্র্য, তৎকালীন কবিদের মাঝে প্রচলিত সাহিত্য-ধারা কোনওটির সাথে পুরোপুরি মিলে না। গিফার গোত্রের কবি উনায়েস আল গিফারি স্বীকার করেছিলেন :

> "আমি অনেক গণকের কথা শুনেছি; কিন্তু ওই ব্যক্তির (মুহাম্মাদ) কথা গণকের মতো নয়। আমি তাঁর বাক্যকে কবিদের রচনার সাথে তুলনা করে দেখেছি; কিন্তু কোনও কবির ভাষার সাথে তার কোন মিল নেই।"[৩৬]

প্রাচ্যবিদদের থেকেও এই বাস্তবতার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। অধ্যাপক মার্টিন জ্যামিট বলেন :

> "যদিও প্রাক-ইসলামিক যুগের কিছু দীর্ঘ কবিতা (কাসিদা) সাহিত্যের স্বাদে চমৎকার ছিল, কিন্তু সে তুলনায় আল-কুরআন নিঃসন্দেহে স্বীয় উচ্চতায় মহীয়ান; আরবি ভাষার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এর স্থান সবার ওপরে।" [৩৭]

---

৩৬. মুসলিম, আস-সহীহ; খণ্ড ০৬, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬১৩৫ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, জুন ২০১০)

৩৭. Martin R. Zammit, A Comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic; p. 37. In: Handbook Of Oriental Studies, Section: 01, Vol. 61 (Leiden: Brill, 2002)

তৎকালীন আরবেরা নানাভাবে নবিকে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রথমে তাঁকে কবি বলে প্রচার করা শুরু করল।[৩৮] পরে দেখল এ ভিত্তিহীন দাবি দিয়ে বেশি দূর আগানো যাবে না, তখন বলা শুরু করল সে রাতভর অন্য কারও থেকে শিখে সকালে জনসম্মুখে আবৃত্তি করে, সে গণক, যাদুকর, অমুকতমুক। আল-কুরআন যদি কোনও আরব রচনা করেই থাকে তা হলে অন্য মানুষের পক্ষে তার সমতুল্য কিছু রচনা করতে পারার কথা। কারণ আরবি ভাষার ২৮ টি বর্ণ আর ব্যকরণের নির্দিষ্ট রীতিতে রচিত কোনও মানব অভিব্যক্তি অন্য মানুষের পক্ষে রচনা করা অসম্ভব নয়।

যেমন ধরুন আল মুতানাব্বির কথা, এককালের অসাধারণ প্রতিভাবান কবি, ভাবা হতো তাঁর কবিতা কারও পক্ষে নকল করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরে দেখা গেল তার রচনার ধাঁচও নকল করা গেছে, ইয়াহূদি কবি মূসা ইবন ইজরা ও সুলাইমান ইবনে জিবরীল তা করেছিলেন। আর স্পেনের কবি ইবন হানিকে তো পশ্চিমের মুতানাব্বি বলা হতো।[৩৯] মজার ব্যাপার হলো, মুতানাব্বি নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি সাহিত্য ধার করেছিলেন আরেক বিখ্যাত কবি আবূ নুয়াস থেকে![৪০] একইভাবে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ারের সনেটের ধাঁচের সাথে ক্রিস্টফার মারলো'র লেখার মিল পাওয়া যায়। তা ছাড়া সমসাময়িক ফ্রান্সিস বিউমন্ট, জন ফ্লেচার প্রমুখ নাট্যকারের সাথেও শেক্সপিয়রের কাজের তুলনা করা হতো।

কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, তৎকালীন কোনও মাহের কবির পক্ষেও আল-কুরআনের সমতুল্য কিছু রচনা করা সম্ভব হয়নি। নেপলস ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর, ইতালীয় প্রাচ্যবিদ ড. লরা এই বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন :

> "যদিও ইসলামের প্রতিপক্ষদেরকে মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হয়েছিল, কুরআনের সমতুল্য কোনও কিতাব বা অন্তত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসার ... এবং যদিও সে সময় আরবদের মাঝে অসাধারণ বাগ্মিতায় ভাবপ্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল অনেকের; কিন্তু কেউ আল-কুরআনের সাথে একই কাতারে দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে এমন কিছু রচনা করতে পারেনি। তারা নবির সাথে

---

৩৮. সূরা আম্বিয়া ২১:৫, তূর ৫২:৩০

৩৯. Geert Jan Van Gelder, Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature Anthology; p. 31-33 (New York: New York University Press, 2013)

৪০. S. A. Bonebakker, Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch; p.47 (Oxford: North-Holland Publishing Company, 1984), বিস্তারিত দেখুন: Hamza Andreas Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism; p. 224-225

সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু আল-কুরআনের চরম উৎকর্ষের সাথে পাল্লা দিতে পারেনি।"[৪১]

দর্শনের অধ্যাপক ড. অলিভার লিয়েম্যান বলেন :

"আল-কুরআনের আয়াতগুলো স্বীয় অনন্যতা ও মাধুর্যের পরিচয় বহন করে, এর অভিনবত্ব ও মৌলিকতার কথা নাহয় নাই বললাম। এর দ্বারা এটি স্বীয় সত্য গ্রহণের ব্যাপারে অসংখ্য মানুষকে সম্মত করাতে সফল হয়েছিল। এটি না কিছুর অনুকরণ করে, আর নাই-বা এর অনুকরণ সম্ভব। দীর্ঘকাল গবেষণার পরও এর রচনাশৈলী ম্লান হয় না এবং কালক্রমে এর সজীবতাও থাকে অক্ষত।"[৪২]

ইতিহাস বিচারে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আল-কুরআনের সমতুল্য কিছু রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জে মুহাম্মাদ (ﷺ) জয়ী হয়েছিলেন। তা নাহলে ইসলামের এত দ্রুত প্রসার ও আমূল সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হতো না। নাভিদ কারমানি বলেন :

"নিঃসন্দেহে নবি মুহাম্মাদ কবিদের সাথে এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছিলেন। তা নাহলে ইসলাম এমন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ত না।"[৪৩]

অপশন ০২ : এটি কোনও অনারব রচনা করেছে

কোনও অনারবকে আগে আরবি ভাষার জটিল কলা, অলংকার, প্রকাশভঙ্গি রপ্ত করতে হবে কুরআন রচনা করার জন্য। আমরা আগেই দেখেছি আরবেরা অনারবদের আজমি বলে তাচ্ছিল্য করত, অর্থাৎ তাদের বাচনভঙ্গির অস্পষ্ট মনে করত। তারপরও যদি কোনও অনারব ব্যক্তি পুরোপুরি আরবি ভাষা শিখে নেয় এবং আরবের ন্যায় স্পষ্টভাষি হয়েও যায় তাতেও ফায়দা নেই। কারণ আমরা দেখেছি কোনও অলংকার ও বাগ্মীতায় পটু আরবের পক্ষে আল-কুরআনের সমতুল্য কিছু রচনা করা সম্ভব

---

৪১. Dr. L. V. Vaglieri, An Interpretation of Islam; p. 43 (GoodWord Books, 2004)। আরও দেখুন: F.F. Arbuthnot, The Construction of the Bibel & the Koran; p. 5 (London, 1985);

৪২. Oliver Leaman, The Qur'an: An Encyclopedia; p. 404 (Taylor & Francis, 2006)

৪৩. Navid Kermani, Poetry and Language. In: Andrew Rippin (ed.), The Blackwell Companion to the Qur'an; p. 110

হয়নি; তাই তার পক্ষেও সম্ভব হতো না।

তা ছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে বিদেশি ব্যক্তি যদি স্বদেশি ব্যক্তির ন্যায় স্বদেশির মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করেও ফেলে তারপরও তাদের প্রকাশভঙ্গির মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েই যায়।[৪৪] ইংরেজভাষীদের নিয়ে পরিচালিত আরেক গবেষণায় জানা যায়, যাদের পিতামাতা উভয়েই স্বদেশি তাদের সাথে তুলনা করলে যাদের পিতামাতার মাঝে একজন বিদেশি, তাদের ভাষাদক্ষতা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বেশ নিম্নমানের হয়।[৪৫] কোনও অনারব আল-কুরআন রচনা করেছে এমন সম্ভাবনা এতটাই দূরের এ প্রাচ্যবিদেরা তাদের বস্তুবাদী তত্ত্বে কোনও অনারবকে আল-কুরআনের রচয়িতার স্থানে দাঁড় করাননি।

অপশন ০৩ : এটি মুহাম্মাদ (ﷺ) রচনা করেছেন

প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ বলতে চান আল-কুরআন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রচনা। কেউ বলেছেন তিনি হয়তো ব্যতিক্রমী মেধাসম্পন্ন কেউ ছিলেন, যিনি এই সাহিত্যের মাস্টারপিস রচনা করতে পেরেছিলেন।[৪৬] কিন্তু গভীর চিন্তা করলে তাদের এই বক্তব্যও ধোপে টিকে না। কারণ, প্রথমত মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজেও একজন আরব ছিলেন। আমরা দেখেছি তৎকালীন কোনও আরবের পক্ষে এর সমকক্ষ কিছু রচনা সম্ভব হয়নি, যদি মানবের রচনাই হতো তবে এর সমকক্ষ কিছু রচনা অসম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজে কবিতা চর্চায় অংশ নিয়েছেন এমন কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না, বরং উল্টোটাই মেলে। জার্মান প্রাচ্যবিদ নাভিদ কারমানি লিখেন :

> "তিনি যখন জনসম্মুখে আল-কুরআনের আয়াতগুলো আবৃত্তি শুরু করেন, তার আগে কাব্যের জটিল শিল্প তিনি অধ্যয়ন করেননি।... তারপরও মুহাম্মাদের

৪৪. K. Hyltenstam & N. Abrahamsson, Who can become native like in a second language? All, some, or none? Studia Linguistica, Vol. 54, Issue 2, p. 150–166 (August 2000)

৪৫. Diana Van Lancker Sidtis, Auditory Recognition Of Idioms By Native And Non-native Speakers Of English: It Takes One To Know One. Applied Psycholinguistics, Vol. 24, Issue 01, p. 45–57 (March 2003)

৪৬. যেমন এ. স্প্রেঙ্গার, উইলিয়াম ম্যুর, থিওডোর নোলডেকে, ইগনায গোল্ডজিহার, ডাব্লিউ. ওয়েলহাওসেন, লিওনে কাইতানি, ডেভিড এস. মারগোলিথ প্রমুখ। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি ও নিরপেক্ষতার আবরণে মোড়া তাদের ভুলমতের খণ্ডনে প্রমাণ ভিত্তিক উত্তরের জন্য পড়ুন: Muhammad Mohar Ali, The Qur'ân and The Orientalists (Ipswich, Jam'iyat 'Ihyaa' Minhaaj Al-Sunnah, 1st edition, 2004)

আবৃত্তি তৎকালীন কবিতা, গণকদের ছন্দবদ্ধ গদ্য বা অন্য কোনও অনুপ্রাণিত ছন্দবদ্ধ বুলির চেয়ে ভিন্নতর ছি।" [২৪]

মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রত্যাদেশ পেতে শুরু করেন ৪০ বছর বয়স থেকে। এ ঘটনার আগে তিনি যাদের মাঝে জীবন কাটিয়েছিলেন তারা তাঁর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে ভালোমতোই অবগত ছিলেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ধরন বিশ্লেষণ করলে আল-কুরআনের ভাষার সাথে তফাৎ সহজেই ধরা পড়ে, সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আল-কুরআনের ভাষার ধারেকাছেও নেই তাঁর বাচনভঙ্গি। যারা দাবি করতে চান আল-কুরআন মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রচনা তাদের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন দাবিতে বিরক্ত হয়ে প্রাচ্যবিদ ড. লরা বলেন :

"এ অসাধারণ গ্রন্থটি (কুরআন) কীভাবে মুহাম্মাদের রচনা হতে পারে? যে নিরক্ষর আরব ব্যক্তিটি সারাজীবনে দুটি বা তিনটির বেশি চরণ রচনা করেননি। তাও আবার কাব্যিক প্রতিভার স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নয়; যেমন-

আমিই নবি, মিছে নয় কিছুমাত্র
আমি আব্দুল মুত্তালিবের দৌহিত্র।" [৪৭]

সাম্প্রতিক সময়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *পিয়ার রিভিউড* জার্নাল পেপারে একটি চাঞ্চল্যকর গবেষণা প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় পবিত্র কুরআন ও সহীহ বুখারির ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। ১ম পদ্ধতিতে উভয় গ্রন্থকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে নয় রকম পরীক্ষা চালানো হয়, ২য় পদ্ধতিতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা চালানো হয় *স্টাইলোমেট্রি*'-র পরিসংখ্যান ব্যবহার করে, আর তৃতীয় পদ্ধতিতে আরও দুটি পরীক্ষা চালানো হয় *স্টেট অব দ্য আর্ট টেকনিক* কাজে খাটিয়ে। এর ফলাফল জানায় আল কুরআন আর সহীহ বুখারি যা কিনা নবির মানবীয়-ভাষ্যের সংকলন, তা অবশ্যই ভিন্ন উৎসের! অর্থাৎ আল-কুরআনের রচয়িতা মুহাম্মাদ (ﷺ) হতে পারেন না।[৪৮]

ইসলামের সমালোচক আলি দাশ্‌তি স্বীকার করেছেন :

"কোরানের প্রতি সুবিচার করলে স্বীকার করতে হবে এটা অবশ্যই বিস্ময়কর।

---

৪৭. Dr. L. V. Vaglieri, An Interpretation of Islam; p. 43

৪৮. Halim Sayoud, Author Discrimination Between The Holy Quran And Prophet's Statements; Literary and Lingustic Computing, Vol. 27, No. 4, p. 427-444 (May 2012)

মক্কায় নাজিলকৃত অপেক্ষাকৃত ছোট সুরাগুলোর কাব্যিক ভাব ব্যক্ত করার জাদুকরি ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই সাথে বিশ্বাসের প্রেরণাদায়ক। সুরায় ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর কোনও নজির আরবি ভাষায় এর পূর্বে দেখা যায়নি। একজন মানুষ যিনি কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, তার মুখ থেকে ভাবের এমন বহিঃপ্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে, কোরানকে অলৌকিক হিসেবে গণ্য করা সমর্থনযোগ্য।"[৪৯]

অপশন ০৪ : এটি মানুষের রচনা নয় বরং আল্লাহর বাণী

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম আল-কুরআন এর রচয়িতা হিসেবে আরব, অনারব বা মুহাম্মাদ (ﷺ) কেউই টিকছেন না। তাই সামগ্রিক দিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এর রচয়িতা এমন কারও যে মানবের ঊর্ধ্বে। আল-কুরআনে এই সত্তা নিজের পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ্ বলে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিধানদাতা। তাই আল-কুরআনের রচয়িতা মহান আল্লাহ্ এটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, মক্কার মুশরিকেরা যখন কোনও অলৌকিক প্রমাণ দাবি করত, যেমন : মরুভূমি সবুজ-শ্যামল করে দাও, আকাশ থেকে ফেরেশতা নামিয়ে দেখাও, আকাশ থেকে প্রস্তরবৃষ্টি ঘটিয়ে দেখাও ইত্যাদি ইত্যাদি; প্রত্যুত্তরে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল-কুরআনকে পেশ করতেন। এর অলৌকিক গঠনবিন্যাস, অপ্রথাগত সৌন্দর্য ও ঐশ্বরিক বার্তাকে বারংবার তুলে ধরতেন। পল কাসানোভা বলেন :

> "স্বীয় মিশনের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মুহাম্মদের কাছে যখন অলৌকিক কিছু করে দেখানোর দাবি জানানো হতো, তিনি তখন আল-কুরআনের রচনাশৈলী ও এর অতুলনীয় উৎকর্ষকে কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। সত্যি বলতে কী, এমনকি অমুসলিমদের জন্যও কুরআনের ভাষা এক বিস্ময়, যাতে রয়েছে অনুধাবনের প্রাচুর্য ও হরণকারী গাম্ভীর্য... চরম শত্রু কিংবা চরম সংশয়বাদীদেরও ইসলামের ছায়াতলে আনতে কুরআনের পদাংশের প্রশস্ততার সাথে জুড়ে থাকা জাঁকালো গাম্ভীর্য ও অসাধারণ ছন্দ অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।"[৫০]

---

৪৯. আলি দস্তি, নবী মুহাম্মদের ২৩ বছর; পৃ. ৫৬ (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

৫০. Paul Casanova, "L'Enseignement de l'Arabe au College de France" (The Arab Teaching at the College of France), Lecon d'overture, 26 April 1909

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন মুসলিম আল-কুরআনকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশরূপে গ্রহণ করেন—তা কেবলই অন্ধবিশ্বাস নয়। বরং আল-কুরআনেই মানুষকে চিন্তার এমন খোরাক উপহার দেওয়া হয়েছে যাতে করে সে এর ঐশ্বরিক উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

এখন কেউ হয়তো বলে বসতে পারেন, আচ্ছা না হয় মানলাম যে, আল-কুরআন স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু এখনকার কুরআন যে ওই নাযীলকৃত কুরআন তার প্রমাণ কী? দীর্ঘ ১৪৫০ বছর পরও তা অবিকৃত থাকবে এটা কি সম্ভব? ড. আজাদও অনেকটা এমনই বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেন :

> "... যদি ধ'রেও নিই যে প্রত্যাদেশ সত্যি ঘটনা, বিধাতা সত্যিই দেখা দিয়েছেন কারো কাছে... বা দেবদূত বিধাতার বাণী পৌঁছে দিয়েছে কারো কাছে, তা হলে ওই প্রত্যাদেশ শুধু তারই জন্যে প্রত্যাদেশ, অন্যদের জন্যে নয় । সে যখন তা অন্য কাউকে বলে, অন্যজন যখন তা বলে আরেকজনকে, এবং সে যখন তা বলে আরেকজনকে, তখন তা তাদের জন্যে প্রত্যাদেশ থাকে না, তা হয় শোনাকথা।" [পৃ. ৯৯]

অর্থাৎ, প্রত্যাদেশ মৌখিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রচারের দ্বারা ক্রমান্বয়ে তা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পবিত্র কুরআন লৈখিক পদ্ধতির পাশাপাশি এক অভিনব পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছে, যাকে বলা হয় মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরা। মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরা বলতে বোঝায়—কোনও বিষয় বিভিন্ন প্রজন্মে (যুগে) অসংখ্য মানুষ স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যারা একে অপরের সাক্ষাৎ পাননি; এবং এসকল বর্ণনাও অভিন্ন। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সম্মিলিতভাবে ভুল করা বা মিথ্যা রচনা করা সম্ভব নয়। তাই এমন তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। [৫১] ডেভিড হিউমের মতেও এমন বর্ণনাকে বর্তমান দার্শনিকরা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করবেন। [৫২]

---

৫১. A.A. Yasir Qadhi, An Introduction to the Sciences of the Qur'aan; p. 29 (Birmingham UK, Al-Hidaayah Publishing and Distribution, 1st edition 1999)

৫২. "... তাই, যদি সকল ভাষার লেখকগণ একমত হন যে ১৬০০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে আট দিন সারা পৃথিবী পুরোপুরি অন্ধকারে ঢেকে ছিল, যদি এই বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা মানুষের মাঝে আজও স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত যে সকল ভ্রমণকারী যারা বিদেশ থেকে ফিরেছেন তারাও একই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সামান্যতম পরিবর্তন বা অসংগতি ছাড়াই, এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বর্তমান দার্শনিকগণ এই বর্ণনাকে সন্দেহের বদলে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করবেন এবং এর উৎসের কারণ অনুসন্ধান করবেন ... ", দেখুন : David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding; Sec. 1/99, p. 88-89

তা ছাড়া প্রাচ্যবিদদের স্বীকৃতিতেও আল-কুরআনের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মুর (দু শ বছর আগেই) বলেছেন,

"উসমানের আমলে সংরক্ষিত গ্রন্থটি আমাদের হাতে পৌঁছেছে অবিকৃত অবস্থায়।... পৃথিবীতে সম্ভবত এরকম আর একটি গ্রন্থও নেই যা দীর্ঘ বারো শ বছর ধরে বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত রয়েছে।" [৫৩]

এডিয়ান ব্রকেটের গবেষণায় জানা যায় :

"মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যুগ যুগ ধরে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে কুরআন হস্তান্তরের ফলে এর আঙ্গিক বা গঠনগত কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কুরআন অভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান, কোনও ধরণের রদবদল কখনও এতে প্রবেশ করেনি কিংবা কোনও অংশ এ থেকে হারিয়েও যায়নি। প্রথমদিকের খলিফাদের সময়েও একই কথা প্রযোজ্য।... কুরআনের সংরক্ষণ যেমন মৌখিকভাবে হয়েছিল, তেমনিভাবে হয়েছিল লেখনীর মাধ্যমে।" [৫৪]

ড. লরা বলেন :

"ইসলামের বিস্ময়কর দিকের এক উৎকৃষ্ট নমুনা হলো আল-কুরআন; যা এক পরম নিশ্চিত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের অবগত করে, এক নিয়ত ও অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে।... কুরআনের আসমানি উৎস সম্পর্কে আরেকটি প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। এটি মানবের কাছে অর্পণের দিন থেকে বহু শতাব্দী পার হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তীত আছে ... " [৫৫]

---

৫৩. Sir W. Muir, The Life Of Mohammad; p. xiv-xv (London : Smith, Elder & Co., 1858)

৫৪. Adian Brockett, Value of the Hafs and Warsh Transmissions, in : Andrew Rippin (Editor), Approaches to the History of the Interpretation of the Quran; p. 44-45 (New York : Clarendon Press, 1988)

৫৫. Dr. L. V. Vaglieri, An Interpretation of Islam; p. 42 - 44; আল-কুরআন সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে আরও প্রাচ্যবিদদের স্বীকারোক্তি দেখুন : A.J. Arberry, The Koran Interpreted; (Introduction) p. xxii - xxiii (London, Oxford University press, 1964); F.F. Arbuthnot, The Construction of the Bibel & the Koran; p. 5 (London, 1885); H.A.R. Gibb, Mohammedanism A Historical Survey, p. 50 (New York, Oxford University press, 2nd Edition, 1962); ; Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an; p. 26 (London, George Allen & Unwin, 1973); Schwally, Geschichte des Qorans; vol. 2, p. 120 (Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1909-1938); John Burton, The Collection of the Qur'ān; p. 171, 239-240 (New York, Cambridge University Press, 1977)

তাই বোঝা যাচ্ছে, ড. আজাদের উক্ত অভিযোগও আল-কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আলোচনার এই অল্প পরিসরে আল-কুরআনের আরও অনেক দিক নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। আগ্রহী পাঠকগণ ড. লরেন্স ব্রাউন রচিত *স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ আল-কুরআন*, এবং আবু জাকারিয়া রচিত *The Eternal Challenge : A Journey Through The Miraculous Quran* বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

মরুর ফুল

আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে আরবের ধূসর মরুর বুকে এক মশাল জ্বলে ওঠে; যার আলো পূর্ব থেকে পশ্চিমকে আলোকিত করে, মানব ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। কোনও ইউনিভার্সিটি পাশ করা মানুষ নয়, বরং একজন উম্মী মানুষের হাত ধরে এমন বিপ্লব হয়েছিল যা মাত্র ২৩ বছরে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বদলে দিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও বিপ্লব নেই যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে এত অল্প সময়ে বদলে দিতে পেরেছে; অন্য সকল বিপ্লব ছিল হয় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক। পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষ ছাপিয়ে যিনি মানব জাতির সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন, সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ)। দার্শনিক অধ্যাপক রামকৃষ্ণ রাও লিখেন :

> "পয়গম্বর মুহাম্মদ এর আগমনের উষালগ্নে আরব একটা ধূ-ধূ মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর অমিত আধ্যাত্মিকতার বলে এই প্রাণহীন উষর মরুভূমি পরিণত হলো এক নতুন পৃথিবীতে-জন্ম হলো এক নতুন জীবনের, এক নতুন সংস্কৃতির, এক অভিনব সভ্যতার ও এক সুপরিপক্ক রাষ্ট্রব্যবস্থার। এই সুবিশাল সমাজ-সভ্যতা কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল মরক্কো থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং যার অত্যাশ্চর্য প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মতো তিনটি মহাদেশের প্রত্যন্ত জনপদে। এইভাবে ইসলাম এই তিনটি জনবহুল মহাদেশের অগণিত জনগণের চিন্তা ও ভাবধারাকে প্লাবিত করেছিল।" [৫৬]

৫৬. কে. এস. রামকৃষ্ণ রাও, মুহাম্মদ ইসলামের বার্তাবাহক; পৃ. ০৫ (বঙ্গানুবাদ, কলকাতা : বাংলা ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, ৯ম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৬)

ইসলামের কঠোর সমালোচক বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলস লিখেন :

"... এ পৃথিবীর বুকে সততা ও ন্যায়বিচারের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মুসলিমরা উদারতার চেতনা সঞ্চারিত করেছিল বিশ্বজুড়ে। তারা এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছিল যা আগের যে-কোনও সমাজে দৃষ্ট ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্ত ছিল।... সহজ ও বোধগম্য 'ইসলাম' ধর্ম মহানুভবতা, ঔদার্য ও ভ্রাতৃত্বের চেতনায় পরিপূর্ণ; এ ধর্ম মরুভূমির বীরত্বের উদ্দীপনায় ভরপুর, সেই সাথে সাধারণ মানুষের সহজাত চিন্তাধারার আবেদন সৃষ্টি করতেও পুরোপুরি সক্ষম। এর বিরুদ্ধে একাট্টা হয়েছিল—সংকীর্ণমনা ইয়াহূদিধর্ম, যা 'সৃষ্টিকর্তাকে' নিজ জাতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে; খ্রিষ্টধর্ম, যেখানে ত্রিত্ববাদ-সহ নানান রকম বিশ্বাস প্রচার করা হয়, যার মাথামুণ্ডু উদ্ধার করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে; পার্সী পুরোহিতদের অনুসৃত (অগ্নিউপাসনা বা) পার্সীধর্ম, যারা মনির ক্রুশবিদ্ধকে অনুপ্রাণিত করেছিল ইত্যাদি।

ইসলামের চ্যালেঞ্জ যাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল তারা মোটেই মাথা ঘামায়নি যে, মুহাম্মদ কামুক ছিলেন কি না কিংবা তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়ে সন্দেহ উদ্রেককারী কোনও কাজ করেছেন কি না। ইসলামের যে বিষয়টি তাদের মধ্যে প্রধান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হলো—তাদের অন্তরাত্মায় গ্রথিত স্রষ্টার চিরন্তন ভাবমর্যাদার সাথে তারা মুহাম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণময় আল্লাহর বর্ণনা ও গুণাবলীর আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পেয়েছিল। যার ফলে অনিশ্চয়তা, প্রতারণা ও অসহনীয় বিভেদপূর্ণ পৃথিবীতে মুহাম্মদের প্রচারিত বিশ্বাস খুব অল্প সময়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে বিশ্বাসীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিল। তাঁর প্রচারিত শিক্ষা এ পৃথিবীর বুকে এমন স্বর্গ রচনা করেছিল যা কেবল সাধু-সন্ন্যাসী, পুরোহিত আর অভিষিক্ত রাজন্যের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বরং বোঝা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণেরও ছিল তাতে সমান অধিকার। এতকাল এমনই একটি ধর্মের প্রতীক্ষায় যেন তাদের অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল। কোনও রকম রহস্যময়তা, প্রতীকবাদ, ক্ষীণালোক পূজার বেদী কিংবা পুরোহিতের কীর্তন ছাড়াই স্বচ্ছ, সহজ ও আবেদনময় বিশ্বাস ও মতবাদ দিয়ে মুহাম্মদ বিশ্বহৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলেন।"[৫৭]

বিশ্বমননকে নাড়া দেওয়ার এই সংগ্রাম ১৪৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) নামের এক আরব ব্যক্তির একটি দাবি উত্থাপনের

৫৭. H.G. Wells, The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind; p. 580-582 (London, The Waverley Book Company, Limited, 1921)

মাধ্যমে। তিনি ঘোষণা করেন :

অর্থাৎ আল্লাহ (ﷻ) ব্যতীত সত্য কোনও উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর একজন গোলাম ও বার্তাবাহক। উনার এই দাবি সম্পর্কে তিনটি অপশন বিবেচনা করা যায় :

১. তিনি মিথ্যে বলেছেন

২. তিনি ডিলিউডেড/বিভ্রান্ত ছিলেন

৩. তিনি সত্য বলেছেন

অপশন ০১ : তিনি মিথ্যে বলেছেন

কেউ যদি বলতে চান মুহাম্মাদ (ﷺ) মিথ্যে বলেছেন তা হলে সেই মিথ্যার পিছনে কারণও খুঁজতে হবে। মিথ্যে বলার পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে—

ক. দুনিয়া প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্মান, সম্পদ, নারী, ক্ষমতা পাওয়ার ইচ্ছা
খ. সমাজ পুনর্গঠন

এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে মুহাম্মাদ (ﷺ) তৎকালীন সমাজে সৎ, নিষ্ঠাবান, সম্মানিত ও বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বস্ত), আস-সাদিক (সত্যবাদী) নামে আখ্যায়িত করত। বিভিন্ন সামাজিক বিরোধিতায় তাঁর মধ্যস্ততা মেনে নিত।[৫৮] এমন বিশ্বস্ত মানুষ মিথ্যে বলবেন

৫৮. ইবনে হিশাম, সীরাতুন নবি ﷺ; খণ্ড ০১, পৃ. ১৮৪-১৮৫ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ২০০৮); আরও দেখুন : T. P. Hugens, A Dictionary of Islam; p. 369 (London, W. H. Allen & CO., 1885)

দুনিয়াবি প্রাপ্তির জন্য তা মেনে নেওয়া বিভিন্ন কারণে অযৌক্তিক। উনি তৎকালীন সময়ে এমনিতেই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, মক্কার এককালের সর্দার আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র ছিলেন, বিশ্বস্ততা ও সততার কারণে সকলেই তাকে স্নেহ ও সম্মানের চোখে দেখত, তাই সম্মানের জন্য তিনি এই দাবি করেছেন এমন চিন্তা ভুল ছাড়া কিছু নয়।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ড. আজাদ বলে বসেছেন, ইসলাম নাকি শুরুতেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেছিল। (পৃ. ১২৬) অথচ ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় দীর্ঘ ১৩ বছরের অত্যাচার-বঞ্চনা-শোষণ-নির্মম নিপীড়ন সহ্য করে মক্কায় টিকে থাকার চেষ্টায় রত ছিলেন মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর অনুসারীগণ। তাঁর আহ্বান বন্ধের বিনিময়ে মক্কার নেতারা তাকে ধন-সম্পদ, মর্যাদা, বাদশাহী দিতে চেয়েছিল। তিনি মুখের ওপর তা প্রত্যাখ্যান করে দেন! [৫৯] সারাটা জীবন তিনি সাধাসিধেভাবে কাটিয়েছেন। ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ড. গুস্তাভ ওয়েইল লিখেন,

> "... তাঁর আবাস, তাঁর ভূষণ, তাঁর আহার–এ সবের মাঝেই ছিল এক বিরল সরলতা। তিনি ছিলেন এতই বিনয়ী ও নিরহংকারী যে, তাঁর সঙ্গীদের থেকে কোনও বিশেষ শ্রদ্ধামূলক কর্ম গ্রহণ করতেন না, আর না তার ভৃত্য থেকে এমন কোনও কাজে সাহায্য নিতেন যা তিনি নিজেই করতে পারতেন। ... যে-কেউ, যে-কোনও সময় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত। তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং সকলের প্রতিই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন... তাঁর বদান্যতা ও উদারতা ছিল সীমাহীন, এবং তেমনই ছিল সমাজের কল্যাণের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা। চতুর্দিক থেকে তাঁর নিকট অবিরতভাবে আগত অসংখ্য উপঢৌকন ও প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ স্রোতের ন্যায় আসা সত্ত্বেও তিনি অতি সামান্য নিজের জন্য রাখতেন, এমনকি তাও রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদ তাঁর একমাত্র কন্যা ফাতিমার নিকট নয় বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল··· " [৬০]

কুরাইশদের দাবি না মানার কারণে তাঁকে ও সংশ্লিষ্ট গোত্রকে দুই বছরেরও বেশি

---

৫৯. ছফিউর রহমান মোবারকপুরি, আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭১ (ঢাকা : আল কুরআন একাডেমি লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টার; ৯ম সংস্করণ ২০০৩); William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca; p.105, 122 (Oxford: Clarendon Press, 1960); Jonathan A.C. Brown, Muhammad: A Very Short Introduction; p. 17 (Oxford: Oxford University Press, 2011)

৬০. Dr. Gustav Weil, A History of the Islamic Peoples; p. 27 (Calcutta, University of Calcutta, 1914); আরও দেখুন : সহীহ শামায়েলে তিরমিযী; পৃ. ১৩২-১৩৩, ১৫১-১৫৪ (ঢাকা, ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪)

সময় একঘরে করে রাখা হয়েছিল শিয়াবে আবূ তালিবের গিরিসংকটে।[৬১] সে সময় তিনি-সহ গোত্রের অনেক মানুষ প্রবল কষ্টে দিনানিপাত করার পরও তিনি মিশন থেকে একচুল পিছু হটেননি। দুনিয়া প্রাপ্তিই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তা হলে এমন কষ্টের পথ বেছে নেওয়ার কোনও দরকার হতো না। আলি দাশ্তি লিখেন :

> "মুহাম্মদের মহানুভবতা প্রশ্নাতীত। ইতিহাসে যেসব মহামানবের উল্লেখ আমরা পাই তার মধ্যে মুহাম্মদ অতুলনীয়। তাঁর সমসাময়িক সমাজ বিবেচনা করলে বোঝা যায় তিনি যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনয়ন করেছেন তা অনন্যসাধারণ। আলেকজান্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন, হিটলার, সাইরাস, চেঙিস খান অথবা তৈমুর লং, এদের সাথে নবি মুহাম্মদের কোনো তুলনা হয় না। এই নেতাদের পেছনে ছিল সামরিক বাহিনী এবং গণসমর্থন। কিন্তু মুহাম্মদ যা আয়ত্ত করেছেন তা সবই এক বৈরী সমাজের বিরুদ্ধে একা রিক্তহস্তে লড়াই করে।" [৬২]

কেউ আবার বলেছেন তিনি সমাজ পুনর্গঠনের জন্য মিথ্যের পথ বেছে নিয়েছেন। সমাজের বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে থাকা মন্দের মোকাবিলায় তাঁর মিথ্যে নিতান্তই ভালোমানুষিতার শামিল। মূলত এমন চিন্তাও সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁর জীবন ঘেঁটে দেখলেই পাওয়া যায়, নবুওয়তের দাবির কারণে তিনি সমাজের নৈতিক পুনর্গঠনে প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন; তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে উপহাস করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে, হত্যাও করা হয়েছে। তিনি সমাজ পুনর্গঠন করতে চাইলে মক্কার নেতাদের থেকে পাওয়া নেতৃত্বের প্রস্তাব কাজে লাগিয়ে তা সহজেই করতে পারতেন। এত কষ্টের পথ বেছে নেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। তা ছাড়া সমাজ বদলের জন্য নবুওয়ের দাবি কোনও শর্ত নয়, বিশ্বের ইতিহাসে আরও অনেকেই সমাজের বিভিন্ন দিক সংশোধন করেছেন নবুওয়াতের দাবি ছাড়াই।

সামগ্রিক বিবেচনায় বিংশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারি ওয়াট স্বীকার করেছেন মুহাম্মাদ (ﷺ) যে মিথ্যাবাদী বলে মনে করা পুরোই অযৌক্তিক। তিনি বলেন :

> "স্বীয় বিশ্বাসের জন্য নিপীড়িত হতে সদা প্রস্তুত থাকা, তাঁকে বিশ্বাস করা এবং নেতা হিসাবে মেনে নেওয়া মানুষদের সুউচ্চ নৈতিক চরিত্র, এবং তাঁর চূড়ান্ত

---

৬১. ইবনু কায়্যিম, যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরুল ইবাদ; পৃ. ৬০ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৮); Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet; p. 129 (London: Phoenix, 2001)

৬২. আলি দস্তি, নবী মুহাম্মদের ২৩ বছর; পৃ. ১৫

অর্জনের বিশালতা-এসবই তাঁর মৌলিক নৈতিক দৃঢ়তা ও সততার পক্ষে যায়। মুহাম্মদকে প্রতারক মনে করলে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না বরং আরও বেড়ে যায়। অধিকন্তু, ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের মাঝে মুহাম্মাদের মতো আর কেউ নেই যাকে পশ্চিমে এতটা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।" [৬৩]

অপশন ০২: তিনি ডিলিউডেড/বিভ্রান্ত ছিলেন

ডিল্যুশান মূলত একটি মানসিক সমস্যা; যেখানে কেউ এমন কিছু বিশ্বাস করেন যা মূলত প্রমাণের পরিপন্থী, বিপক্ষে শক্ত প্রমাণ থাকার পরও সেই বিশ্বাস তিনি ছাড়তে রাজি হন না। [৬৪] অর্থাৎ কেউ বিভ্রান্ত হলে সে মিথ্যেকে সত্য মনে করে বলতে থাকবে। ড. আজাদ নিঃসন্দেহে এই অপশনকে পছন্দ করবেন, কারণ উনার মতে সব মহাধার্মিক ঈশ্বরদ্রষ্টাই মনোবিকলনগ্রস্ত! (পৃ. ৩৮) কিন্তু ইতিহাসের আলোকে এই অপশনও ভুল প্রমাণিত হয়।

প্রথম ওহি অবতরণের সময় মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেই এ অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। জিবরীল-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা এত ভীতিকর ও আকস্মিক ছিল যে, তিনি দিশেহারা হয়ে আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেন। *New Catholic Encyclopedia* অনুযায়ী,

> "... মুহাম্মদ স্বয়ং এ ধরনের অভিজ্ঞতার সামনে আতংকগ্রস্থ, সংশয়ী ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী-স্বজনদের কাছ থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পরই তার প্রত্যয় জন্মাল, সত্যিই তিনি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন ... " [৬৫]

প্রথম ওহি অবতরণ হওয়ার পরে দীর্ঘ বিরতির নিয়ে দ্বিতীয় ওহি অবতরণ হয়েছিল, কারও মতে তা হয়েছিল চল্লিশ দিন পর আবার কারও মতে প্রায় দু-বছর পর।[৬৬] অথচ যে-ব্যক্তি উন্মাদনায় ভুগছে তার চিন্তাধারা তো অবিরাম ভ্রান্তির জগতে বিচরণ করার কথা। মনোবিকলনগ্রস্ত ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত মন সর্বদা অস্বাভাবিক

৬৩. W. M. Watt, Muhammad at Mecca; p. 52 (Oxford: Oxford University Press, 1953)

৬৪. Davidson's Principles and Practice of Medicine; p. 1084

৬৫. New Catholic Encyclopedia, Vol 9, p. 1001 (Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1967); আরও দেখুন : বার্নাবি রজারসন, দ্য প্রফেট মুহাম্মদ; পৃ. ৯৪ (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

৬৬. বার্নাবি রজারসন, দ্য প্রফেট মুহাম্মদ; পৃ. ৯৬

চিন্তাভাবনার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার কথা। ওষুধ ছাড়া উন্মাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি যেখানে এক বা দু-দিনের জন্যও সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না, সেখানে পথ্যহীন চল্লিশ দিন বা দু-বছরের বিরতি তো আরও অবাস্তব।

তা ছাড়া প্রকৃতই কেউ ডিল্যুডেড হয়ে থাকলে তার কাছে অকাট ভ্রান্তিও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হবার কথা; যার ফলে ভ্রান্তি তার মধ্যে কোনও অস্বাভবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। চিন্তাশক্তির অসংলগ্নতার কারণে অবাস্তব ও অদ্ভুত বিষয়ও নির্লিপ্তভাবে মেনে নেওয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ, নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। যেমন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পুত্র ইবরাহীম যেদিন মারা যান, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। নবি যদি বিভ্রান্তই হতেন তা হলে একে নিজের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ টেনে আনতে পারতেন। কিন্তু তা না করে মুহাম্মাদ (ﷺ) বললেন, 'নিশ্চই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটোর গ্রহণ হয় না। ...'[৬৭]

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জুল্স ম্যাসারম্যান বলেন :

> "... যে-কোনও জননেতাকে অবশ্যই তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হবে- জনকল্যাণমূলক কাজ করা, এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে জনগণ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ থাকবে, তাদের এক ধর্মবিশ্বাস (বা দার্শনিক মত) প্রদান করা। প্যাস্টর ও সল্‌ক-এর মতো মানুষেরা প্রথম শর্তে নেতা বলে বিবেচ্য। একদিকে গান্ধি ও কনফুসিয়াস, অন্যদিকে অ্যালেক্সান্ডার, সিজার ও হিটলার হলেন অন্য শর্তে নেতা—দ্বিতীয় বা সম্ভবত তৃতীয় শর্ত বিবেচনায়। যিশু ও বুদ্ধ কেবল তৃতীয় শর্তে নেতা বলে বিবেচ্য। সম্ভবত মুহাম্মাদই হলেন সর্বকালের সর্বসেরা নেতা; তিনি তিনটি দিকেরই সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন ..."[৬৮]

পাঠকবন্ধুগণ, একটু ভেবে দেখুন, ডিল্যুডেড কোনও মানুষের পক্ষে কি এই সমন্বয় সম্ভব? তার পক্ষে কি সম্ভব মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ প্রভাবশালী মানবে পরিণত হওয়া। সামান্য একটা কোম্পানিও তো উন্মাদ ম্যানেজারের দ্বারা চলতে পারে না। সেখানে এক অভূতপূর্ব সভ্যতার রচয়ীতাকে মনোবিকলনগ্রস্ত মনে করা বিবেক বিকৃতির উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, কিছুই হতে পারে না। মূলত এমন

৬৭. বুখারই, আস-সহীহ; খণ্ড ০২, হাদীস ১০০১ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪)

৬৮. Jules Masserman, Who were Histories Great Leaders? (Time Magazine, July 15, Special Section, 1974)

চিন্তাভাবনা পশ্চিমের নিরপেক্ষ চিন্তার ব্যর্থতার ফসল। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক টমাস কার্লাইল তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

"... মুহাম্মাদ সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা হলো তিনি ছিলেন একজন ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক, অসত্যের মূর্ত প্রতীক, যার ধর্ম হলো কেবলই অজ্ঞতা ও হীনবুদ্ধিতার সমষ্টি—এ ধারণা এখন যে-কারও কাছেই অগ্রহণীয়। (পশ্চিমাদের) মিথ্যার ফুলঝুরি যা প্রবল উৎসাহে এই মানুষটির চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, তা কেবল আমাদের জন্যই লজ্জাকর। ... "[৬৯]

অপশন ০৩ : তিনি সত্য বলেছেন

ওপরের আলোচনা বিবেচনায় রেখে একটি সিদ্ধান্তেই শুধু উপনীত হওয়া যায়, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য বলেছেন। তিনি সত্যি ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক, যিনি বদলে দিয়েছেন মানব সভ্যতাকে; শুরু করেছেন মানব ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ আলফোনস ডি ল্যামার্টিন বলেন :

"... যদি লক্ষ্যের বিশালতা, তা অর্জনে উপায়ের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর ফলাফল কোনও প্রতিভাবান মানুষের ৩টি মানদণ্ড হয়, তবে কার সাহস আছে ইতিহাসের আর কোন মহাপুরুষের সাথে মুহাম্মদকে তুলনা করবে? সবচেয়ে খ্যাতিমান মানুষেরা গড়ে তুলেছে কেবল সৈন্যবাহিনী, আইন ও সাম্রাজ্য। তারা যদি কিছু গড়েও থাকে তা ছিল শুধুই জাগতিক কর্তৃত্ব যা প্রায়শ তাদেরই চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই মানুষটি কেবল বাহিনী, আইন, সাম্রাজ্য, মানুষ, রাজত্বের ধারাকেই বদলে দেননি বরং বদলে দিয়েছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষকে। অধিকন্তু তিনি বদলে দিয়েছিলেন পূজার বেদী, স্রষ্টার ধারণা, ধর্ম, আদর্শ, বিশ্বাস এবং মানব আত্মাকে।

... দার্শনিক, বাগ্মী, স্রষ্টার দূত, আইন দাতা, আদর্শের বিজেতা, যৌক্তিক বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিমাহীন প্রবল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্য ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের স্থপতি—তিনি হলেন মুহাম্মদ। যে-কোনও মানদণ্ডেই মানবের মহত্ত্ব পরিমাপ করা হোক না কেন; আমরা জিজ্ঞেস করতেই পারি, আছে

৬৯. Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, And The Heroic In History; p. 42-43 (Edited by Henry David Gray, Ph.D.; New York, Longmans, Green, And Co., 1906)

কি এমন কোনও মানুষ যে মুহাম্মদের চেয়েও মহৎ ... ?"[৭০]

ওয়ারফেয়ার থিসিসের জন্মদাতা জন উইলিয়াম ড্রেপার বলেছেন,

"... (রোম সম্রাট) জাস্টিনিয়ান এর মৃত্যুর চার বছর পর... আরব ভূমির মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, যিনি সকল মানুষের মাঝে মানবজাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন—তাঁর নাম মুহাম্মদ... বহু সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান, মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পথপ্রদর্শক তিনি; সম্ভবত খোদার প্রেরিতপুরুষ খেতাবটি তাঁর জন্যই উপযুক্ত।"[৭১]

এমনকি পুরো সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও তিনি নাম্বার ওয়ানই রয়ে যান। আমেরিকান ইয়াহূদি ইতিহাসবিদ মাইকেল এইচ. হার্ট বহুল-আলোচিত গ্রন্থ *দ্য হান্ড্রেট* এ সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্থান দিয়ে লিখেন :

"বিশ্বের (ইতিহাসে) সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় সবার শীর্ষে মুহাম্মাদকে স্থান দেওয়ায়, আমার এই সিদ্ধান্ত পাঠকদের কাউকে হয়তো অবাক করবে এবং অন্য কেউ এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। কিন্তু তিনিই হলেন (মানব সভ্যতার) ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় দুই ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সফলতার অধিকারী। ... মুহাম্মাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ধর্মকে এবং পরিণত হয়েছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতায়। তার মৃত্যুর ১৩০০ বছর পর আজও তার প্রভাব শক্তিশালী ও ব্যাপ্তিশীল।"[৭২]

বার্নাবি রজারসন মানবের ইতিহাসে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন :

"মুহাম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর, আডাম থেকে শুরু করে এব্রাহাম, মোজেস ও জেসাস হয়ে মানুষের দীর্ঘ সারির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, যিনি মানুষের কাছে

---

৭০. Alphonse De Lamartine, Historie de la Turque (History of Turkey); vol. I, p. 154-155 (English Translation; New York, D. Appkenton & Company, 1855)

৭১. John William Draper, A History of the Intellectual Development of Europe; vol. 1, p. 329-330 (London: George Bell and Stones, 1875)

৭২. Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History; p. 03 (New York: Citadel Press book, 1993)

আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে সংগ্রাম করেছেন। এমনকি পুরোপুরি সেক্যুলার দৃষ্টিকোণে বিচার করা হলেও তিনি সুপার হিরাইে রয়ে যান। ... ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্র, যেমন ধরুন লেকজান্ডার দ্য গ্রেট, ডায়েজিনিস আর অ্যারিস্টটল বা সম্রাট কান্সট্যান্টাইন, সেইন্ট পল ও সেইন্ট ফ্রান্সিস—এদের সবচেয়ে সেরা গুণাগুণ একত্রিত করেই কেবল আপনি এই মানুষটির পরিমাপ উপলব্ধি শুরু করতে পারেন।"[৭৩]

ড. আজাদের মতে ধার্মিকরা বিকলনগ্রস্ত, খোদা প্রেরিত মহাপুরুষরাও মনোবিকলনগ্রস্ত; খালি উনার নিজের মাথাই ঠিক আছে! বাংলায় একটা প্রবাদ আছে আছে না—পাগলের সুখ মনে মনে!

এ পর্যায়ে এক শ্রেণীর সংশয়বাদী প্রশ্ন করতে পারেন, নিজের অবস্থানের পক্ষে যত প্রাচ্যবিদদের উদ্ধৃত করলেন তাদের মাঝে কয়জন মুসলিম হয়েছেন? উত্তর দেওয়ার আগে বলব—বড় আজব এই শ্রেণীর মানুষদের স্বভাব, প্রাচ্যবিদদের সবাই মুসলিম হয়ে গেলে তখন এরা বলত—আপনি তো মুসলিমদের উদ্ধৃত করছেন; এরা তো এমনটা বলবেই! সোজা কথা এরা মানবে না, যতই যুক্তি দেখান, বোঝান এরা মানবে না। এরা সেই কাতারে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন—এরা বোবা, বধির, অন্ধ; এরা সুপথে ফিরে আসবে না।

এসকল মানুষের এমন প্রশ্নের পিছে আরেকটা কারণ দায়ী, আর তা হলো প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রাচ্যবিদ্যা কোনও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান নয়, বরং প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার-স্বরূপ যে অ্যাকাডেমিক ফিল্ড তার একটি হলো এই ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যা। এ কথা আমি বানিয়ে বলছি না, এডওয়ার্ড সাঈদ রচিত বিখ্যাত বই *ওরিয়েন্টালিজম* পড়ে দেখুন, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

খ্রিষ্টীয় ৭ম শতকের পরবর্তী সময়ে ইসলামের অভূতপূর্ব ও আকস্মিক বিস্তারে ভীত খ্রিষ্টীয় ইউরোপের জনগণ ইসলামকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে পারেনি। ঐতিহাসিক ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন :

"... ক্রুসেডের সময় থেকেই পশ্চিমা খ্রিষ্টান জগতের মানুষ ইসলামের এক অতিরঞ্জিত ও বিকৃত ভাবমূর্তি গড়ে তোলে, যেখানে ইসলামকে তারা সুশীল সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছে... ক্রুসেডের সময় খ্রিষ্টানরাই

৭৩. বার্নাবি রজারসন, দ্য প্রফেট মুহাম্মদ; পৃ. ২৩

যেখানে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একের-পর-এক নৃশংস-বর্বরোচিত পবিত্র যুদ্ধের সূচনা করেছিল, তখন ইউরোপের শিক্ষিত পণ্ডিত-যাজকরাই ইসলামকে স্বভাবগতভাবে সহিংস ও অসহিষ্ণু ধর্মবিশ্বাস হিসেবে বর্ণনা করেছে যা কেবল তরবারির সাহায্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামের কল্পিত গোঁড়ামিপূর্ণ অসহিষ্ণুতার কিংবদন্তি পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রচলিত ধারণায় পরিণত হয়েছে।...”[৭৪]

অসির শক্তির পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে ইসলামকে মোকাবিলা করার জন্য প্রাচ্যবিদ্যার শুরু থেকেই খ্রিষ্টান চিন্তাবিদেরা অপচেষ্টা চালাতে থাকে। খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ পি.কে.হিট্টি-র কলমে জানা যায়, কাতালনীয়ার অধিবাসী খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ রেমন্ড লাল এক নতুন মাত্রার ক্রুসেডের (*Pacific Crusade*) হাতিয়ার হিসেবে প্রাচ্যবিদ্যাকে ব্যবহারের পাঁয়তারা শুরু করেন।[৭৫] পরবর্তী কালে ক্রমাগত অপব্যাখ্যার বেড়াজাল জড়িয়ে পশ্চিমে ইসলাম নামটির চতুর্পাশে এমন এক কাল্পনিক বলয় তৈরি করা হতে থাকে যার বহিরাবরণ কখনও ভাঙা হয়নি।[৭৬]

কালক্রমে যখন সেক্যুলারিজমের প্রসার ঘটে তখন বিদ্যানগণ প্রকৃতিবাদী দর্শন অনুযায়ী প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় লিপ্ত হন। এসকল বিদ্যানদের চিন্তায় মিশে ছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রতি ক্ষোভ, এই বিদ্যাচর্চার দ্বারা তারা সেই ক্ষোভ মেটানোর অবকাশ পান। তবে ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী ইসলামভীতি বা ইসলামবিদ্বেষ থেকে তারা কেউই মুক্ত হতে পারেননি। কেউ কেউ ইসলামকে আরও বড় হুমকি হিসেবে দেখেছেন, যখন বুঝতে পেরেছেন সেক্যুলারব্যবস্থার প্রতি হুমকি হিসেবে একটা জীবনব্যবস্থাই আছে—সেটা ইসলাম! তা ছাড়া সেক্যুলার প্রাচ্যবিদ্যাও মূলত পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের (অধ্যায় ০১ দ্রষ্টব্য) অনুমান নিয়ে পথে আগায়। তাই ইসলাম, আল-কুরআন, ইসলামের নবির জীবনের সকল দিকই প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যার বেড়াজালে আড়ষ্ট করার প্রচেষ্টা চলে অবিরাম।

বঙ্গীয় বা সাহেবিয় নাস্তিককূলের সর্বসাধারণের কাছে এই ব্যাপারগুলো পুরোই অজানা। তারা মূলত ইসলামকে গালাগাল করে পশ্চিমা ধারার জীবন যাপনেই আগ্রহী। তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির চর্চা নাম দিয়ে তারা মূলত শত বছরের ভুল ধারণার

---

৭৪. Karen Armstrong, Islam A Short History; p. 180 (New York, The Modern Library, Paperback Edition 2002)

৭৫. Philip K. Hitti, History of The Arabs: From The Earliest Times to The Present; p. 663 (Macmillan Education ltd., 10th edition 1989)

৭৬. এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, অরিয়েন্টালিজম; পৃ. ৮৮ (বঙ্গানুবাদ; ঢাকা : সংবেদ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

গোড়ায় পানি সিঞ্চন করতেই অতি উৎসাহী। প্রাচ্য ও এশিয়ার মানুষের মস্তিষ্কের ওপর দাসত্বের বেড়ি পড়িয়ে দেওয়া সাহেবদের মানসিক গোলামিই তাদের জীবনে ধ্যানজ্ঞান!

সারমর্ম

আমার বিশ্বাস অধ্যায়টি মূলত কেন আমি ইসলামকে, কুরআনকে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তারই বয়ান। বইয়ের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ায় বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। অন্যথায় এই অধ্যায়ের প্রতিটি অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখা সম্ভব। অধ্যায়ের শুরুতে বিজ্ঞানকে সত্য জানার একমাত্র মাপকাঠি মনে করে যারা বিজ্ঞানধর্মে আক্রান্ত তাদের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে কথোপকথনের আদলে।

তারপর স্রষ্টা, ওহি ও বার্তাবাহককে আমি কেন বিশ্বাস করি তার নাতিদীর্ঘ বয়ান রাখা হয়েছে। মহাবিশ্বের সূচনা ও ফাইন টিউনিং, আল-কুরআনের অতুলনীয়তা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এসবই মূলত বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করেছে আমায়। তবে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা। একই সাথে বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনও নাস্তিকদের তৈরি করা ফাঁদ থেকে আমাকে রক্ষা করেছে রবের অনুমতিক্রমে।

বিদায় বেলায়

এক নাতিদীর্ঘ যাত্রার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। বইটি যখন লিখা শুরু করি তখন ছিল গ্রীষ্মের দাবদাহ; ভ্যাপসা গরমে অস্থির হয়ে যাওয়া, শরীরভর অ্যালার্জির চুলকানি, সময়ে সময়ে পানি দিয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেওয়া। এরই মাঝে ল্যাপটপের কী-বোর্ডে টুপটাপ আওয়াজ, খসখস পাতা উল্টানোর শব্দ, মুঠোফোনের পর্দায় বৃদ্ধাঙুলির অস্থির নড়াচড়া। খচিত হতে থাকে শব্দের-পর-শব্দ, বাক্যের-পর-বাক্য, পাতার-পর-পাতা। মনের কোণে জমে থাকা ভাবনাগুলোর বিমূর্তজগৎ থেকে মূর্তজগতে প্রবেশ করতে থাকে।

এভাবেই কেটে যায় বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত; চলে আসে শীতের কুয়াশা। কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেফাঁকে গাঁথা হতে থাকে আরও কথামালা। কখনও ফযরের পর ঘুমঘুম চোখে স্বপ্ন বুনতে থাকা, কখনও ডিউটির পর ক্লান্ত নয়নে স্বপ্ন গাঁথতে থাকা। নাতিশীতোষ্ণ শীতের শেষে এসে এই কথামালার সমাপ্তি ঘটে। সেই স্মৃতিময় কথামালার সাথে অনেকটা সময় কাটালেন আপনি, আপনারা। কেমন লাগল এই শব্দ-বাক্য-গল্প সমাহার?

যে যাই বলুক বা করুক, এই কথামালা গাঁথতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ যদি কারও হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি হলাম আমি। এই রচনার কাজে অজস্র বিষয় জেনেছি, মিথ্যাবাদীদের ভ্রান্তি চিনেছি, সেগুলোর বিরুদ্ধে শব্দের ঢাল রচনা করার চেষ্টা করেছি, মুহুর্মুহু শব্দের তীর নিক্ষেপ করেছি তাদের দিকে, ভেঙে চুরমার করতে চেয়েছি মিথ্যের প্রাসাদ। জীবনের কিছু সময় আমার ভালোবাসার সত্ত্বার জন্য দিতে পেরেছি, আমার রবের দরবারে পেশ করার চেষ্টা করেছি। একটাই চাওয়া, আমার রব যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তাঁর ভালোবাসার চাদরে এই অধমকে জড়িয়ে নেন। শেষবিচারের কাঠগড়ায় যেন আমাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন। আর তাঁর সাথে

মহাউদ্যানে মোলাকাত করার সুযোগ দেন।

বইয়ের কাজ শুরু করার আগে মুক্তমনা ব্লগে[১] হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে এক উক্তি চোখে পড়েছিল—

"হুমায়ুন আজাদ মানে, সত্যের বুলেটে মিথ্যে আবেগের তীক্ষ্ম জলাঞ্জলি"

বইয়ের কাজ শেষ করার পর আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে—

"হুমায়ুন আজাদ মানে, মিথ্যের বুলেটে সত্য আবেগ জলাঞ্জলি দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।"

১. সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ মানে, সত্যের বুলেটে মিথ্যে আবেগের তীক্ষ্ণ জলাঞ্জলি। মুক্তমনা ব্লগ, ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০১১

প্রত্যেক মানুষই স্বীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অবিশ্বাসীরাও নিজেদের 'অন্ধ-বিশ্বাস'কে উঁচুতে তুলে ধরতে চায়। স্বীয় অবিশ্বাসের ঝাণ্ডা সবার ওপরে তুলে ধরার বাসনায় সে প্রবল আক্রমণে বিশ্বাসকে পরাস্ত করতে চায়। এমনই এক ব্যক্তির অবিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছি আমি। দীর্ঘ যাত্রায় উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি অবিশ্বাসের আসল রূপ। আসলেই কি সে অবিশ্বাসী? নাকি নিজের অন্ধবিশ্বাসের ডালা সাজিয়ে তার উপর চটকদার কথামালার পর্দা টেনে দিয়েছেন? জানতে চান? এক কাপ ধোঁয়া উঠা চায়ের সাথে বসে যান আদালতে। অবিশ্বাসী আজ কাঠগড়ায়, বিচার হয়েছে শুরু...

লেখক পরিচিতি

আমি রাফান আহমেদ

পেশায় একজন চিকিৎসক। প্রিয় বাবা-মা আমার শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখেছেন, ছেলে একদিন ডাক্তার হবে! সেক্যুলার সমাজের মাঝে থেকে ফোক ইসলাম পালনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে ছেলে একদিন মুসলিম হবে এই স্বপ্ন দেখতে শেখেননি। ফলে তথাকথিত মুসলিম পরিবারের এই ছেলে একসময় হারিয়ে ফেলে তার ইসলাম, তার পরিচয়, তার উদ্দেশ্য। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে অচেনা এ জগতে, হাতড়ে বেড়াতে থাকে বেঁচে থাকার নূন্যতম কারণের সন্ধানে।

সেই যাত্রায় একসময় আলোর দেখা মেলে! এখন সেই আলো মুঠোয় নিয়ে ছুটে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখি। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে সেই আলো দিয়ে মালা বুনি, যা একসময় পরিণত হয় অজস্র কথার মালায়। তারই ফলে ২০১৭-তে জন্ম নেয় বিশ্বাসের যৌক্তিকতা। অল্প সময়ে রবের অনুগ্রহে দেশে ও দেশের বাইরে পাঠকমহলে সমাদৃত হয় ছোট্ট এই বইটি। বক্ষ্যমাণ বইটিকে আগের বইয়ের বিস্তারিত রূপ বলা যেতে পারে। আশা করি, আগের বইটির মতো এই মোটাসোটা বইটিও সত্যান্বেষীদের মন মাতাবে।